রঞ্জন

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

রঞ্জন-রচিত অন্যান্য বই

- শীতে উপেক্ষিতা
- অন্তপূর্বা
- বইয়ের বদলে
- অসংলগ্ন

প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬০

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—অশ্বিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
প্রচ্ছদ পট :
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

আড়াই টাকা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

করকমলেষু

These papers of the day, the ephemerae of learning, have uses......

Samuel Johnson (*The Rambler*)

ভূমিকা

বইতে কোথাও কপট বিনয়ের আশ্রয় নিইনি। ভূমিকায় তার প্রয়োজন দেখিনে। স্পষ্টই বলি, যদিও কখনোই উদ্দেশ্য-উদাসীন আনন্দসন্ধানী সাধারণ পাঠকের কথা বিস্মৃত হইনি, এই গ্রন্থেব প্রবন্ধ নির্বাচনের সময় অন্যান্য কয়েক শ্রেণীর পাঠকের কথাও আমার মনের সামনে ছিল।

তার আগে বলি, কোন দুই শ্রেণীর পাঠকের কথা একেবারেই মনে আনিনি। এক, যাঁরা বহির্বিশ্বের সাহিত্য সম্বন্ধে আদৌ কৌতূহলী নন এবং সমসাময়িক সমস্যা সম্বন্ধে দৈনিক কাগজেব সম্পাদকীয় ছাড়া আর কিছু পড়তে অনিচ্ছুক। দুই, যাঁরা বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙলায় সহজ আলোচনা বিদ্যাভিমানের শোচনীয় ব্যত্যয় বলে ও অসাহিত্যিক প্রসঙ্গে সাহিত্যের কণ্ঠক্ষে : স্বধর্মচ্যুতি বলে জ্ঞান করেন।

আমার ধারণা, অন্তত তিন শ্রেণীর পাঠক 'বিকল্প' পড়ে উপকৃত হবেন। এক, যাঁরা বই ।ড়ার পরিশ্রম এড়িয়ে অসাধুভাবে সাহিত্য সম্বন্ধে বহুজান্তা বলে পরিচিত হতে অভিলাষী। এমন লোকের সংখ্যা মর্মান্তিক রকম বৃহৎ, যদিও এঁদের দুরভিসন্ধির সহায়ক হওয়া আমার সজ্ঞান অভিপ্রায়ের অন্তর্গত নয়। দুই, যাঁরা সাধারণভাবে সাহিত্যের ও বিশেষ করে বিদেশী সাহিত্যের ছাত্র। যোগ করা দরকার, 'ছাত্র' অর্থ Eng. Lit.-এর পরীক্ষার্থী নয়। তিন, যাঁরা সাংবাদিকতার সেই অবজ্ঞাত অংশে নিযুক্ত যেখানে মঞ্চালোচনা, চিত্রসমালোচনা, কলালাপ, পুস্তকপরিচয় ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। (যাঁদের উপর 'বিকল্প' সমালোচনা করবার ভার পড়বে তাঁরাও বইটি পড়লে অপকৃত হবেন না।)

সংগৃহীত প্রবন্ধগুলি 'দেশ' ও 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণ আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। দুটি ছাড়া সবগুলি রচনাই মোটামুটি এক মাপের। প্রথম দীর্ঘ লেখাটি 'দেশ' পত্রিকার রবীন্দ্রসংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সবশেষ দীর্ঘ

প্রবন্ধটি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রসঙ্গ কথা পর্যায়ে। অদীর্ঘ নিবন্ধের পরিসরে কোনো বিষয়েরই সবিস্তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়। কিন্তু নানা লেখা ও লেখক সম্বন্ধে ইঙ্গিতগুলি পাঠকের মনে কিঞ্চিৎ কৌতূহল সঞ্জীবিত করলেই আমি, ভূমিকার প্রচলিত ভাষায়, আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

বিভিন্ন কালে, পত্রে, উদ্দেশ্যে ও বিষয়ে রচিত এই প্রবন্ধগুলিকে একটি বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা কেন? প্রথম কারণ, এগুলির লেখকের মাতৃসুলভ মমত্ববোধ। অনাথ হয়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকলে এরা হারিয়ে যেতো। দ্বিতীয় কারণ, এ বইয়ের অন্তত কয়েকটি প্রবন্ধ দ্বিতীয় পাঠের অযোগ্য নয় বলে মনে করি। তৃতীয় কারণ, এর অধিকাংশ রচনায় এমন এক রকমের বাংলা গদ্যের সযত্ন অনুশীলন আছে যার ব্যাপকতর ব্যবহারে বাঙলা ভাষার ক্ষতি হবে না বলে আমি নিজে অন্তত আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি।

বহু বিষয়ের এই বিক্ষিপ্ত আলোচনাগুলিতে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাসাধ্য কোনো মতবাদ বোধহয় নেই। কিন্তু নির্মীয়মান একটা দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিত বোধহয় আছে। বিয়াট্রিস ওয়েব নাকি মানবজাতিকে দু'ভাগে ভাগ করতেন; এক দল অ্যানার্কিস্ট আর দ্বিতীয় দল ব্যুরোক্রাট। আমি চিন্তায় অ্যানার্কিস্ট: অ-বিশ্বাসী, নাস্তিক, সংস্থা-সন্দেহী, যুক্তিপ্রিয়, ব্যক্তিস্বরাজী, অন্ধতাবিরোধী। সে-চিন্তার প্রকাশে আমি ব্যুরোক্রাট: ভাষায় আমি রীতিপ্রিয়, রুচিপ্রয়াসী, অনুশীলনানুরাগী, স্পষ্টতাভিলাষী ও সাধ্যানুযায়ী ব্যাকরণানুগামী।

১ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ রঞ্জন

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

লেখার কথা
(ডায়েরী থেকে)

ফাল্গুন

১—এখন এই দিনপঞ্জী লিখতে বসে মনে পড়ল যে, আজ মাসপয়লা। বাঙলা মাস বলে তার প্রথম দিনে কিছুমাত্র উল্লাস বোধ করিনে। ইংরেজি মাসের মাঝামাঝি এই দিনটা অগোচরে আসে, অনাদরে চলে যায়।

শুধু প্রথম দিনটা কেন? গোটা বাঙলা বছরের ক'টা তারিখ সাধারণত মনে থাকে? পঁচিশে বৈশাখ আর বাইশে শ্রাবণ। এ দু'টি স্মরণীয় দিন। আর? ব্যক্তিগত কারণ, বাদোই আষাঢ়। ওটা নিজের ও অন্য অনেক জনের জন্মদিন বলে। পহেলা বৈশাখ আর পহেলা আষাঢ়ও মাঝে মাঝে স্মৃতি-পথে উদিত হয়, কিন্তু সেটা বাইরের সভাসমিতির কোলাহলে; আপন অন্তরের আহ্বানে নয়।

আর শুধু বাংলা তারিখই বা কেন? যা কিছু আমাদের জীবনে বিশিষ্ট বাঙালী বলে অবশিষ্ট আছে তার সব কিছু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যোগাযোগবিবর্জিত। সব কিছু প্রয়োজন-মুক্ত ক্ষণিক বিলাসের সামগ্রী। বাঙালী পোশাকটা আমি ক'দিন পরি? কোনো দরকারে কে কবে কোন বাংলা বই পড়ে? শুধুমাত্র অবসরবিনোদন যে ভাষার ও সাহিত্যের সম্বল, তা নানা দিকে দুর্বল হতে বাধ্য। অবাঙালীদের সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্কে যাই বলি না কেন, নিজেদের কাছে সেই মর্মান্তিক দুর্বলতা অস্বীকার করব কোন মুখে?

প্রশ্নটার অপর দিকটা পুরোপুরি অগৌরবের নয়। বাঙলা পড়তে পাঠকের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যেমন এখনো আছে ইংরেজির বেলায়। তবু নিশ্চয়ই অনেক বাঙালী বাঙলা বই পড়েন নইলে এত বই প্রকাশিত হবে কেন? তাঁরা পড়েন শুধুমাত্র আনন্দের জন্য; বাঙলা-সাহিত্যপ্রীতি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো প্রেরণা তাদের থাকতেই পারে না। কেননা প্রয়োজনের তাড়না নেই। ক'জন বাঙালী লেখক এই প্রীতির যোগ্য? আমার একটা মাত্র হাত থাকলেও গুণতে অসুবিধা হোতো না। না, বাঙালী পাঠকের দয়া একেবারে মায়ের

স্নেহের মতো। যোগ্যতার প্রশ্ন আদৌ না তুলে সে স্নেহেব ধাবা অকৃপণভাবে প্রবাহিত হয়।

কিন্তু বাঙালী লেখক কি কখনো নিজেকে জিজ্ঞাসা কবে যে, সেই স্নেহে তাব অধিকাব আছে কি না, যে সেই স্নেহেব যোগ্য হতে তাব আবো কিছু কবা প্রযোজন ?

৫—ফেবৃয়াজিনি (না কি ফেবাৎসিনি ?) যাচ্ছিলুম 'দেশ' পত্রিকাব সহ-সম্পাদকেব সঙ্গে দেখা কবতে। গ্র্যাণ্ড হোটেল আর্কেড দিযে হাঁটবাব উপায নেই। পুবো বাঁ দিকটায কাঁকবেব মতো কাগজেব দোকান ছডানো। আব কী সব কাগজ! ল্যাফ' 'গ্যাল', 'লা ভী পাবিসিয়েন', 'লাইফ' 'টাইম', 'নিউজ অব দি ওবার্ল্ড' ইত্যাদি আছে বলে আপত্তি কবিনে—বিভিন্নরুচির্হি পাঠকাঃ—কিন্তু রুচিব বিভিন্নতাব পবিচয কোথায এই তালিকায ?

দ্বিতীযত, একটাও কই বাঙলা বইযেব বা কাগজেব দোকান তো নেই সাবা চৌবঙ্গীতে! ভালো বাঙলা বই একেবাবেই লেখা হযনি সেটা নিশ্চযই ঠিক নয, (চাবখানা তো আমি নিজেই লিখেছি), তবু শহবেব কেন্দ্রস্থলে তাব কিছুমাত্র আভাস নেই কেন? কোনো বিদেশী এই দোকানগুলি দেখলে একবাবও কি সন্দেহ কববে যে বাঙালীব মাতৃভাষা ইংবেজি ছাডা অন্য কিছু? যে, বাঙলাব একটা লিখিত ও মুদ্রিত সাহিত্য আছে ?

আসল কাবণ বোধহয এই যে, নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী ছাডা আব কেউ বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহী নয। টেগোব, হ্যাঁ। তাব আগে কেউ নেই। তাব পবেও না। থাকলেও, কই, বিদেশে তো আব কোনো বাঙলা লেখক সম্মান পাযনি। তাহলে চৌবঙ্গীতে তাদেব নাম জানবে কে ?

কিন্তু এই ঘৃণ্য মনোবৃত্তিব একটা ব্যবসাগত লাভজনক ব্যবহাব বোধহয সম্ভব। মেট্রো বা লাইটহাউসে কোনো বাঙলা বা হিন্দি ছবি 'মুক্তিলাভ' কবলে যেমন তাব মান বাডে, তেমনি চৌবঙ্গীব উপব একটা বাঙলা বইযেব দোকান কবলে কেমন হয? হযতো বাঙলা বই একটু জাতে উঠবে।

'দেশ'-সহ-সম্পাদককে বললুম কথাটা। কিন্তু তিনি আপন চিন্তা নিযে ব্যস্ত। তিনি বললেন, 'পঁচিশে বৈশাখ আসছে। মামুলী ববীন্দ্র-স্মৃতিসংখ্যা

বের না করে একটু নতুন কিছু করতে চাই। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি না করে একটা লিটরেরি সাপ্‌লিমেন্টের মতো করতে চাই।'

নতুনে আমার পুরানো পক্ষপাত। বললুম সেকথা।

প্রস্তাবিত প্রকাশনের সম্ভাব্য স্থচী নিয়ে আলোচনা হোলো। আমি প্রস্তাব করলুম যে, সাহিত্য ছাড়া অন্যান্ত ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছেন এমন দশজন বাঙালীকে আমন্ত্রণ জানানো হোক। তাঁরা প্রত্যেকে বলবেন, গত দশ বৎসরে তাঁরা কী কী ভালো বাঙলা বই পড়েছেন এবং সেগুলি তাঁদের কেন ভালো লেগেছে। প্রস্তাবটা মনোনীত হওয়া মাত্র চায়ের দোকানে বসেই তালিকাটি সম্পূর্ণ করলুম। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেন ডাক্তার, ব্যারিস্টর, ভাইস-চান্সেলর, ঐতিহাসিক, পদার্থবিজ্ঞানী, দার্শনিক, পলিটিশান, ব্যবসায়ী, অভিনেতা এবং দৈনিক কাগজের সম্পাদক। প্রত্যেক ক্ষেত্র থেকে একজন।

এই বিশেষ সংখ্যায় আমি কী লিখব? আদেশ হয়েছে, বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটা প্রবন্ধ, বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বা না করে। পাক্ষিক 'প্রতিধ্বনি'-রচয়িতার জন্যে স্বাভাবিক অনুরোধ, কিন্তু—ওই যে, কিন্তু—রবিবাবুর 'সাধারণ মেয়ে' মালতীর সঙ্গে আমার অন্তত একটা জায়গায় মিল আছে—আমি ফরাসি জার্মান জানিনে। ও দুটি সাহিত্য বাদ দিলে বিদেশী সাহিত্যের অনেকখানি বাদ পড়ে যায়। কিন্তু তাই বলে আলোচনা অসম্ভব নয় কেননা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ইংরেজি অনুবাদের অপ্রাচুর্য নেই। তাছাড়া টাইমস লিটরেরি সাপলিমেন্টের কল্যাণে য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রধান ধারাগুলির সঙ্গে নির্ভরযোগ্য পরোক্ষ পরিচয় কিঞ্চিৎ আয়াসে অলভ্য নয়। লিখব বিদেশী সাহিত্য নিয়েই প্রবন্ধ।

এবারে নিজের কাছে কবুল করি, রবীন্দ্রসংখ্যার জন্যে সেই নতুন প্রস্তাবটা করা থেকে মনে শান্তি পাচ্ছিনে। কেবলই মনে হচ্ছে, উকিল আমার নাম না করলেও, ডাক্তার করবে তো? ডাক্তার না করলে, ঐতিহাসিক? অন্তত অভিনেতা? কিন্তু দশজনের একজনও যদি আমার নাম না করে, তবে? এই সম্ভাবনাটা মনে এলেই মন নৈরাশ্যে ভরে যায়।

সাধারণ্যে স্বীকৃতির প্রতি এই বালকোচিত মোহ কি আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতা? না, লেখকদেরই পেশাগত ব্যাধি?

সঙ্গে সঙ্গে মনের সচেতন সাবধানী দিকের প্রস্তুতি চলতে থাকে। মনকে বোঝাই, ডাক্তারের সাহিত্যিক মতামতের মূল্য কী? কোনো উকিল যদি আমার কোনো বই না পড়ে থাকে—হায়, এও কি সম্ভব?—তাতে কী আসে যায়?

কিন্তু সত্যি আসে যায়। মন বিরাম পায় না। সাহিত্যসৃষ্টি তো সত্যি শুধু অন্যান্য লেখকদের জন্যে নয়—তাহলে বই কিনবে কে?—কিন্তু বইয়ের বিক্রিই তো সব নয়—তবু মনকে যতই বোঝাই না কেন; আমার লেখা কারো ভালো লাগেনি—তা সে যতই অশিক্ষিত বা অক্ষম পাঠক হোক না কেন—কথাটা ভাবতে ভালো লাগে না।

কোথায় যেন পড়ছিলুম দিন তিনেক আগে, প্রত্যেক লেখকের উচিত প্রতি নতুন বইয়ের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন পাঠকসংখ্যার অর্ধেক বিসর্জন দেয়া—আর, সেই সঙ্গে, অবশিষ্ট অর্ধেকের অনুরাগ দ্বিগুণ করে তোলা। উপদেশটি উপাদেয় নয়,. তাছাড়া ব্যবসাবুদ্ধিবিরুদ্ধ; কিন্তু সাহিত্যেব স্টক এক্সচেঞ্জে উক্ত পথ বিফলতার সদুপায হলেও, সাহিত্যের মন্দিরে সার্থক পূজারী হতে হলে অন্য পন্থা বোধহয নেই। আমাব বই ভবিষ্যতে কখনো অবিক্রীত থাকলে হযতো আক্ষেপের সীমা থাকবে না, কিন্তু বর্তমানে শুধু বিক্রীত হয়েই বা খুশি হতে পারি কই? আজো তাই বুঝতে পারলুম না আমার ঠিক জায়গাটা কোথায়—সাহিত্যের হাটে, না সরস্বতীর পায়ে?

অন্যান্য লেখকদের মনোভাব বুঝিনে। তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প। তাঁদের কী মনে হয় যখন তাঁদের নতুন বই সম্বন্ধে সারা বিশ্ব নির্বিকার থাকে? কেউ কোনো কথা বলে না, ভালোও না, মন্দও না? যেন নতুন কোনো বই প্রকাশিতই হযনি! সেই লেখকরা কি উদাসীন? আমি কেন অমন উদাসীন হতে পারিনে? আমার কেন কোনো কিছু ছাপা হবার পরমুহূর্ত থেকে দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না যে তা সবায়ের ভালো লাগবে কি লাগবে না? আর যদি না লাগে, তবে কেন লাগে না? যে মতের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও আস্থা

এত পরিমিত, তারই সম্ভাব্য বিরুদ্ধতায় এত আতঙ্ক কেন আমার? যাকে ভালোবাসিনে, ভালোবাসব না, তারও মন না পেলে কেন উন্মনা না হয়ে পারিনে?

না, আজ আর লেখা হবে না।

৭—নানা আকস্মিক ঘটনার সমন্বয়ে আজ সারাটা দিন অবিচ্ছিন্ন আনন্দে কেটেছে। তারই মধ্যে একবার লেখার কথা মনে হয়েছিল। বিশেষ কিছু লেখা নয়, যে কোনো কিছু। এখন মনের মধ্যে দুটো বইয়ের পরিকল্পনা আছে: একটা সেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নিয়ে, আর দ্বিতীয়টা একটি শেরপাকে ঘিরে ছোট একটা উপন্যাস।* দু'টোর একটারও এক বর্ণও এখনো লেখা হয়নি, যদিও মনের মধ্যে কথা জমেছে অনেক। কিন্তু লেখার কথা মনে হতেই সব উৎসাহ কোথায় শূন্যে মিলিযে গেল! মনকে বললুম, আজ সেই দুর্লভ দিনগুলির একটা, যখন তুমি খুশি, যখন তোমার মন বিষণ্ণতার ছায়ায় আচ্ছন্ন নয়, আজ কেন লিখতে বসে এমন পরম লগন অবহেলায় অপব্যয় করবে?

মন মানল কথাটা। লেখা হোলো না।

৮—ফাল্গুন না ছাই! বসন্তের সামান্যতম আভাস কোথাও নেই। আজ সারা দিন কেবল মনে পড়ছে কয়েক বছর আগেকার একটা ৮ই ফাল্গুনের কথা। সেদিন জেনেছিলুম আনন্দ কাকে বলে; এমনকি, সুখ কাকে বলে। সেদিন এমন একজন কাছে ছিল যাকে চোখের সামনে পেলে সারা পৃথিবীর রঙ বদলে যেতো। কবে সে-দিন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আজ সেদিনের কথা মনে করাও শাস্তি। আর মনে না-করেই কি উপায় আছে? না, আজ মন এত খারাপ যে, লিখতে বসবার কথা চিন্তা করাই অসম্ভব।

মন মানল কথাটা, লেখা হবে না।

তা না হয় হোলো। কিন্তু লিখতে বসবার অনুকূল মনের অবস্থা তাহলে কোনটা? সুখী থাকলে লিখতে বসা সময়ের অপচয়। অসুখী হলে লিখতে

* টেনজিং-এর খ্যাতিদেহ নিয়ে কলকাতা-লণ্ডনে তাণ্ডবনৃত্য পরবর্তী ঘটনা।

বলাই অসম্ভব। খুশি থাকলে বাইরে-খাওয়া, অ-সুখ হলে অরন্ধন—তাহলে লেখা হয় কখন? লিখতে বসবার প্রশস্ত সময় কোন্‌টা?

বোধহয় কোনো নিয়ম নেই। লেখকরা লেখে, অন্রের কথায়, 'as boars piss—scilicet, in jerks.'

১০—আজ হঠাৎ সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে দেখা। আমার ও তাঁর প্রকাশকের দপ্তরে মাত্র দু'তিনবার দেখা হয়েছে এর আগে, কিন্তু এরই মধ্যে নিজ গুণে অন্তরঙ্গ করে নিয়েছেন। বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো, কিন্তু আলাপে ও জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীতে আমার চেয়ে কত তরুণ! আলাপে পটু এবং আলাপপ্রিয়। (ভগবান, এই বিলাসটিতে যত লোককে আসক্ত করেছ তাদের সবাইকে একটু পটুতাও দাওনি কেন তার সঙ্গে!)

আলীর কথা অনেকটা তাঁর লেখার মতো। সহজ, সরস, স্বচ্ছ, বৈচিত্র্যপূর্ণ, বহুল। তাঁর লেখার যেগুলিকে আমি দোষ বলে মনে করি, কথায় সেগুলি প্রায় গুণ বলে পরিগণিত হতে পারে। আলাপে একটু অতিভাষিতা—এমন কি, মাঝে মাঝে একটু বাচালতা—অক্ষমণীয় অপরাধ নয়। কিন্তু সাহিত্যে তাকে আমি অন্তত স্থান দিতে নারাজ। শুধু কথার সংখ্যা নয়, কথাব নির্বাচন ও ব্যবহারও লেখা ও বাক্যে বিভিন্ন হওয়া উচিত বলে মনে করি।

ইংরেজিতে যাকে 'প্রশস্ত রসিকতা' বলে, আসরে তাকে আমি অপাংক্তেয় মনে করিনে; কিন্তু সাহিত্যে সামান্যতম অশালীনতা আমার গায়ে কাঁটা দেয়। কতগুলি কথা আছে যা আমি নিজে দিনের মধ্যে সহস্রবার ব্যবহার করি, কিন্তু কলমের ডগা দিয়ে তাদের কখনো বেরুতে দিইনে। আমার রুচিতে বাধে।

অথচ প্রত্যহ দেখছি যে, বাঙলা ভাষায় এমন ভয়ানক চলতি ভাষার চলন হয়েছে যে, স্বয়ং প্রমথ চৌধুরীও তাঁর সাধু ভাষার বিরুদ্ধে সাধু প্রচেষ্টার বর্তমান পরিণতি দেখে আতঙ্কিত হতেন। ডক্টর আলীকে আমি বলেছি যে, এদিক থেকে তাঁকে আমি এক নম্বর আসামী বলে মনে করি।

আলীর উত্তরে অনুতাপের বাষ্পমাত্র নেই! তিনি বলেন—আনাতোল ফ্রাঁসের উদ্ধৃতি সহযোগে—"কত কষ্ট করে যে সহজে লিখি তা জানবে কী করে? আমার লেখা ঘড়ির কথা ভুলে গিয়ে পাঠকের সঙ্গে বসে দু'দণ্ড রসালাপ। আড্ডার আর্ট তুমি বুঝলে না হে, রঞ্জন, তুমি জানো না তুমি কী হারাইতেছ! হা—হা।"

স্বীকার করব ও-রসে আমি বঞ্চিত। এমন কি, 'আড্ডা' কথাটাও ভালো লাগে না। আলাপ, হ্যাঁ। গল্প, রাজী। আলোচনা, তার চেয়ে উপাদেয় কিছু নেই। তর্ক, সেজন্যে তো এক পা বাড়িয়েই আছি। কিন্তু আড্ডা নৈব নৈব চ। ওটা সময়ের রুচিহীন অপচয়।

আলী হাসেন। তাঁর কথা বুঝি। সারা জীবন তিনি গল্প করেছেন দেশে-বিদেশে নানা লোকের সঙ্গে। কলম ধরেছেন (and what a pen!) অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে। কিন্তু অভ্যাস যাবে কোথায়? আলাপের অবাধ অনায়াস তাঁর লেখায় তাই পরিব্যাপ্ত। শব্দগুলি তাঁর কাছে শক্ত নিরেট ইঁটের মতো নয়, যা পাঠকের মাথায় ছুঁড়ে মারতে হবে, বা যা দিয়ে নির্দিষ্ট কোনো প্রতিপাদ্যের সৌধ গড়তে হবে। এক একটা শব্দ তাঁর কলম থেকে বেরোয় যেন শিশুর মুখ থেকে নিঃসৃত সাবানের ফেনার বুদ্বুদ। হাল্কা, রঙীন, হাওয়ার কোলে নৃত্যরত। কিম্বা যেন কোনো কুশলী ধূমপায়ীর মুখ থেকে নিঃসৃত ধোঁয়ার চাকার মালা।

জীনিয়সের মানে যদি হয় আপন অক্ষমতার কুশল প্রয়োগ, আলী তাহলে নিঃসন্দেহে জীনিয়স।

অন্যান্য বহু লেখকের মতো, আলী প্রশংসাপ্রিয়। তাই তিনি আমার 'জীনিয়স' কথাটার উল্লেখ সানন্দে গ্রহণ করলেন, আগেকার কথাগুলি উপেক্ষা করলেন।

কিন্তু আসল প্রশ্নটা বলা ও লেখার প্রকৃতিগত প্রভেদ নিয়ে। আলী দুটোকে আলাদা করে দেখতেই রাজী নন। তাঁর মত হচ্ছে এই যে, লেখা যদি সাক্ষাৎ আলাপের মতো অবাধ ও অন্তরঙ্গ হয়, তাহলেই লেখা—তাঁর স্বকীয় অশালীন ভাষায়—'উৎরেছে।' আমি তা মানিনে, মানিনে, মানিনে।

আমার আদর্শ হচ্ছে এই যে, আমার চিন্তায় 'সফিস্টিকেশন' থাকবে আর তার প্রকাশে থাকবে 'প্রিসীশন' এবং 'এলিগেন্স'। তিনটিই এমন অবাঙালী গুণ যে কথাগুলির যথাযথ বাঙলা প্রতিশব্দ পর্যন্ত নেই।

আলী বিজ্ঞের মতো হেসে বলেন, "আমার কাছে ও তিন বস্তুর মূল্য এক কানাকড়িও নয়। ওগুলো তোমার ইংরেজদের কাছ থেকে শেখা 'প্রুডারি,' 'স্নবারি'। আচ্ছা তুমি প্রাণ খুলে হাসতে পারো না কেন? না ভেবে, না বেছে একটা কথা বলতে পারো না কেন?—লেখা তো দূরের কথা!"

বেশ। পারিনে। পারতে চাইনে।

সহজ হচ্ছে শিশু আর পশু।

আমি শিশু ছিলুম অনেক বছর আগে, পশু ছিলুম (যদি ডারুইন ঠিক কথা বলে থাকেন) তারও অনেক অনেক যুগ আগে। ওদুটোর কোনো অবস্থায়ই আমি ফিরে যেতে চাইনে। আমি সজ্ঞান মানুষ। চিন্তা আমার গর্ব, অনুশীলন আমার অলজ্জ সাধনা, যুক্তি আমার সহায়। আমি সহজ নই, আমি জটিল। আমি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মানুষ।

আলী হাসেন। বোধহয় এই জর্মান আর্নেস্টনেসের মর্মান্তিক নিরর্থকতা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন বলে।

না কি তাঁর মনে পড়ে ওমরের কোনো রুবাই, যা ফিটস্‌জেরল্ড ইংরেজিতে অনুবাদ করতে পারেননি?

১৫—কিন্তু সেই বলা আর লেখার সম্বন্ধটা এখনো মনে মনে আলোচনা করছি।

প্রশ্নটা আমার নিজের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেখক হিসাবে আমার বর্তমান সামান্য পরিচিতির বহু পূর্বে আমার বিস্তৃত খ্যাতি ছিল বেতারবক্তা হিসাবে। দশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ওই রেডিও মিডিয়মটাকে মোটের উপর আয়ত্ত করেছিলুম। প্রায় যে কোনো বিষয়ে, যতক্ষণ প্রয়োজন, ইংরেজি বা বাঙলায় শ্রবণযোগ্য বক্তৃতা দিতে পারতুম।

অন্তত একজন মহিলাকে জানতুম যাঁর সেই বক্তৃতাগুলি একেবারে খারাপ লাগতো না।

কথক থেকে যখন লেখক হলুম, তখন আমার বলার ভঙ্গীর কিছুটা প্রভাব আমার লেখায় নিশ্চয়ই ছিল। এই কিছুদিন আগে একটি রেডিও কর্মচারী আমায় বলছিল যে, আমার রচনায় বাচনের সুর নির্ভুল। যেন ওগুলি পরে রেডিওতে পড়বার জন্তেই লেখা।

তাহলে বলা ও লেখার মধ্যে যে প্রকাণ্ড বিরোধ আমি সেদিন আলীকে বাড়িয়ে বলেছিলুম সেটা সত্যি এত বৃহৎ নয়?

নিজের কথা বাদ দিয়ে, এক মাধ্যমের উপর আরেক মাধ্যমের প্রভাব সত্যি প্রায় অপরিহার্য এবং সব সময় অশুভও নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজি নাটকের ভাষা আর প্রবন্ধের ভাষায় সুস্পষ্ট ঐক্য আছে, নাটক সেখানে গদ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর উপন্যাসের ভাষা আর প্রবন্ধের ভাষা সত্যি তেমন বিভিন্ন নয়, দুয়েরই পদক্ষেপে মহার্ঘ শালীনতা। একেবারে আজকের কথায় এসে, আধুনিক উপন্যাসের শুধু সংলাপ নয়, বর্ণনাও সিনেমার নির্ভুল প্রভাব বহন করছে। কোনো বাক্য দীর্ঘ নয়, নায়ক বা নায়িকা কেউ, ভয়ানক ভাবাপন্ন হলেও, বেশি কথা বলে না। বেশির ভাগ সময় একটা বাক্য আরম্ভ করে তা শেষ করে না, যেমন প্রাত্যহিক জীবনে হয়ে থাকে। আধুনিক ইংরেজি নাটকেও (নোয়েল কাওয়ার্ড বা টেনেসি উইলিয়ামস বা আর্থার মিলার) লম্বা বক্তৃতা নেই, কারো বক্তৃতায় একটা শক্ত কথা নেই। তাছাড়া লুই ম্যাকনিস বি বি সি-তে চাকরি করেছেন, সি ডে ল্যুইস বেতারের জন্তে অনেক লিখেছেন। দুজনের কবিতায়ই কি তার আভাস মেলে না? সমরসেট ম'ম আগে নাটক লিখে পরে উপন্যাসে হাত দিয়েছেন, তাঁর উপন্যাসের সংলাপ পড়লেই কি তা বোঝা যায় না?

প্রভাব আছে। প্রভাবটা'ও দ্বিমুখীন। কথক লেখক হলে তার লেখায় যেমন কথকতার স্বর থাকবে, তেমনি লেখক কথক হলে, বা লেখায় কথার প্রভাব স্বীকার করলে, তার কথায়ও যৎকিঞ্চিৎ মুদ্রিত রচনার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তবু প্রভেদ আছে। কথক আর লেখক জায়গা বদল করলে—বা একই ব্যক্তি উভচর হতে চাইলে—কথ্য কতগুলি কথা যেমন লেখ্য হবার সম্মান পাবে তেমনি লেখ্য কতগুলি কথাও ক্রমে তাদের অস্পৃশ্য

আভিজাত্য পরিহার করে সাধারণ আলোচনায় প্রচলিত হবে। এমন দান-প্রতিদানে দুয়েরই সমৃদ্ধি।

ভাবসাম্যে ত্রুটি ঘটে যখন এক পক্ষ শুধু দেয়, নেয় না; এবং অপর পক্ষ শুধু নেয়, তার দেবার কিছু থাকে না। আমি বলি, বাঙলায় এই দুর্যোগের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

প্রতিদিন বাঙলা গদ্য চলতি থেকে চলতিতর হচ্ছে। সহস্র ইতর কথা শুধু জাতে ওঠেনি, সাহিত্যের আভিজাত্যই লুপ্ত হতে বসেছে।

ঠাকুরপরিবারের এক ভৃত্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'-তে লিখেছিলেন:

> 'অমুক লোক বসে আছেন' না বলিয়া সে বলিয়াছিল 'অপেক্ষা করছেন।' তাহার মুখের এই সাধুপ্রয়োগ আমাদের পারিবারিক কৌতুকালাপের ভাণ্ডারে অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। নিশ্চয়ই এখনকার দিনে ভদ্রঘরের কোনো কোনো ভৃত্যের মুখে 'অপেক্ষা করছেন' কথাটা হাস্যকর নহে। ইহা হইতে দেখা যায় বাঙলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার দিকে নামিতেছে এবং চলিত ভাষা গ্রন্থের ভাষার দিকে উঠিতেছে, একদিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশপাতাল ভেদ ছিল, এখন তাহা প্রতিদিন ঘুচিয়া আসিতেছে।

কথাগুলি ১৩১৯ (১৯১২, জুলাই) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। লেখা তারও কিছুদিন আগে। কবির আশীর্বাদের প্রথম অংশ দুদিন যেতেই ফলল কেমন করে—বাঙলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার দিকে নামিতেছে।' কিন্তু একচল্লিশ বছর পরেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, কবির ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয়াংশ সত্য হয়নি। আজ ভদ্রঘরের ভৃত্য তো দূরের কথা, ভদ্র প্রভুও 'অপেক্ষা করছেন' বললে হাস্যাস্পদ হবেন। শুধু বাচনে নয়, রচনায় পর্যন্ত সাধুপ্রয়োগ, সযত্ন শব্দচয়ন, বাক্যের সুষ্ঠ গঠন আজ অবাস্তবিক কৃত্রিম বা চেষ্টিত বলে নিন্দিত। চণ্ডালী স্ববাজে বাঙলা সাহিত্য আজ গুরুকে বিদায় দিয়েছে। এ শৌখীন মজদুরি ভালো নয়, ভালো নয়—কেননা, এর প্রেরণা সত্যকার মৈত্রী নয় সংস্কৃতের বন্ধন থেকে মুক্তির অভিলাষ নয়, এর মূলে আছে অজ্ঞতা, অক্ষমতা বা আলিস্য। বা তিনই। বলা বাহুল্য, এ তিনটের কোনোটাই কোনো সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হতে পারে না।

২০—'দেশ'-কে জানিয়েছি যে, রবীন্দ্রসংখ্যার জন্তে বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে না লিখে "বলা ও লেখা" নাম দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখব। ওঁরা রাজী। শুধু তাড়াতাড়ি চাই।

জিজ্ঞাসা করলুম সেই দশজন অ-সাহিত্যিক মহারথীদের কাছ থেকে কোনো উত্তর পেয়েছেন কিনা। বিরস উত্তর এলো: 'তিনচারজনকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলুম। কেউই রাজী হলেন না।' একজন (বিজ্ঞানী) বললেন, তিনি বাঙলা বই এত কম পড়েছেন যে, সে সম্বন্ধে কিছু বলতে তাঁর অসীম লজ্জা। আরেকজন (ঐতিহাসিক) বলেছেন, গত দশ বছরে তিনি দুটি কি তিনটি বাঙলা বই পড়েছেন, তা থেকে কোনো রায় দেয়া অন্যায় হবে। বাকি নিমন্ত্রিতদেরও উত্তর নেতিবাচক। তার কারণও এক, বাঙলা বই তাঁরা পড়েন না।

বাঙলা লেখকদের আত্মতৃপ্তি এটা জানলে প্রশমিত হবে, আশা করি। একবার ভাবছিলুম, বলব যে, ওই উত্তরগুলিই ছেপে দেয়া উচিত: লোকে জানুক যে, 'আ মরি বাঙলা ভাষা' বলে যাঁরা সভাসমিতিতে অশ্রুবর্ষণ করেন তাঁদের সত্যকার বাংলা সাহিত্যপ্রীতি কতটুকু।

বাঙলা সাহিত্যের প্রতি এই নিরুদ্বেগ ঔদাসীন্যের সংবাদটা চতুর্দিকে ঘোষিত হওয়া উচিত আরো একটা গুরুতর কারণে। এই জন্তে যে, শিক্ষিত সমাজের অবজ্ঞার ফলে বাঙলা সাহিত্য সত্যি অবজ্ঞার যোগ্য হয়ে উঠছে।

চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ—এটা শুধু অর্থনীতির নিয়ম নয়, সাধারণভাবে সাহিত্যসৃষ্টিরও।

আমাদের ভ্রূ আমরা তুলি দিয়ে যেখানেই আকি না কেন, লেখা শেষ করে কলমটা তুলে রেখে আমরা সবাই (হ্যাঁ, একটাও ব্যতিক্রম নেই) চাই যে, আমাদের লেখা বহুল প্রশংসা লাভ করুক। বহুর না হলেও, অন্তত তাঁদের যাঁদের ভার্জিনিয়া উল্‌ফ 'কমন রীডার' নাম দিয়েছেন। সেই কমন রীডারদের বুদ্ধির মান যদি নিম্নতম সোপানে এসে ঠেকে, তাহলে বুদ্ধিমান লেখকের লেখনী ভীরু হতে বাধ্য। লেখক যেমন দুরূহ বিষয় পরিহার করে শুধুমাত্র সহজপাচ্য বস্তু পরিবেশণ করে পাঠকের মনকে

প্রথমে শ্রমবিমুখ এবং পরে অক্ষম করে তুলতে পারেন, তেমনি পাঠকসমাজের বৃহদংশ অর্ধশিক্ষিত হলে লেখককেও হয় কলম কানে তুলে রাখতে হয়, তা নইলে শিক্ষা শিকায় তুলে রাখতে হয়। বলা বাহুল্য, এপথে সাহিত্যের মঙ্গল হতে পারে না। এ অবস্থায় যখন লেখা হয় তখন পাঠককে না জেনে ঠকতে হয়, লেখকের জেনে ঠকাতে হয়।

খ্যাতিমান ডাক্তার বা উকিলরা যে 'দেশ'-সম্পাদকের নিমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন তা থেকে আশঙ্কা করি যে, বাঙলা সাহিত্যের পাঠক-শ্রেণীর মধ্যে সাহিত্যবোধ ও সাহিত্যবুদ্ধির অপ্রসার ঘটছে। বোধ ও বুদ্ধির ভিত্তিচ্যুত সাহিত্যপ্রীতি সেই সাহিত্যের সৃষ্টিতে উৎসাহ দিচ্ছে যাতে বোধ বা বুদ্ধির বালাই নেই, আছে ওই যাকে বলে "র'কে বসে খোসগল্পে"র মুদ্রিত রূপ।

না। রসের সন্ধানে আমার লেখনী আমার রসনার দ্বারস্থ যেন না হয়।

২১—কিন্তু কেন এমন হোলো ?

আমাদের কথাশিল্পীদের মধ্যে কই এমন খুব বেশি লোকের কথা তো ভাবতে পারিনে যাঁরা অসামান্য কথনশিল্পী বলে পরিচয় দাবী করতে ইচ্ছুক বা সমর্থ। আমি অবশ্য সবাইকে জানিনে; এমন কি, দূর থেকেও দেখিনি সবাইকে। কণ্ঠস্বরের দিক থেকে, (হায়, শুধু কণ্ঠস্বরের দিক থেকে) প্রবোধকুমার সান্যালের কথা শোনবার মতো। চমৎকার গলা। তাছাড়া? দ্বিতীয় কারো কথা মনে আসছে না।

এঁদের মধ্যে সাহিত্যিক আলাপ আলোচনার সুযোগই বা কোথায়? সজনীকান্ত দাসের বাড়িতে প্রায়ই লেখকসমাগম হয়। সেখানে আমি দুয়েকবার উপস্থিতও থেকেছি। অন্তত সে কয়বার সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আলোচনা হয়েছে বলে স্মরণ করতে পারিনে, যদিও সজনীকান্ত নিজে আমাকে অনেক উৎসাহ ও শিক্ষা দিয়েছেন। বেঙ্গল পাব্লিশার্সের অফিসে দু'চারবার লেখকসম্মেলন দেখেছি। সাহিত্যিক আলোচনা শুনিনি দু'চার মিনিটের বেশি। 'দেশ' পত্রিকার অফিসেও দুয়েকবার একাধিক সাহিত্যিকের দর্শন পেয়েছি: সাহিত্য-আলোচনা শ্রবণ করিনি।

না, দল বেঁধে সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা আজকাল নেই বললেই চলে। 'সবুজপত্র' ঝরে গেছে। 'কল্লোল' স্তব্ধ হয়েছে। 'শনিবারের চিঠি' ও 'পরিচয়' শুধু নাম বদলায়নি, আর প্রায় সব কিছু বদলেছে। আজকাল নিয়মিত কোনো জায়গায় লেখকদের কোনো আসর বসে বলেই জানিনে। সাহিত্যিকরা সবাই আজ একক। একা তাঁরা কথা ক'ন না নিশ্চয়ই।

তবে তাঁদের লেখার উপর কথার এই প্রভাব এলো কোথা থেকে? কেন তাঁরা সবাই এমন একটা শক্ত কথা ব্যবহার করতে ভয় পান যা চায়ের দোকানে ব্যবহৃত হয় না? কেন সবাই এমন ভাববার কথা এড়িয়ে লেখেন যা খবরের কাগজী প্রবন্ধের পর্যাযের একটু উর্ধ্বে?

চৈত্র

৫—আজো পর্যন্ত 'বলা ও লেখা' লিখতে বসা হয়নি। ভাবছি বিদেশী সাহিত্য নিয়েই লিখব কিনা। এটা লিখলে আর যাই হোক, পরিচিত কারো সঙ্গে বিবাদের আশঙ্কা নেই। আমার বন্ধুসংখ্যা এমনিতেই অত্যন্ত অল্প। বাঙলা সাহিত্য নিযে সত্যবাদী ও স্পষ্টবাদী হতে যাওয়া মানে আরো বন্ধুবিচ্ছেদের জন্যে প্রস্তুত হওযা। কিন্তু আমি যে অ-আমি হতে পারিনে! আমি যখন কিছু লিখি তখন আমি—নহি সখা, নহি মিত্র, নহি বন্ধু কোনো লেখকের। এমন কি, পাঠকের।

১২—একটা ছোটোগল্প লিখেছি শনিবারের চিঠির জন্যে। ছোটো নয় খুব, একটু লম্বাই। দৈর্ঘ্যে সমরসেট ম'মের কোনো কোনো গল্পের মতো। এবং শুধু দৈর্ঘ্যে নয। নাম দিয়েছি 'নবীনা।'

বাঙলা ছোটোগল্পের অনেক গুণ আছে. কিন্তু ম'মের চাতুরী নেই। ওই ফরাসি গঠনপারিপাট্য বাঙলা গল্পকে সাবালক করতে পারে। ইংরেজি-না-জানা পাঠকরা যাকে সাইকলজিক্যাল গল্প বলে, সেগুলি আমার মতে গল্পই নয়। গল্প হচ্ছে মোপসাঁর গল্প। ম'মের গল্প। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের গল্প। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্প। আর—না, মাত্র একটা ছুটো গল্প নিয়ে দম্ভ কিছু কাজের কথা নয়।

২০—আজ আবার আলীর সঙ্গে দেখা। আমরা দুজনে একমত যে, যে পাঠক বা সমালোচকরা এক নিশ্বাসে যাযাবর, রঞ্জন ও সৈয়দ মুজতবা আলীর নাম উচ্চারণ করে তারা অর্বাচীন। আমাদের তিনজনের মধ্যে যা সাদৃশ্য তা হচ্ছে এই যে, আমরা সবাই লিখি। সে সাদৃশ্য গাসি মরান, ব্র্যাডম্যান আর আম্পারাওর মধ্যেও আছে।—তিনজনেই খেলে।

২১—রিয়লিজমের নামে পারস্য কার্পেট সরিয়ে চটের গালিচায় বাঙলা সাহিত্যকে বসিয়ে গেছেন শরৎচন্দ্র। আজ সবাই সেই চটটুকুও সরিয়ে নগ্ন পায়ে ধুলোয় বসতে চলেছে! আজই অভিযোগ শুনেছি, আমার 'প্রতিধ্বনি' ও 'বিকল্প' পর্যায়ের কোনো কোনো প্রবন্ধ বড়ো বেশি চেষ্টিত, নির্দৃট ও দুর্বোধ।

কাকে বোঝাব যে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর "প্রহাসিনী" বা "সহজ পাঠ" নয়?

২৫—আরো একটা বছর শেষ হতে চলল। আর ঠিক একমাস পরে রবীন্দ্র-জন্মদিবস। আমার এখনও সেই 'দেশ' পত্রিকার জন্যে প্রবন্ধটা লেখা হোলো না!

বৈশাখ ১৩৬০

১—ঠিক লাইনগুলি মনে পড়ছে না। 'সঞ্চয়িতা'ও নেই হাতের কাছে। কিছু এইরকম:

নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
সেই তোর রুদ্রের প্রসাদ। সেই তোর
নববর্ষের আশীর্বাদ।

তাই হোক।

৪—ইংরেজি বা বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় সাহিত্যের চরিত্রগত, মূলগত, প্রকৃতিগত কোনো প্রভেদ যদি আমায় নাম করতে বলা হয়, আমি বলব, তা হচ্ছে কন্টিনেন্টাল লেখকের ইনটেনসিটি ও পার্টিসিপেশন। কাগজের জন্যে বাঙলা প্রবন্ধে এ দুটি কথার বাঙলা কী করব জানিনে। ইংরেজিতে

গ্রেহাম গ্রীন ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো লেখকের এ দুটি গুণ আছে বলে জানিনে। অথচ জিদ, স্টেফান ৎসেইগ, টমাস মান্, সাত্র্, কেম্যু, মোরিয়াক, এমনকি ক্যেসলারের যে কোনো লেখা পড়লে পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। সর্বক্ষণ মনে হয় যে গল্পে বর্ণিত ঘটনায় লেখক অংশ গ্রহণ করছেন, সক্রিয়ভাবে নায়ক-নায়িকার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হচ্ছেন। উত্তমপুরুষের বহুল ব্যবহার সত্ত্বেও ম'মকে কখনো ঘটনার দর্শক ব্যতীত আর কিছু বলে ভ্রম হয় না; যখন ভ্রম হবার সম্ভাবনা ঘটে (যেমন 'কেকস অ্যাণ্ড এল'-এ) ম'ম তখনই ক্ষমা চান। হতে পারে যে, দি অনলুকার সীস মোস্ট অব দি গেম, কিন্তু তীরে দাঁড়িয়ে ডুবুরীর কতটুকু দেখা যায়? আর, সংসারসমুদ্রে ক'জন আমরা সাঁতারু? বেশির ভাগই কি ডুবুরী নই? স্টল থেকে মঞ্চের দৃশ্য সবচেয়ে ভালো। কিন্তু স্টলের লেখক গ্রীনরুমের কতটুকু দেখতে পান? সাহিত্যের চরিত্র কি শুধুই হ্যারল্ড নিকলসনের 'পাব্লিক ফেসেস' হবে? য়ুরোপীয় সাহিত্যে অনুভূতির তীব্রতা (ইনটেনসিটি) আসে লেখ্য বিষয়ে লেখকের সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা (পার্টিসিপেশন) থেকে।

৫—আমার একটা মুশকিল এই যে, আমার মাথার মৌমাছিগুলি একবার গুঞ্জন শুরু করলে আর থামতে চায় না। এখনো মাথায় ঘুরছে সেই বলা ও লেখার কথা।

একটু আগে বিশে মার্চের টাইমস্ লিটবেরি সাপলিমেন্টটা হাতে এলো। সঙ্গে আছে আজকের ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে ষোলো-পাতা সংযোজনী। তার মধ্যে একটি প্রবন্ধের নাম "দি লিটবেরি লাইফ"।

শিল্পীদের মধ্যে ভাবের প্রত্যক্ষ আদান-প্রদান ফরাসি দেশে, বিশেষ করে প্যারিসে, প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের মতো। প্রত্যেক লেখক কোনো সার্ল, ক্লাব বা কাফের সদস্য। রোজ সন্ধ্যায় সেখানে সবাই আসবে—সমমানস লেখকদের সঙ্গে এক গ্লাস ক'ঞাক, ভ্যাঁ রুজ বা আবসাঁৎ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করবে। গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় শিল্পীদের হাতে নবাগত অনুরাগীদের উপনায়ন হবে। এ না করলে তুমি লেখক নও। তোমার বই লিখে তুমি অন্য লেখকদের শোনাবে, তুমি শুনবে অন্য লেখকদের নতুন বই। ছাপা হবার আগে

সমালোচনা হবে। যেই কেউ একটা মূলগতপ্রশ্ন তুলে প্রবন্ধ লিখল, তাই নিয়ে প্রত্যেক গোষ্ঠীতে তুমুল বিতর্ক চলবে। গ্লাস ওলটাবে, দোয়াত ওলটাবে। সাহিত্যের আসর ওদেশে সদা সরগরম। নিভৃতে সৃজনরত নিরীহ লেখক ওদেশে নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম।

এই অনুষ্ঠানের আতিশয্য ঘটতে পারে। কেউ কেউ তখন প্যারিস থেকে পালিয়ে গিয়ে রিভিয়েরা বা কোনো গ্রামে গিয়ে লিখতে বসেন। কিন্তু পরে আবার প্যারিসে এসে তাঁদের সেই কাফেতে রোজ সন্ধ্যায় দর্শন দিতে হয়। আবার আলোচনা করতে হয়। সাহিত্যিক চিত্ত সেখানে সদাসজাগ। লেখক শুধু লিখবেন, এবং লেখার টেকনিক নিয়ে বিষয়বস্তু নিয়ে, ফর্ম নিয়ে আর আর সকলের সঙ্গে আলোচনা, এমন কি, বিবাদ করবেন না, এমন নীরব লেখক ফরাসিতে দুর্লভ।

লেখকে-লেখকে সেথা নিত্য কোলাকুলি।

কিন্তু কই, লেখা তাতে কতখানি কথার মতো আগোছালো হয়েছে?

ফরাসিতে ওটা সম্ভবই নয়। ওদেশে ভাষার উপর যদৃচ্ছ বলপ্রয়োগ কেউ সহ্যই করবে না। সম্প্রতি কেউ কেউ দু'চারটে আমেরিকান বুলি ফরাসিতে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি আর প্রবীণ লেখকরা দূরবীন আর অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে প্রতিক্ষণ প্রহরিতা করছেন। ফরাসি সাহিত্যে স্বাধীনতার সীমা নেই, কিন্তু ভাষার সতীত্বে হস্তক্ষেপ চলবে না। লেখকে লেখকে নিরন্তর আলোচনা সেখানে ভাষার ও সাহিত্যের একাধারে নিরাপত্তা ও প্রগতির সহায়তা করে। বাঙলা দেশে কেন এমন হয় না?

হয় না। উল্টোই হয়। প্রবীণ লেখক নির্বিচারে প্রশংসা বিতরণ করে প্রশংসিতদের স্তুতি কুড়িয়ে তুষ্ট থাকেন। কদাচ কোনো ব্যভিচারীর প্রকাশ্য সমালোচনা করে কারো বিরাগভাজন হতে চান না।

এখানে লেখকে-লেখকে লেখা নিয়ে বিবাদ নেই। একমাত্র যে সাম্প্রতিক বিবাদ স্মরণ করতে পারি তা ছবি নিয়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্র বনাম বুদ্ধদেব বসু।

আর সব চুপ।

আরেকটা কারণ মনে এলো। আগে বলেছি যে, আমাদের লেখা উকিল, ডাক্তার বা ঐতিহাসিকরা পড়েন না। শুনেছিলুম যে, এখানে এক লেখক লেখেন অন্যান্য লেখকদের জন্যে। বোধহয় সেটাও ঠিক নয়। বোধহয় এক লেখক অন্য লেখকের লেখা নিয়ে এখানে আলোচনা করেন না এইজন্যে যে, কারো লেখাই কেউ পড়েন না!

৭—সম্প্রতি কয়েকটি ইটালিয়ান ছবি বাঙলা দেশে জনপ্রিয় হয়েছে। আনন্দের কথা। ওদের বর্তমান দৈন্যের সঙ্গে আমাদের দুর্দশার সাদৃশ্য আছে। ওদের দুর্দশায় ফুল ফোটে, আমাদের ফুল ঝরে যায়। বোমের দহনে ওরা বীণা বাজায়, সাহিত্য সৃষ্টি করে। আমরা?

৮—ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারির 'লিস্‌নার' কাগজে জঁ কক্তোর একটা চমৎকার বেতার-বক্তৃতা মুদ্রিত হয়েছে। আমাদের অবস্থার সঙ্গে দেখছি ফরাসিদেরও মিল কম নয়। কক্তোর বক্তৃতার নামই: ডিস্‌অর্ডার ইন ফ্রান্স!

অগোছালো, কিন্তু—কক্তো বলছেন—ফ্রান্স যেন এমন একটা ঘর যা বাইরে থেকে কেউ দয়া করে গুছিয়ে দিতে না এলে ঘরের মালিক যখন যা দরকার তা টেবিলের তলা থেকে বা আলমারির পিছন থেকে ঠিক বের করতে পারেন। ওঘর অগোছালোই ভালো।

বাঙলা দেশের জন্যেও আমি 'মে-ওয়েস্ট' চাইনে। এখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সচল থাক। কিন্তু বাইরের এই অরাজকতা যদি চিত্তক্ষেত্রে প্রবেশ করে তাহলে ভয়ের কথা। যেমন খুশি লেখা মানে যেমন খুশি ভাবার প্রশ্রয় দেয়া। ক্রমে না ভাবতে অভ্যস্ত হওয়া, মনে অলস হওয়া।

আজকালকার অনেক লেখকের সম্বন্ধে কক্তো বলছেন:

> Instead of being the workman who constructs a table, they dream of also being the mediums who summon up spirits to rap on it. They do not understand that a poet is a labourer and it is only after he has made its table that the public can assume the role of medium and make that table speak or keep still.

বাঙলা সাহিত্যে আড্ডার জন্যে ফরাস চাইনে। টেবল চাই, যার সামনে সোজা হয়ে বসে তবে লিখতে হয়।

৯—'টাইমসে'র ওই সাপলিমেন্টটাতে প্রথম প্রবন্ধ লিখেছেন চার্লস মর্গ্যান। (অবাক কাণ্ড, মূল ইংরেজিতে এই অসামান্য austere, সংযমী, লেখকের বই যদি দুজন পড়ে, ফরাসি অনুবাদে পড়ে দুশো জন!)। তিনি আক্ষেপ করছেন যে, একদিন যেমন ইংরেজি আর ফরাসি সাহিত্য পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করতো, আজ আর তেমন হয় না ; প্রভাব মানে এই নয় যে, একে অপরের অনুকরণ করবে ; শুধু অনুপ্রাণিত হবে। মর্গ্যানের ভাষায় :

> .... M Duhamel and M Mauriac are widely read and honoured in England but no active ferment is caused by them In France our own work appears to have a corresponding effect—and lack of effect. It is received and read and valued but it (the influence) is not, in French literature, seminal, it does not, as Walter Scott did, change the colour of the ink in French inkpots.

স্কটের কথায় মনে পড়ল, বাঙলা দেশের প্রথম উপন্যাসগুলির উপর এই লেখকটির প্রভাব কী গভীর ও ব্যাপক ছিল। শুধু স্কট নয় ; মিল্টন, শেকস্‌পীয়র, শেলি, সুইনবর্ন—এদের প্রত্যেকের একলব্য ছিল এই বাঙলা দেশে। বছর পনের কুড়ি আগেও আমাদের দেশের তরুণ লেখকরা বিদেশী সাহিত্য পাঠ করে স্বভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

কেউ কেউ শুধু অক্ষম অনুকরণ মাত্র করেছিলেন, সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই ; কিন্তু টি এস এলিয়ট, অলডাস হাক্সলে ইত্যাদি লেখকরা তৎকালীন বাঙালী লেখকদের কয়েকজনকে সত্যি অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

আজ আর আমরা ওই ছেলেমানুষিটা করিনে—রামকে রামবাগানের শেলি, শ্যামকে শ্যামবাজারের মিল্টন, যদুকে যাদবপুরের ডিকেনস আখ্যা দিইনে। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের ধুলো দিয়ে ওই সব নকলগড় গড়বার অন্তত একটা ভালো দিক ছিল। উৎকর্ষবিচারের মানটা উঁচু ছিল।

আর আজ? শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির, লিখে রেখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির। দীঘিরও তাইতেই আনন্দ। দীঘির মনেও নেই যে, দূরে নদী আছে, সমুদ্র আছে।

১০—"লেখাটা কী হোলো ?"—"দেশ"।
"আর দুটো দিন।"—"ব"।

তবু লিখতে বসতে পারছিনে। এই ডায়েরির ভূত চেপেছে। এটা ফরাসি ভূত। ও সাহিত্যে জুর্নালের অন্ত নেই। কেউ কেউ আছেন যাঁদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টি তাঁদের জুর্নাল। ইংরেজরা এটা পারে না, (তাই আমরা বুঝি চেষ্টাও করিনে!—ভাবছি আমিই করব। সামান্য উৎসাহ পেলে, আমিই আমার ডায়েরি প্রকাশ করব কয়েক বছর পর পর। কেন নয় ?); এমিয়েলের সঙ্গে কি তুলনা হয় রেনেটের ? না, জিদের সঙ্গে এগেটের ?

ডায়েরি লিখে প্রকাশ করার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছুটা প্রদর্শন-প্রবণতা আছে। ক্যেসলার তো বোধহয় আঁদ্রে জিদকে সরাসরি একজিবিশনিস্ট আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু এটাই বোধহয় পুরো সত্য নয়। অভিযোগটিও অতিরুক্ত। অজন্তার মতো গুহায় যাঁদের শিল্পকর্ম নিহিত নয়, তাঁরা সবাই কি অল্পবিস্তর একজিবিশনিস্ট নন ? য়ুরোপীয় সাহিত্যে যেমন কনফেশনের অন্ত নেই—ক্যাসানোভা, চেলিনি, রুসো, সেন্ট অগাস্টিন, জিদ—কই ইংরেজিতে এমন বুক ছিঁড়ে বাস্তনাম দেখাবার দৃষ্টান্ত তো দেখিনে। ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে এর যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয় কনফেশন সেখানে অবশ্যকর্তব্য। আমার তো মনে হয় সাহিত্যে এর ফলে প্রভূত সমৃদ্ধি হয়েছে। লেখক যদি প্রকাশ্যে তার নিজের কথা বলে, নিজের জীবন নিরাবরণ পাঠকের সামনে তুলে ধরে, তাহলে তা তার সততার পরিচয়।

ডায়েরিটা সেই অসাধু ব্যবসায়ীদের লুকানো দ্বিতীয় হিসাবের খাতার মতো। লেখকদের সাধু আত্মজিজ্ঞাসার জন্যে এটার উপকারিতা আছে বলে মনে করি। সাহিত্যের লাভ হোক বা না হোক, লেখকের নিজের এতে লাভ আছেই।

পাঠকদের সামনে লেখককে প্রসাধনান্তে পরিপাটি বেশে আত্মপ্রকাশ করতে হয়, কিন্তু লেখকের নিজের কাছেও তো একটা হিসাব-নিকাশ চাই। ওটা সাধু হতে হলে ডায়েরিই বিধেয়।

কিন্তু এতে কি অহমিকা প্রশ্রয় পায় ? হবে। আমার সে-ভয় নেই।

১১—এখনো লেখা হোলো না।

একবার ভাবছি, কাজ নেই রবীন্দ্র-সংখ্যায় লিখে। দরকার কী রবীন্দ্র-সংখ্যার? এই বাঙলা দেশে কে কবে কাঁদবে কবির কথা না ভেবে? বা তাঁর কথা মনে না করে কে এর পরে হাসতে পারবে? বা গাইতে? বা প্রেমে পড়তে? বা লিখতে?

লিখতে। হ্যাঁ। তাই রবীন্দ্রসংখ্যার প্রয়োজন আছে। কবির দরকারে নয়, আমাদের দরকারে।

জাপানে না চীনে শুনেছি একটা রীতি আছে যে, বংশপ্রতিষ্ঠাতার সমাধিস্থলে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দিবসে উপস্থিত হয়ে উত্তরাধিকারীদের জবাবদিহি করতে হয়, হিসাব দিতে হয়। বাঙলা লেখকদের পক্ষে পঁচিশে বৈশাখ কবির স্মৃতির এজলাসে সেই হিসাব দাখিল করবার দিন।

আমার নকল হিসাবটা আর যাকেই দিই, কবিকে দিতে পারব না। লুকানো খাতার পাতাই তাই 'দেশ'-সম্পাদকের হাতে দিয়ে ক্ষমা চাইব।

৯ মে, ১৯৫৩

প্রমথ চৌধুরী

যে কোনো রসিক ব্যক্তির ভাগ্যে, লিটন স্ট্রেচি বলতেন, বৃহত্তম অভিশাপ হচ্ছে ফ্রান্সের বাইরে জন্মগ্রহণ করা। প্রমথ চৌধুরীর তা-ই হয়েছিল। শুধু ফ্রান্সের বাইরে নয়, বাঙলা দেশে।

প্রমথ চৌধুরীর এক কঠোর সমালোচক* তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধের মাঝামাঝি তাঁর তূণের তীক্ষ্ণতম বাণটি প্রয়োগ করে লিখেছিলেন: "সত্য বলিতে কি, প্রমথবাবু লেখক নহেন, প্রমথবাবু দার্শনিক নহেন, প্রমথবাবু পণ্ডিত নহেন, প্রমথবাবু সমালোচক নহেন, প্রমথবাবু যুগপ্রবর্তক নহেন, প্রমথবাবু প্রমথবাবু।"—(শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৩৫)। কার [illegible] প্রতিবাদ

* পরে জেনেছি ইনি নাকি শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী।
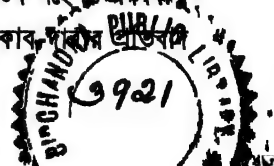
বা প্রত্যাখ্যান এগুলি? প্রমথবাবু একমাত্র লেখক-সমালোচক হওয়া ছাড়া আব কোনো দাবী নিজে বোধ হয কখনোই কবেননি। কিন্তু থাক সে কথা। সমালোচকেব অপবাদপ্রযাসেব অভ্যন্তবে প্রমথ চৌধুবীব ব্যক্তিত্বেব অনন্যতাব যে স্বীকৃতি নিহিত আছে সেটা অনিচ্ছাদত্ত বলেই বিশেষভাবে লক্ষণীয। শুধু অনন্যতাই নয, সে ব্যক্তিত্বেব নীবন্ধ্র আত্মস্থতাও (ইনটেগ্রিটি) সমান স্বপ্রকাশ।

প্রমথ চৌধুবীব 'প্রবন্ধসংগ্রহে'+ এই দুটি বৈশিষ্ট্যই সমভাবে প্রতিভাত। ওই লেখকটি শুধু উনিই আব কেউ নন এমন কথা ক'জন লেখক সম্বন্ধে বলা চলে? 'প্রমথবাবু প্রমথবাবু'—অপবাদকেব এই নিন্দাটি তাই সানন্দে শিবোধার্য। প্রথম পর্বেব ভাষা ও সাহিত্যবিষযক প্রবন্ধগুলিতেও লিপিচাতুর্য, দর্শন, ব্যঙ্গতা, সমালোচনা ও যুগপ্রবর্তনা-প্রযাসেব প্রমাণেব অভাব নেই। বিশ্বসাহিত্যেব পাবপ্রেক্ষিতে প্রমথ চৌধুবীব আলোচনা কবলে আলোচকেব পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হয, প্রমথ চৌধুবীকেও পবোক্ষ সম্মান কবা হয, কিন্তু সুবিচাব হয না। যিনি হযতো যুবোপীয সাহিত্যে খুচবা কাববাবীব স্থান পেতেন, তিনিই বাংলা সাহিত্যে পাইকাব বলে পবিগণিত হতে পাবেন। বাঙলা গদ্যসাহিত্যে প্রমথ চৌধুবী নিঃসন্দেহে মস্ত একজন পাইকাব।

বাঙলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুবীব স্থাননির্ণযে আমাদেব শ্রেষ্ঠ সহাযক আলোচ্য সংগ্রহেব 'ফবাসি সাহিত্যেব বর্ণপবিচয' শীর্ষক প্রবন্ধটি। তাঁব আগেও বাঙলা সাহিত্যেব অনেক গুণ ছিল; কিন্তু সেগুলি একান্ত ঐতিহাসিক কাবণেই ছিল ইংবেজি গুণ। প্রমথ চৌধুবী তাব সঙ্গে যোগ কবলেন কযেকটা ফবাসি গুণ। বাঙলা সাহিত্যেব সমৃদ্ধি এতে দ্বিগুণ হোলো না, কেননা (আমাব এক সহৃদযা পাঠিকা আমাকে স্মবণ কবিযে দিযেছেন) সাহিত্য অঙ্ক নয। এই সাহিত্যেব যোগফলে এক আব একে তাই দুই হযনি, বহু হযেছে। প্রসঙ্গত বলি, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যেব উন্নতিকল্পে প্রমথ চৌধুবী যা যা চেষ্টা কবেছিলেন তাব মধ্যে প্রধান একটা ছিল আমাদেব

+ "প্রবন্ধ সংগ্রহ" (প্রথম খণ্ড), প্রমথ চৌধুরী। (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয, কলিকাতা। ছয় টাকা)

চিন্তা ও তার প্রকাশকে অঙ্কের মতো স্পষ্ট, কঠোর, নিয়মানুগ, নির্দিষ্ট ও দ্ব্যর্থশূন্য করা।

কিন্তু সাহিত্যের ইংরেজি গুণই বা কী, আর ফরাসি গুণই বা কী? প্রমথ চৌধুরী নিজে তা চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। 'সরস্বতীদর্শনের কাল, ফরাসি কবিদের মতে, গোধূলিলগ্ন নয়। যা কেবলমাত্র কল্পনার ধন, সে ধনে ফরাসি সাহিত্য অনেক পরিমাণে বঞ্চিত। অপরপক্ষে এই আলোক-প্রিয়তার ফলে সে সাহিত্য অপূর্ব স্বচ্ছতা, অপূর্ব উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। এর তুল্য স্পষ্টভাষী সাহিত্য ইউরোপে আর দ্বিতীয় নেই।...ফরাসি সাহিত্য এই অর্থে স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিংবা অস্পষ্টতার লেশমাত্র নেই।' একটু পরে বলছেন, 'সংস্কৃতের ন্যায় ফরাসি সাহিত্যও প্রধানতঃ অবজেক্‌টিভ, বাহ্যঘটনা ও সামাজিক মন নিয়েই ফরাসি সাহিত্যের আসল কারবার; এক কথায় ফরাসি জাতির দিব্যদৃষ্টি অপেক্ষা বহির্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি ঢের বেশী প্রখর।'

ফরাসি প্রভাবে প্রমথ চৌধুরী বাঙলায় 'সচেতন সচেষ্ট মনের' গুরুত্ব প্রচার করে আমাদের 'বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জিত ও চিত্তবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল' করতে চেয়েছিলেন। তাঁর নিজের লেখায় অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন এই নীতি যে; 'সমালোচনার বিষয় কেবলমাত্র সাহিত্য নয়, সমগ্র মানবজীবন।' আমরা সাধারণত অশিক্ষিতপটুত্বের অনুরাগী, তাই তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 'সঙ্গীতের মতো সাহিত্যও একটি আর্ট, এবং যত্ন ও অভ্যাস ব্যতীত এ আর্ট আয়ত্ত করা যায় না।' চিন্তায় তিনি চাইলেন যুক্তি এবং তাই তার প্রকাশের জন্যে চাই 'সুগঠিত রচনা'। যে যুগের লেখকদের, 'শব্দের নির্বাচন ও পদের যোজনার প্রতি কোনোই লক্ষ্য' নেই তাকে তিনি আর্টহীন বলে অভিহিত করতে কুণ্ঠিত হননি। বোঝালো ফরাসি সাহিত্যে যেমন করেছিলেন, তেমনি প্রমথ চৌধুরী বাঙলার 'অত্যুক্তি ও অতিবাদ, কষ্টকল্পনা ও অবোধ পাণ্ডিত্য' বিতাড়ন করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মানতেন যে, 'যে জ্ঞান আমাদের জাগ্রত বুদ্ধির আয়ত্তাধীন, এবং যা ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য', এবং এই সত্যের স্পষ্ট প্রকাশের

জন্তে তিনি এমন একটি বাঙলা গদ্য তৈরী করতে চেয়েছেন যা হবে ফরাসির মতো 'সুসংযত, সুসংহত এবং সুশৃঙ্খল।' তাঁর চেষ্টা যতখানি সফল হয়েছিল আমরা তার উত্তরাধিকারী।

তবু ছত্রিশ বছর পূর্বে আনীত এই অভিযোগ আজো সত্য যে 'ইংরেজি সাহিত্যের amateurishness আমরা সাদরে অবলম্বন করেছি, কেননা যেমন-তেমন করে যা-হোক-একটা-কিছু লিখে ফেলার ভিতর কোনোরূপ আয়াস নেই, কোনোরূপ আত্মসংযম নেই।' আমরা সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রেরণা নামক অনির্দেশ্য বস্তুটিকে এত বেশি প্রাধান্য দিতে অভ্যস্ত যে, আয়াস ও সংযমকে প্রমথ চৌধুরী সেই উচ্চাসনে আসীন করে বাঙলা রচনার বয়ঃপ্রাপ্তির পথ দেখিয়েছেন। বস্তুত, রচনার কাজে চেষ্টা, শিক্ষা ও যত্নের প্রয়োজনীয়তা, এবং দৃষ্টি.. পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বের বাণীর প্রচারই বোধহয় বাঙলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ দান। এ দুটিই শক্তিমান গদ্যের পক্ষে অপরিহার্য এবং দুটিই ফরাসি গুণ। এই গুণেরই কল্যাণে প্রমথ চৌধুরী আমাদের সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা 'সফিস্টিকেটেড' লেখক এবং 'সফিস্টিকেশন'কে আমি সংস্কৃতি ও সভ্যতার অপরিহার্য সর্ত বলে মনে করি।

ইংরেজ চলে গেছে, ইংরেজি আমরা ভুলতে বসেছি। অবিলম্বে আমরা যত্নবান না হলে হঠাৎ দেখব আমাদের এমন একটি ভাষা নেই যাতে উচ্চস্তরের চিন্তা ও ভাব সুনির্দিষ্ট প্রকাশ সম্ভব। ফরাসি শিখব? ভালো কথা। আরো ভালো কথা নিজেদের বাঙলা ভাষা ঐ স্তরে উন্নীত করতে চেষ্টা করা। তার জন্তে প্রথম পাঠ প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধসংগ্রহ'। একটু আগে তাঁর যে দুটি দানের উল্লেখ করেছি আমরা তা যোগ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করলে প্রমথ চৌধুরীর এই আশাটি সফল হবে যে, 'প্রাচীন ইউরোপে এথেন্স যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে বাঙলা সেই স্থান অধিকার করবে।'

১৪, নভেম্বর, ১৯৫২

অন্নদাশঙ্কর রায়

সকাল বেলা কাগজ খুললেই নতুন করে মরার কথা। অন্নদাশঙ্কর রায়ের নতুন বইয়ের * নাম ও বিষয় দুই-ই তার বিপরীত। 'হ্যামলেট'-এর প্রহরী ফ্রান্সিসকোর মতো বলি, 'ফর দিস রিলীফ মাচ থ্যাংকস'।

ধন্যবাদ দেবার আরো অনেক কারণ আছে। বাঙলায় এখন আমরা ক'জন লিখছি যাদের রচনা শুধু ইন্দ্রিয়গুলিকে আনন্দ দেয় না, চিন্তাকেও নাড়া দেয়? এমন সহজ অথচ সুন্দর বাংলা লিখতে পারেন ক'জন? আলোচ্য প্রবন্ধ-দশকে উল্লিখিত প্রতিটি গুণ বর্তমান।

অন্য প্রায় যে কোনো বাঙলা প্রবন্ধ-সঙ্কলনের জন্যে উপরে যতটুকু বলেছি তাই যথেষ্ট হোতো। বড়ো জোর যোগ করতে হোতো সুন্দর প্রচ্ছদ ও অনির্ভুল মুদ্রণ সম্বন্ধে আরেকটি বাক্য। কিন্তু অন্নদাশঙ্করের প্রত্যেকটি আলোচনা তার বেশী দাবী করে। ফ্রেমের প্রশংসা করে বিদায় দেবার মতো ছবি নয় এ। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ শেষ করে পাঠককে বলতে হয়, কোন মতটা সে গ্রহণ করবে, কোন্‌টা করবে না। এবং কেন। বলা বাহুল্য, এই মতভেদ পথ নিয়ে, কেননা, আমরা সবাই জানি, মানবজাতির লক্ষ্য সম্বন্ধে ইসাইয়া থেকে কার্ল মার্কস পর্যন্ত, প্রায় ত্রিশ শতাব্দী ধরে, মোটামুটি মতৈক্য রয়েছে। বিবাদ পথ নিয়ে। এখানে অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে তর্কে আমার সুবিধা এই যে, তিনি গুটিকয় মতবাদের কাছে বাগ্‌দত্ত, আমি এখন পর্যন্ত 'আনকমিটেড'।

সবগুলি প্রবন্ধই অবশ্য এই মূলগত প্রশ্ন নিয়ে নয়; যদিও সবগুলিতেই, প্রত্যেক ভালো লেখার মতো, যতগুলি উত্তর আছে ঠিক প্রায় ততগুলি প্রশ্ন আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করি, ভারতের পরাধীনতাবরণের দিনক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে অন্নদাশঙ্কর গোটা মুশলিম আমলটার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, অন্তত

*নতুন করে বাঁচা : অন্নদাশঙ্কর রায়। (এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড, কলিকাতা। ১৸০)।

একজন অনবজ্ঞেয় ঐতিহাসিক তার প্রতিবাদ করেন (নীরদ সি চৌধুরীর ‘অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইণ্ডিয়ান’, ৪৭৫ পৃষ্ঠা)।

দ্বিতীয়ত, ‘ধর্ম নয়, ধর্মান্ধতাই জনগণের আফিম’ এমন উক্তিতে এই সহজদৃশ্য ঘটনার স্বীকৃতি নেই যে, ধর্মের ‘আফিম’ খেয়েই জনগণ ধর্মান্ধ হয়। যদি সত্যি ‘দোষটা ধর্মের নয়’ যে রোগী তা সেবন করেছে তার, তাহলে বৈদ্যের কি উচিত নয় অন্য ওষুধের ব্যবস্থা করা?

তৃতীয়ত, সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টা যতই সাধু হোক ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার সাফল্য সম্বন্ধে অত্যধিক আশা পোষণ করা নিশ্চয়ই ইতিহাসবিরুদ্ধ। অন্নদাশঙ্কর বলছেন, ‘পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের মধ্যে যেন ধর্মভেদ না জাগে।’ কিন্তু তাকে ঘুম পাড়াবে কে? ধর্মকে অস্বীকার না করে ধর্মে-ধর্মে সত্যের ভেদ অস্বীকার করবে কে বা কী করে? আর, তা করলে কি সত্যের অপলাপ হবে না? সত্যের প্রভেদ না থাকলে একাধিক ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল কেন?

কোলরিজের কথাটা একটু বদলে বলি, আমার বিশ্বাস এই যে অন্তত সাময়িক একটা suspension of Belief না ঘটলে মানবীয় সংস্থাগুলির সম্যক পরিচয় আমরা পাব না। সমাধানও না।

ফিরে আসা যাক অন্নদাশঙ্করের নবজীবনের নকশায়। সেজন্যে সর্বাগ্রে আলোচ্য বইয়ের প্রথম ও সবশেষ প্রবন্ধ দুটি। ‘সমাজের কথা’ প্রবন্ধে লেখক মহাচীনের পুনর্যৌবন লাভকে স্বাগত করেছেন। এখানে তিনি স্বীকার করছেন যে আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে সামাজিক ব্যবস্থার।

তবে কি অন্নদাশঙ্কর কম্যুনিজমের কাছে বাগ্‌দত্ত? ঠিক উল্টো, কেননা তিনি বলছেন, “সমাজকে ঢেলে না সাজালে আর্থিক সুব্যবস্থা সুদূরপরাহত,” কম্যুনিস্টরা যাকে বলবে ঘোড়ার সামনে গাড়ি জোতা।

সে যাক। ‘অন্তরে অন্তরে নৈরাজ্যবাদী’ হয়েও অন্নদাশঙ্কর এঁর নতুন সমাজের একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা করেছেন। এটির ইংরেজি নাম হতে পারতো ‘এ নট সো ইনটেলিজেন্ট উওম্যান’স গাইড টু ক্যাপিট্যালিজম, সোস্যালিজম

এণ্ড গান্ধীজম্।' সমসাময়িক সমস্যা সম্বন্ধে এমন আলোচনা বেশী দেখিনি, এমন য়ুটোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীও সমান বিরল। ফলে সারা বইটিতে অতিসরলী-করণের দৃষ্টান্তের প্রাচুর্য। 'বেশী দরে কিনলেও দণ্ড, বেচলেও দণ্ড।' দণ্ড কে দেবে? রাষ্ট্র। তবে রাষ্ট্রের শক্তির ম্যাক্সিমাম বেঁধে দিতে হবে। কিন্তু মুশকিল এই যে, রাষ্ট্র শক্তিশালী হলে তার শক্তি কেবলই বাড়তে থাকে। অপর পক্ষে, দুর্বল সংস্থার মতো অভিশাপ আর নেই। যথা কুয়োমিন্টাং বা কলকাতা কর্পোরেশন। আমি অ্যাকটনের কথা বদলে বলি, 'অল পাওয়ার করাপ্টস, পার্শ্যাল পাওয়ার করাপ্টস অ্যাবসলুটলি।' অন্নদাশঙ্কর ক্ষমতার প্রয়োজন স্বীকার করেছেন, কিন্তু আসল সমস্যাটার সম্মুখীন হননি। অবশ্য, অহিংসাকে অলঙ্ঘ্য বলে মনে করবার এই অবশ্যম্ভাবী পরস্পর-বিরোধিতার সমাধান গান্ধীজীও করে যাননি।

অন্নদাশঙ্করের দ্বিতীয় অলঙ্ঘ্য সূত্র যন্ত্রনিয়ন্ত্রণ। ভাবী শিল্প চাইনে হালকা শিল্প চাই। এ যেন বলা যে, কোলে দু' বছরের খোকা চাই, কিন্তু পরে সে যেন পাঁচ বছরের ছেলে না হয়। ধারণাটাই স্ট্যাটিক কেননা হাল্কা শিল্প হালকা থাকে না থাকতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গীর যুক্তিসঙ্গত পরিণাম এই যে, তিনি বলছেন, "অধিকাংশ ক্ষেত্রে বার্টার বা দ্রব্য বিনিময় চলবে।"

এ কি নতুন করে বাঁচা না পুরানো করে মরা? পুরানো করে বাচার অসম্ভবপরতা তো অন্নদাশঙ্কর নিজেই বলেছেন "প্রকৃতির কাছে আহার প্রত্যাশা করতে পারে কেবল সেই মানুষ, যে প্রকৃতির অভিপ্রায় অনুসারে বিবর্তিত হতে প্রস্তুত।'

আগেই বলেছি, আমি অকৃতজ্ঞ। তাই নেতি নেতি ছাড়া আর কিছু বলবার দায় নেই আমার। এটাও একেবারে অকাজ নয়। পড়েছি, ১৭৭৫এ লিসবন ভূমিকম্পের পরে একজন ফেরিওয়ালা নাকি ভূকম্পনিবারক বড়ি বিক্রি করছিল। একজন অবিশ্বাসীর প্রশ্নের উত্তরে বিক্রিওয়ালার অকাট্য যুক্তি ছিল: মানলুম, এ' বড়িতে ভূকম্প বন্ধ হয় না। কিন্তু এর বদলে খাবে কী?

বিকল্প বটিকার খবর সত্যি জানিনে, কিন্তু চলতি বড়িটা যে অব্যর্থ নয় সেকথা বলা দরকার। যেমন দরকার মাঝে মাঝে স্মরণ করা যে, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। অন্নদাশঙ্করের স্মারকের সার্থকতা সেইখানে।

৩০ মে, ১৯৫৩

অঁদ্রে সিগফ্রিড

বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা আসন্ন—এই রকমের ভবিষ্যদ্বাণী এত ধর্মপ্রচারক ও পলিটিশান এতবার করেছেন যে, আজ আমরা অমন কথা আর কানে তুলিনে। হাই তুলে বলি, তাই নাকি! সুধী ফরাসী অঁদ্রে সিগফ্রিড বোধহয় এই উদাসীনতা আশঙ্কা করেই ওকথা বলে ক্ষান্ত হননি। তাঁর নতুন বইয়ের* অন্তিম বাক্যটি হচ্ছে: "পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন একটি অধ্যায়ের উদ্বোধন হচ্ছে। বোধহয় শুধু নতুন অধ্যায়ের নয়, নতুন একটি গ্রন্থের।' কানের তন্দ্রা ভাঙে এমন কথায়।

কান সজাগ করবার দ্বিতীয় কারণ আন্তর্জাতিক বিদ্বৎসমাজে ডক্টর সিগফ্রিডের প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৪ থেকে তিনি ফরাসি একাডেমির সদস্য। তাঁর বহুমুখীন বিদ্যার (রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস দর্শন, সাহিত্য) সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভ্রমণজাত বহুমুখীন অভিজ্ঞতা। বছর দুয়েক আগে, দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি ভারতেও এসেছিলেন। সর্বোপরি তিনি শুধু বিশেষজ্ঞ নন। তিনি বিশ্বনাগরিক। তদু[illegible] বি[illegible]নিক সু[illegible] মানবিক।

এই মানবিকতা কিন্তু বিশ্ব[illegible] হয়নি। আর্নল্ড টয়েনবির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে অঁদ্রে সিগফ্রিডের [illegible] বিচারের ব্যাপ্তিতে আর সামগ্রিক উপলব্ধির অভিলাষে। কিন্তু টয়েনবি যে বারবার বলছেন, "Civilizations, like nations, are plural, not singular,"

* *The Character of Peoples* by André Siegfried Translated by Edward Fitzgerald (Jonathan Cape, London, 12s 6d)

সিগফ্রিড এই সতর্কবাণী সর্বদা স্মরণ রাখেননি। পশ্চিম য়ুরোপীয় সভ্যতাই তাঁর বিচারে একমাত্র সভ্যতা। তাই অশ্বেত জাতিদের সম্বন্ধে নানা অপ্রিয় মন্তব্য করতে তাঁর বাধেনি। "য়ুরোপীয়সৃষ্ট বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি এশিয়াটিকদের কাছে হস্তান্তরিত হলে সামগ্রিকভাবে সভ্যতা দীন হবে" (১৮৫ পৃষ্ঠা)। "পরিচালনক্ষমতায় নিকৃষ্ট য়ুরোপীয়ও যে শ্রেষ্ঠ এশিয়াটিকের চেয়ে দক্ষ, একথা বুঝতে দেরি হয় না" (১৮৪ পৃষ্ঠা)। কথাগুলি পুরোপুরি মিথ্যা হলে উপেক্ষা করা সহজ হতো।

কিন্তু সিগফ্রিড হচ্ছেন পশ্চিম য়ুরোপীয় সভ্যতার অধিবক্তা। তাই সেই হিসাবেই তাঁর বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁর অধিবচন অত্যুক্তিমুক্ত নয়, কিন্তু সেটা অক্ষমণীয় নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, তাঁর বিশ্লেষণে আছে অসামান্য পাণ্ডিত্য। তাঁর পশ্চিমী জাতি-চরিত্রগুলিকে তিনি দেখিয়েছেন ইতিবৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতে—অর্থবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব নৃতত্ত্ব, আবহতত্ত্ব, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি নানা দিক থেকে। এমন কি অনুবাদেও, প্রকাশ সদাস্বচ্ছ। আগাগোড়া আছে ফরাসি স্বচ্ছতা আর যুক্তিপ্রবণতা।

এই যুক্তির পদ্ধতিটি আরোহী, অর্থাৎ ইন্‌ডাক্টিভ্। আগে বিশেষ, পরে সাধারণ। অধ্যায়গুলির শিরোনাম থেকেই বক্তব্যের অনেকটা অনুমানসাধ্য। যেমন, 'ল্যাটিন বস্তুধর্ম,' 'ফরাসি উন্মনশালিতা', 'ইংরেজি সংকল্প-দৃঢ়তা', 'জর্মান নিয়মনিষ্ঠা', 'রুশ রহস্যবাদ' আর 'অ্যামেরিকান গতীয়তা'। বহুজাতিক একটি জটিল মহাদেশের চরিত্রনির্দেশ বহুবিঘ্ন এবং প্রবীণের (লেখকের বয়স ৭৭ বৎসর) পক্ষেও দুরূহ কার্য। কয়েকটা লেবেল এঁটে সে কাজ শেষ করলে অনেকের উপর অবিচার অবশ্যম্ভাবী। হয়েছেও তাই। ফরাসিদের প্রশংসা অপরিমিত, ইংরেজদেরও। জর্মানির বেলায় ১৮৭১-এর স্মৃতি জাগরূক। রাশিয়ার বেলায় 'সোভিয়েটিক' ইত্যাদি বিশেষণ উদ্ভাবন করেও লেখক বিশেষ আলোকপাত করতে পারেননি। রুশ-রহস্যের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন রুশ রহস্যবাদিতার নজির দিয়ে। তার উপর আছে টয়নবি-উদ্ভাবিত রাশিয়ার বাইজেন্টাইন ঐতিহ্যের অতি-দূরানীত থিসিস।

এই রকমের পক্ষপাতিত্ব ছাড়াও জাতি-চরিত্র বিশ্লেষণে সিগফ্রিড এমন কতগুলি অতিপণ্ডিতীর পরিচয় দিয়েছেন, যা প্রমাণের অতীত। কে বলবে বর্তমান ইংরেজ চরিত্রের ক' আনা স্যাক্সন আর ক' আনা এ্যাংলো? কে বলবে আমার চরিত্রে কতটুকু অস্ট্রিক, কোনটুকু দ্রাবিড়, আর কতখানি উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য? কতক ইতিহাসে হারিয়ে গেছে, বাকিটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আদি রূপ বদলেছে। জটিলকে জটিল বলে মানতে লজ্জা কী? বিশেষ করে, সহজ করতে গিয়ে যদি সত্যকে খাটো করতে হয়? এর চেয়েও নৈরাশ্যজনক হচ্ছে সিগফ্রিডের বিশ্বাসপরায়ণতা। মনে হয় বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে তাঁর কতগুলি মত কার্টুন থেকে নেয়া, অনেকগুলি টমাস কুকের গাইড বই থেকে।

এসব ত্রুটি সত্ত্বেও 'দি ক্যারেক্টর অব পিপলস' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। লেখকের প্রশংসনীয় প্রয়াসের সাফল্য যে পরিমিত হয়েছে, তার জন্যে তাঁর অক্ষমতার চাইতে তাঁর বিষয়ের অপরিমেয়তাই বেশী দায়ী।

লেখকের সত্যকার কৃতিত্ব তাঁর বিশ্লেষণে আর সাধারণ-সূত্র-নির্দেশে। লেখক যে-পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার এত বদল হয়েছে, প্রিয় ও পরিচিত পরিবেশের অন্তর্ধানে তিনি এত ব্যথিত হয়েছেন যে, তাঁর কৈশোরে প্রগতির সম্বন্ধে যে বিশ্বাস ছিল তা আজ আর অবশিষ্ট নেই। মাঝে মাঝে তাই তাঁর সন্দেহ হয় যে, স্বর্ণযুগ চিরতরে অতীতের গর্ভে অন্তর্হিত হয়েছে।

পশ্চিমী সভ্যতার শবাধার ঘিরে লেখকের ক্রন্দনের প্রধান কারণ বর্তমান যন্ত্রযুগের অমানুষিকতা। অথচ তিনি বলছেন, এই যন্ত্রোদ্ভাবনী শক্তি য়ুরোপীয়ের বৈশিষ্ট্য, তার চরিত্রের সঙ্গে কার্যকারণ সম্বন্ধে যুক্ত। প্রাচ্যে এই যন্ত্র জাতীয়-চরিত্র-বিরোধী, বাইরে থেকে চাপানো, তাই প্রায়শই বিকল। 'য়ুরোপীয়ান-ওনলি' গাড়ি চেপে বাণিজ্য বিজ্ঞাপন দিয়ে এ উক্তির প্রতিবাদ করব কী করে?

পশ্চিম য়ুরোপীয় সভ্যতাকে তিনি দুভাগ ভাগ করেছেন। এ বিচারে আমেরিকা পশ্চিমী সভ্যতার শরিক, কিন্তু য়ুরোপীয় নয়। অপর পক্ষে রাশিয়া

অংশত য়ুরোপীয়, কিন্তু পশ্চিমী নয়। অথচ ১৮৩৫ সালে মঁসিয়ে দ্ তুকেভিল ঠিক যেমনটি বলে গিয়েছিলেন—আগামীকাল তার স্বয়ম্বর-সভায় এ দুয়েরই কোনো একজনের গলায় মালা দিতে উদ্যত। তৃতীয় কারো দিকে তার মন নেই। পশ্চিম য়ুরোপীয় সভ্যতার অভিমানক্ষুব্ধ ঘটক সিগফ্রিড যেন বলছেন, "যাচ্ছো তুমি হেসে হেসে, কাঁদতে হবে অবশেষে।"

সে সভ্যতার কোন গুণ হারিয়ে কাঁদতে হবে, তার ব্যাখ্যান সিগফ্রিডের চেয়ে ভালো করে সম্প্রতি কেউ করেননি। সভ্যতার সংজ্ঞা সঙ্কীর্ণ করে তিনি বলেছেন যে, এ-সভ্যতার মূলে আছে ক্রিস্টিয়ানিটি, আছে শ্বেতকায়তা। এ দুটোর একটাও আমার নেই। তবু তাঁর বিলাপে আমি আন্তরিকভাবে অনুকম্পায়ী।

১৬ অগস্ট, ১৯৫২

আঁতোয়ান দ্ সাঁ-জুপেরি

আমাদের কবি আরব বেদুইন হতে চেয়েছিলেন। হননি। কিন্তু য়ুরোপে গত কয়েক বছরের মধ্যে একাধিক সাহিত্যিক বাইরনিক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কল্পনাবিলাসের বিনিময়ে কর্মজীবন বরণ করেছেন। স্পেনের যুদ্ধের অরয়েল-ক্যেসলারদের আগে টি ই লরেন্স একক বীরত্বে এবং অসামান্য প্রতিভায় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন করে নিজের নাম লিখে গেছেন, গত মহাযুদ্ধে আঁতোয়ান দ সাঁ-জুপেরি ফরাসি সাহিত্যে অনুরূপ স্বাক্ষর অঙ্কন করেছেন। সাদৃশ্যটা সত্যি অল্প নয়; উদ্দাম জীবনের অস্থির চঞ্চলতা দু'জনকেই আকর্ষণ করেছিল প্রকৃতির সেই নিষ্ঠুর বিস্ময়ের প্রতি, মরুভূমির প্রতি।

তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত এই *Citadelle* গ্রন্থের* পূর্বেও সাঁ-জুপেরির অন্যান্য বই ইংরেজিতে অনূদিত এবং প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু

* *The Wisdom of the Sands* by Antoine de Saint-Exupery. Translated by Stuart Gilbert (Hollis & Carter, London, 21s).

আমাব কানে আসেনি, হাতে তো নয়ই। আমি প্রথম তাঁব নাম শুনি গত বছব বি বি সি-ব থার্ড প্রোগ্রামে "পোর্ট্রেট অব্ অ্যান্ এয়াবম্যান্" নামক একটি অনুষ্ঠানে। অদ্ভুত, কৌতূহলোদ্দীপক জীবন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, কিন্তু কী এক অনির্বচনীয় আকুলতা তাঁকে বাব বাব টেনে নিয়ে যায় মেঘেব কোলেব অসহায়তায়। শেষে একবাব নিয়তিকে বড়ো বেশি প্রবোচিত কবা হোলো। ১৯৪৪-এব ৩১ জুলাই—তখন বয়সে তিনি তরুণ ন'ন—অনেকেব নিষেধ সত্ত্বেও বিমান নিয়ে উড়লেন আকাশে। আব ফিবলেন না। দুর্ঘটনা না স্বেচ্ছামৃত্যু? কখনোই বোধ হয় সঠিক জানা যাবে না। তাই সাঁ-জুপেবিব স্বল্প-পবিমাণ বচনাব ভূবিপবিমাণ প্রতিভা তাঁব অনতিদীর্ঘ জীবনেব আকস্মিক অবসানেব অনুত্তবতাব সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে বইল।

ইংবেজি বা বাঙলা সাহিত্যে *Citadelle*-এব সঙ্গে তুলনীয় কোনো বইয়েব নাম স্মবণ কবতে পাবি না। অনুবাদে অদ্ভুত ভাষা এব বাইবেলী। ভাব? ইংবেজিতে জুড়ি খুঁজে পাচ্ছি না। এই ধবনেব উচ্ছ্বাসমুখব গদ্য ও ভাষায় বচনা। বাংলাতে ববীন্দ্রনাথ যদি আবো পবিণত বয়সে লিপিকাব গদ্যে তাঁব 'গীতাঞ্জলি' ও 'মানুষেব ধর্ম' বচনা কবে পুনর্নির্মাণেব প্রেবণা নিয়ে একটি বই লিখতেন তাঁব 'শান্তিনিকেতন'-এব সমাহিত সুবে, তা হলে হয়তো *Citadelle*-এব অনুরূপ কোনো বই হোতো। বলা বাহুল্য, আমাব মতেব দৃষ্টান্ত-প্রশ্ন একান্তই ব্যক্তি-বিলাস, অর্থাৎ আলোচ্য বইখানি একান্তই ফবাসি; ইংবেজ ও অবাঙালী।

আধাবে রূপকথা, প্রকাবে রূপক, এই বইটিতে কাহিনী সামান্য। পদ্ধতিটি বর্ণনাব, শুরু যেন সঞ্জয় উবাচ—" বলে। নায়ক তথা সূত্রধব হচ্ছেন এক মরুবাজ্যেব বাজকুমাব। বাজাব মৃত্যু হয়েছে, যুব-বাজেব এবাব বাজ্যভাব গ্রহণ কবতে হবে। এ ভাব লঘু নয়, এব বহনেব জন্যে তাঁকে যোগ্য হতে হবে। সত্যকাব বাজা কে? অর্থাৎ, সত্যকাব মানুষ কে? এই তাঁব জিজ্ঞাসা। এ বলে, বাজাকে কান পেতে শুনতে হবে কোমল করুণাব আকুতি। ও বলে, বাজাকে সাড়া দিতে হবে কঠোব

কর্তব্যের রুদ্র আহ্বানে। এই দ্বিধার ঊর্ধ্বে যুবরাজকে গড়তে হবে মন্দির—যা হবে দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য, গৃহের মতো নিবিড়।

এ মন্দির কিসের মন্দির? হায়রে, কেমন করে বোঝাব? সাঁ-জুপেরি বলছেন, "একটি লোক তার গৃহকে বোঝবার জন্যে যদি বাড়িটাকে টুকরো টুকরো করে, তবে সে কি পায় গৃহের মর্ম? সে তার সামনে দেখবে স্তূপীকৃত ইঁট আর চুণ আর সুড়কি; এগুলোর যোগফল কি গৃহ?" গৃহের সত্তা তার অবিচ্ছিন্ন সমগ্রতায়। মানুষেরও। গোটা সৃষ্টির এই গোটা সমগ্রতার উপলব্ধি—যুবরাজের তথা সাঁ-জুপেরির এই হোলো লক্ষ্য। "সমস্তকে জেনেছ কখন?" নয়; সমস্তকে না জেনে কিছুই জানা হয়নি। 'ক্ষণিকা' নয়, 'বলাকা'।

'মানসী'ও নয়, এবং এইটেই সবচেয়ে বিস্ময়কর। সেই বিপ্লবের পর থেকে স্বাধীনতা সাম্য আর সৌভ্রাত্র এই তিনটি [illegible] যে একাধিপত্য ভোগ করে এসেছে, সাঁ-জুপেরিতে তাদের প্রশ্রয় নেই। স্বাধীনতাকে তিনি দেখছেন উচ্ছৃঙ্খলতায় উৎকীর্ণ হতে। সাম্যকে তিনি দেখেছেন সকল উদ্যমের সমাধি হতে। সৌভ্রাত্রে তিনি দেখেছেন নেতৃত্বের পরাভব। তার পরে কেমন করে তিনি এই ত্রয়ীকে মানবের ত্রাণকর্তা বলেন? প্রেম, সে চরিত্রকে শিথিল করে। দয়া হয়ে পড়ে দুর্বলের ক্ষীণ আত্মসমর্থন, ক্লৈব্যের ক্রোড়।

তবে কী হবে মানুষের কর্মের প্রেরণা?

ঠিক এইখানেই নৈতিক [illegible] নৈতিক চরিত্রোৎকর্ষের পূজারী হয়ে ওঠে। জঁ ক্রিস্তফে এই দ্বন্দ্ব বারবার দেখা গেছে। সাঁ-জুপেরি আবার চাইছেন স্বাধীন [illegible] সংযমের সাধক হতে। ফ্রীডম চাইনে, চাই ডিসিপ্লিন। সুখের নীড় চাইনে, চাই কীর্তির স্তম্ভ। প্রগতিবাদী পাঠক নিশ্চয় ইতিমধ্যে বলছেন,—বাকিটা জানি, নাম তার ফ্যাসিজম।

হয়তো তাই। হয়তো নয়। কিন্তু এ বইয়ের অমন ব্যাখ্যা অবাস্তব। একটি অসাধারণ শিল্পী তার বহু বৎসরব্যাপী প্রবহমানা চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ

করেছেন। অসংখ্য এর অসঙ্গতি—যেমন অসঙ্গতি মায়ের প্রহারে আর আদরে। অনেক এতে পুনরাবৃত্তি—যেমন পুনরাবৃত্তি উপাসনার মন্ত্রে। যুক্তিতে এর পরস্পরবিরোধিতার শেষ নেই, যেমন সঙ্গীতে তার শুরুও নেই। এটি প্রার্থনা; একটি ব্যাকুল হৃদয়ের বাসনা। বাসনা শুধু নয়, সাধনা। মরুভূমির ধূসরতায় আত্মাবলুপ্তি নয়, তার ভয়ালতায় অগ্নিপরীক্ষা। সঞ্চয়ের প্রত্যাখ্যান তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়; তার সঙ্গে চাই সৃষ্টিতে তন্ময়তা। এই সৃষ্টির বিচার সফলতায় ততটা নয়, যতটা নিষ্ঠায়। কর্তব্য সৃষ্টিতে মূর্ত হবে। সমগ্র সত্তা দিয়ে সেই সৃষ্টি-কার্যে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তবে মরুতে ফুল ফুটবে, ফল ধরবে। তবে সৃষ্টি হবে। তবে সৃষ্টি সার্থক হবে। তবে স্রষ্টা সার্থক হবেন।

নানা মন-ভুলানী মতবাদের হাতছানি উপেক্ষা করে দৈববাণীর কঠোরা কন্যার বর কণ্ঠে ধারণ করে সাঁ-জুপেরি আর যাই করুন, শস্তা জনপ্রিয়তা ভিক্ষা করেননি।

১৯ জুলাই, ১৯৫২

পরে এই লেখকের 'নাইট ফ্লাইট' পড়লুম। সাহিত্য বিচারে এই পুরনো বইখানি অনেক বেশি সার্থক। জীবনকে বিলাস বলে মনে না করে মহান এক কর্তব্য বলে জ্ঞান করা, বীরত্ববিমুখ হয়েও কর্তব্যের আহ্বানে বিপদের সম্মুখীন হওয়া, প্রয়োজন হলে সেই কর্তব্যের সাধনায় দ্বিধাহীন আত্মদানের মহত্ত্ব—এই কথাগুলি পুরানো উপন্যাসেও আছে। কিন্তু সেখানে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই জীবনদর্শন এখন অনেক বেশি জীবন্ত হয়েছে। 'নাইট ফ্লাইট' আমার মতে 'সিটাডেল'-এর চেয়ে সার্থকতর শিল্পসৃষ্টি। যদিও এখানে যোগ করা উচিত যে, সাঁ-জুপেরি তাঁর শেষ বইটি প্রকাশের জন্যে তৈরী করে যেতে পারেননি, যেমন তৈরী করে গিয়েছিলেন পূর্বে প্রকাশিত সার্থক গ্রন্থত্রয়। 'উইণ্ড, স্যাণ্ড অ্যাণ্ড স্টারস' ও 'ফ্লাইট টু অ্যারাস' ও লেখকের প্রতিভার উজ্জ্বলতর নিদর্শন।

টেনেসি উইলিয়মস

মার্কিন গাড়ির জুড়ি নেই। ওঁদের বাড়ি তো এত উঁচু যে আকাশের মেঘগুলিকে সসম্ভ্রমে পাশ কাটিয়ে তবে চলাফেরা করতে হয়। এমন জাতিকে সমীহ না করে উপায় কোথায়? আমার নিজের অন্তত, সমীহটা কিন্তু সসীম।

যথোচিত লজ্জার সঙ্গে কবুল করতেই হবে যে মার্কিন সংস্কৃতির প্রতি আমার মনোভাব অপরিচয়জাত অশ্রদ্ধা থেকে মুক্ত নয়। এতদিন উদাসীন থাকায় বাধা ছিল না—বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি! কিন্তু আজ যখন ওঁদের গম খেয়ে প্রাণধারণ করতে হচ্ছে তখন আগের ঔদাসীন্য অকৃতজ্ঞতা হবে। বাধ্যবাধকতাও আছে, সেনেটবর্য্যা দেউলে বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছেন যে মার্কিন-সংস্কৃতি-নির্যাস কোকা-কোলা গণ্ডূষ ভরে গ্রহণ না করলে ডলারও মিলবে না।

থিয়োডোর ড্রাইজার ও টমাস উলফের বৃহদায়তন বইগুলিতে প্রতিভার স্বাক্ষর নির্ভুল; কিন্তু সেই প্রতিভার অসংহত প্রগল্‌ভতা আমাকে পীড়া দেয়, পড়বার উৎসাহ কেড়ে নেয়। জেমস্ থার্বার ও ডরথি পার্কারের লঘু লেখা আমি উপভোগ করি। তারপর? বাকিটা ফাঁকি দিই। ভাবি, ভালো কিছু লেখা হলে হলিউড তাকে রেহাই দেবে না, ছবি না করে ছাড়বে না। সত্যি ছাড়েও না।

সম্প্রতি মার্কিন লেখা সম্বন্ধে অবহিত হবার আরো কারণ ঘটেছে। নর্মান মেলর ও জেমস্ জোন্স প্রমুখ কয়েকজন তরুণ লেখক তাঁদের সগুসমাপ্ত সেনা-জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতা এমন অকপটে প্রকাশ করেছেন যে আবার সাহিত্যে দুর্নীতির প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমের 'দি নেকেড অ্যাণ্ড দি ডেড' এবং দ্বিতীয়ের 'ফ্রম হিয়ার টু ইটার্নিটি' সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অস্বস্তি যতটা স্ফীতিঘটিত ততটা নীতিগত নয়। বইগুলিতে ইতস্তত ক্ষমতার ইঙ্গিত থাকলেও বহুলাংশে এমন স্থূল যে, মনে হয় ওগুলি গুহ্যাংশের বিশেষ দেয়ালে সগু-স্বরভাঙা ছেলেদের লেখা।

মেলর-জোন্স সত্যি অকালপক্ব তরুণ। কিন্তু টেনেসি উইলিয়মস্ পরিণত-বয়স্ক। তাঁরও রচনায় নির্ভুল ক্ষমতার প্রকাশ। সমান নির্ভুল তাঁর অপরিণতমনস্কতা। তাঁর 'এ স্ট্রিটকার নেমড ডিজায়ার' নিয়ে যে কোলাহল হয়েছে তার কিছুটা শুচিবাইর জন্য, বাকিটা নাট্যামোদীদের চমকপ্রীতির জন্যে। তাঁর প্রথম উপন্যাস* নিয়ে তেমন তীব্র আলোচনা হয়নি,

* *The Roman Springs of Mrs. Stone*, by Tennessee Williams, (John Lehmann 7s 6d).

কেননা চমকের স্বভাবই এই যে তার তীব্রতা অচিরে নিঃশেষিত হয়ে যায়। টেনেসি উইলিয়মসের লেখায় চমৎকারিতার চাইতে চমককারিতা বেশি।

অনুমোদন-অননুমোদন অনুক্ত রেখে সংক্ষেপে কাহিনীটা বিবৃত করা যাক। স্থান ত্রিসহস্রবর্ষীয়া রোমনগরী। পাত্রীর বয়স তার চেয়ে কিছু কম, অর্থাৎ পঞ্চাশের উপর। তাঁর প্রাণ সয় না প্রৌঢ়ত্বের পায়ে আত্মসমর্পণ, দেহ সয় না যৌবনের অভিনয়। অভিনেত্রীজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি অসুস্থ স্বামীকে (যিনি অন্তরঙ্গ অর্থে অক্ষম ছিলেন) নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। প্যারিস থেকে রোমের পথে মিসেস্ ষ্টোন বিধবা হয়ে অপরিমিত ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হলেন। অপরিমিত অবসরেরও। সেই শূন্যতায় শয়তানের কাজ বাড়ল। নিমিত্ত হয়ে জুটলেন কুটিলা কন্তেসা ও রূপজীবী পাওলো। শয্যার শূন্যতা সাময়িকভাবে ঘুচলো। রোমের আকাশ আনন্দ দিল। কালো মেঘ হয়ে ভেসে এলো শুধু ধনগর্বিতা নয় যৌবনগর্বিতা আরেক অভিনেত্রী। পাওলো পালালো। মিসেস্ ষ্টোন কী করলেন? দোতালার বারান্দা থেকে ঘরের চাবি ফেলে দিলেন আরেকজন দেহবিক্রেতার হাতে যার বিক্রয়পদ্ধতি 'বাইসিকল থিফ' ছবিতে ওই রোমেরই রাস্তায় অবিস্মরণীয় শিশুটি দেখাতে গিয়েছিল। পারেনি। আমি নিশ্চয়ই সে কথা লিখতে পারব না।

বিগতযৌবনা এই মহিলার কামসর্বস্ব অস্তিত্ব আগাগোড়া এমন নগ্ন বীভৎসতায় বর্ণিত হয়েছে যে বিনোদিনী-কিরণময়ীর জন্যে যে করুণা হয় এখানে তার কণামাত্রও অনুভূত হয় না। টেনেসি উইলিয়মসের শিল্পগত ব্যর্থতারও কারণ এখানেই সন্ধান করতে হয়। তাঁর ট্র্যাজেডি পাঠককে অশ্রু দিয়ে ধুইয়ে দেয় না। মনে হয় কার্বলিক সাবান চাই।

মাত্র ১২৬ পৃষ্ঠায় লেখক রোমের অলস নিদাঘের একটি সুন্দর আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। চরিত্রচিত্রণেও তাঁর অনস্বীকার্য দক্ষতা। বড়ো চরিত্রগুলি ছাড়াও মেগ বিশপ, রেনাতো শীল, কন্তেসা ইত্যাদি প্রত্যেকে জীবন্ত।

প্রত্যেকটি কথা, এমনকি 'অশ্লীল' কথাগুলি, এমন সযত্নে চয়িত যে রচনা কোথাও এলোমেলো নয়। উইলিয়মস্ সচেতন শিল্পী।

তবু সার্থক নন। তাঁর ত্রুটি ব্যক্তিগত হতে পারে, কিন্তু জাতিগত হওয়াও অসম্ভব নয়। মার্কিন সভ্যতার বয়স অল্প, দু'শো বছরের বেশ কিছু কম। তারুণ্যের উপভোগ্য মত্ততা তার প্রতিটি কাজে প্রতিবিম্বিত। তার বাড়াবাড়িও। সব কিছুতে পরিমিতির অভাব সুস্পষ্ট। তাই যৌবনের ছবি আঁকতে সে পাকা শিল্পী, কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের বা বার্ধক্যের সুসমঞ্জস সৌন্দর্য ও প্রশান্তি তার উপলব্ধির বাইরে। তখনই প্রকট হয়ে পড়ে তার ভোগক্লান্ত জীবনের নিঃস্বতা। গেব্রিয়েল শেভালিয়ের তাঁর 'ক্লশমার্ল' বইতে যা হাস্যাস্পদ করে গণ্য করেছেন, টেনেসি উইলিয়মসের হাতে তা ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কেননা, মার্কিন জীবন একোদ্দিষ্ট জীবন; কাজের বেলায় কাজ, ভোগের বেলায় ভোগ। দু'য়ের সভ্য সংমিশ্রণ এখনো ঘটে ওঠেনি। একের অভাব ঘটলেই সমস্ত জীবন ব্যেপে যে মহাশূন্যতা মুখব্যাদান করে, তা তৃতীয় কিছু দিয়ে ভরে তোলবার প্রতিভা এখনো তার আয়ত্ত হয়নি। বিখ্যাত ফরাসি লেখিকা মাদাম কলেৎ মিসেস্ স্টোনের মতো অনেক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সেখানে কোথাও উইলিয়মসের মতো বীভৎস উগ্রতা নেই। সহিষ্ণু কৌতুকের আবেশ আছে; কেননা বার্ধক্য তো ফরাসি জীবনে ব্যাধি নয়, পরিণতি। উল্লাসের দিন ফুরালে মৃদু একটি দীর্ঘশ্বাস আছে, অশোভন হাহাকার নেই। ফাউস্ট, ব্যারন মুঞ্চহাউসেন ও ডরিয়ান গ্রে থেকে য়ুরোপ যে শিক্ষা পেয়েছে, আমেরিকার তা পেতে বাকি।

টেনেসি উইলিয়মস্ যাকে বলেছেন 'বার্ধক্যের জন্যে প্রাণসঞ্চয়' তা আমেরিকাকে আহরণ করতেই হবে। তখন সে জানবে সাহিত্যে কী করে বার্ধক্যের রূপ পরিস্ফুট করতে হয়। তখন কোনো মার্কিনী ভি. স্যাকভিল ওয়েস্ট লিখবেন 'অল্ প্যাশন্ স্পেন্ট।' আমেরিকার হাতে বিশ্বনেতৃত্ব তুলে দেবার আগে আমি সেদিনের প্রতীক্ষা করব। অর্থাৎ,

আমেরিকার কাছ থেকে আমি কোকা-কোলা চাইনে, চাই বয়ঃসমৃদ্ধ শ্যাম্পেন।

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

বলা বাহুল্য, আমার প্রথম মার্কিন বইয়ের আলোচনায় আমি আমার নিজের প্রতি যেমন সুবিচার করিনি, তেমনি অবিচার করেছি আমেরিকার প্রতিও। ওদেশে আরো অনেক শক্তিশালী লেখক জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আমিও তাঁদের সাহিত্যের সঙ্গে একেবারে অপবিচিত নই। একটি শোচনীয় অনুল্লেখ ... আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এবং তাঁর নতুন বই* হাতে পেয়ে পূর্বতন ত্রুটি স্খালনেব ও আমেরিকাকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের আকাঙ্খিত সুযোগ ঘটল। বইটি প্রায়-নিখুঁত একটি প্রায়-ক্ল্যাসিক।

ছোট গল্প নয়, দৈর্ঘ্যে তাব চেযে বডো। উপন্যাস নয়, দৈর্ঘ্যে তার চেয়ে ছোট। রূপক নয, একেবারে বাস্তব। কিন্তু শুধু বাস্তব নয় যেন, অকথিত একটা ইঙ্গিত আদ্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

চরিত্র তিন-চারটি মাত্র ; বুড়ো জেলে, বাচ্চা ছেলে, অসীম আকাশ, অনন্ত সমুদ্র, একটা বৃহৎ মাছ. আব দুটি হাঙর।

কাহিনী? বুড়ো একা মাছ ধরতে গেল, সেই মাছটি, যা সে ধরবে বলে সারা জীবন আশা কবে এসেছে, যেমন মাছ গাঁযে কেউ দেখেনি কখনো ; সংগ্রাম চলল শিকাবী আব শিকাবে, মানুষে আর মাছে। মাছে আর মানুষে, মনে হলো কখনো কখনো। সত্যি মাছ ধরা পডল। কিন্তু তুলবে কে? বুড়োর বযস হযেছে যে! বাচ্চা ছেলেটিও সঙ্গে নেই, তাকে তার মা-বাবা ভর্তি করে দিযেছে অন্যান্য জেলেদের দলে, যাদের ভাগ্য এই বুড়োর মতো নয় ; যারা শূন্য নায়ে সাগর থেকে ফেবে না রোজ রোজ।

* *The Old Man and the Sea*, by Ernest Hemingway. (Jonathan Cape, 7s 6d).

আজ বুড়োর ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে, কিন্তু এ কী পরিহাস যে, সে-মাছ ডাঙায় তুলতে তার সাধ্য বা সম্বল নেই? তবু চেষ্টা চলল, সাক্ষী রইল আকাশ আর তারাগুলি। বড়ো মাছ, বুড়োও; ওই বুড়োরই মতো। দুজনে তো ভাব হওয়া উচিত। ভাব? মানুষে আর জন্তুতে, মানুষে আর প্রকৃতিতে, একটিমাত্র সম্বন্ধ আছে। সেটা নিরাপস শত্রুতা। মাছ সেকথা বুঝিয়ে দিল বুড়োকে। সমুদ্রও। এদের সঙ্গে যোগ দিল হাঙর। সেই হাঙরের কৃপায় শেষ পর্যন্ত যা ডাঙায় উঠল, তা মাছটার বৃহৎ কুৎসিত কঙ্কাল মাত্র। চরম জয়ের মুহূর্তে বুড়ো জেলে হাতের মুঠো খুলে দেখল, হাতে তার মুক্তো নেই, আছে একতাল কাদা মাত্র। মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত আঠারো ফুট মাছ, ধরা পড়ল, মারা পড়ল, কিন্তু মানুষকে না হারিয়ে নয়। বুড়ো পাঁচ ফুট লম্বা খাটে এসে আশ্রয় নিল; ক্লান্ত, আহত। আবার স্বপ্ন দেখল সিংহের। ইতি।

কিন্তু শেষ যেন হয়নি। একশ' সাতাশের পাতাটা উল্টেও পরের সাদা পৃষ্ঠাটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয়। যেন ওটাতেও কিছু লেখা আছে। যা কালো কালিতে লেখা যেতো না, তাই বুঝি সাদা চোখের জলে লেখা হয়েছে। বস্তুত এ-বইয়ের বেশির ভাগই লাইনগুলির মাঝে মাঝে লেখা, লাইনের লেখা অল্পই।

কিন্তু সেই অল্পে কী বিশাল ভাবৈশ্বর্য, কী গভীর ভাবানুষঙ্গ! হাভানার জেলেদের কেন, কাউকেই আমি চিনিনে। কিন্তু হেমিংওয়ের রচনাগুণে সমস্ত দৃশ্যটা যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অথচ দুটি-একটি কথার নিপুণ আঁচড়ে মাত্র। জেলের মনে প্রতিফলিত হয়ে আকাশ, সমুদ্র আর মাছ জীবন্ত হয়ে উঠেছে; মাছ, সমুদ্র আর আকাশের পরিবেশে জেলে বুড়ো প্রাণ পেয়েছে। সমুদ্র বড়ো বুঝি? বুড়োরা নিঃসঙ্গ বুঝি? হেমিংওয়ের বর্ণনা এক লাইন—বুড়ো সমুদ্রের দিকে চাইল, বুঝল কত একা সে। একটি বিশেষণ নেই, এতটুকু বিস্তার নেই। কিন্তু সব কিছু বলা হয়নি কি?

আগাগোড়া বইটির প্রধান গুণ এই নিরাভরণ সৌন্দর্য, যা প্রায় আদিম (এলিমেণ্টাল)। বইয়ে ফোর্ডের উল্লেখ আছে, হেলিকপ্টরের কথা আছে,

কিন্তু সে যেন আনুষঙ্গিক মাত্র। এ-ঘটনা যেন ইতিহাসের প্রথম দিনে ঘটতে পারতো, এ যেন ইতিহাসের শেষ দিনেও ঘটবে। শুধু হাভানার উপকূলে নয়, এ যেন ডায়মণ্ড হারবারেও ঘটতে পারতো। হয়তো ঘটছেও।

বেশির ভাগ সময় তো কাটল সমুদ্রে। বুড়ো কথা বলছে কার সঙ্গে? নিজের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে, জলের সঙ্গে, মাছের সঙ্গে। কী রকমের কথা? 'আমার বরাত বড়ো খারাপ। আচ্ছা, বরাত বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না? কিনতুম তাহলে কিছু।'

বুড়ো মাছটাকে ডেকে বলছে, 'মাছ, তুই মরবি। কিন্তু আমাকেও মারতে চাস্ কেন? আয়, আয় লক্ষ্মীটি।' নিজের মনে মনে বুড়ো বলছে, 'ভগবান, এ-যাত্রা আমায় বাঁচিয়ে দে। মানৎ রইল, একশ' বার আওয়ার ফাদার, আর একশ' বার হেল্ মেরী বলব।' একটু পরে বলছে, 'আহা বললুম তো বলব। ধরে নে বলেছি। এখন আমি ক্লান্ত, বুড়ো মানুষ তো। পরে বলব।' কিছুক্ষণ এমনি নিজের মনে কথা বলে বলছে, 'আরে, আমি কি সত্যি পাগল হয়েছি নাকি যে, নিজের সঙ্গে কথা বলছি!'

শুধু এরাই নয়, পারে ফেলে-আসা বাচ্চা ছেলেটির অনুপস্থিতি পর্যন্ত যে কোনো উপস্থিতির মতো জীবন্ত। মাঝে মাঝে বুড়ো শুধু বলে, 'আহা, ছেলেটা যদি সঙ্গে থাকতো!'

শুধু সংলাপে নয়, লেখকের নিজের বর্ণনাতে পর্যন্ত ঠিক এই রকমের অসাধারণ বাক্-সংক্ষেপ। সেখানেও প্রতিটি কথার এক আউন্সের শিশিতে এক গ্যালন সংক্ষোভ। জেলেটির বর্ণনা: বুড়ো। ওর হাত-পা সব কিছু বুড়ো। ওই চোখ দুটো বাদে। ওদের রঙ্ সমুদ্রের; উচ্ছল, অপরাজিত। বইয়ের শেষে বুড়ো ক্লান্ত: হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল জেলে। বুঝল সে মরেনি। তার বেদনার্ত স্কন্ধ সেকথা স্মরণ করিয়ে দিল। মরা মানুষ কি ব্যথা পায়? না। আছে দুঃখ, আছে প্রাণ।

কঙ্কাল নিয়ে তীরে এসে ঘুমন্ত বুড়ো আবার সিংহের স্বপ্ন দেখছিল কেন? কেননা, সে হার মানেনি। মাছের কাছেও না, সমুদ্রের কাছেও না। মার খেয়েছে শুধু ভুলের জন্যে, বেশি দূরে চলে গিয়েছিল। তাছাড়া হাঙর

ধারবার মতো যথেষ্ট হাতিয়ারও নিয়ে যায়নি। পরের বার এসব ভুল হবে না। আগে থেকে ব্যবস্থা করবে। সঙ্গে ওই বাচ্চা ছেলেটাও থাকবে। এবারে যে-মাছ ধরা পড়বে, তা অক্ষত অবস্থায় তীরে আসবে। এবার—কিংবা এর পরের বার—কিংবা তারও পরের বার—

কিন্তু আসবে কি? এই সন্দেহটা ভারতীয় আমার। তরুণ মার্কিন এখনো আশাবাদী।

১৩ ডিসেম্বর, ১৯৫২

জে আর অ্যাকার্লে

বলা বাহুল্য, প্রথম চেতনা হোলো একান্ত প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি নিয়ে। গা বললে, জামা চাই; পা বললে, জুতো চাই। প্রয়োজন থেকে প্রতিকৃতি: নার্সিসাস জলে ছায়া দেখে আর চোখ ফেরাতে পারলে না। পরে চতুর্দশ শতাব্দীতে ভেনিসে আয়না তৈরী হলে (মতটা ল্যুইস মামফোর্ডের) মানুষ নিজের দিকে তাকিয়ে বলল, নিজকে জানি।

কাজটি দুরূহ। শুধু দার্শনিক অর্থে নয়, অপেক্ষাকৃত সহজ চোখে দেখার দিক থেকেও। কত জিনিষ কাছে থেকে দূর রচে, দূর তো অদৃশ্য। নিজের পৃষ্ঠদেশটি পর্যন্ত সহজে প্রত্যক্ষ করবার উপায় নেই।

অনেক ইতিহাসের প্রধান নির্ভর তাই বহিরাগত পর্যটকের দিনপঞ্জী বা পত্রাবলী। অর্থাৎ নিজে না দেখতে পেয়ে পরের চোখে নিজকে দেখা। ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রদের অজানা নেই যে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রস্তরলিপি ও মুদ্রাবশেষের ইঙ্গিত আর আভাস ছাড়া আমাদের অতীতের আর যা বিশ্বাস-যোগ্য তথ্য আছে, তা মেগাস্থিনিস, হ্যু এন সাং, ফা হিয়েন, অলবেরুনি ইত্যাদির ভ্রমণের বৃত্তান্ত। এ পর্যন্ত আমরা নির্বিবাদে মেনে নিই। ধৈর্য হারাই (এবং আদৌ অকারণে নয়) পরবর্তী পর্যটকদের নামোল্লেখে—যেমন ভ্যালেন্টাইন চিরল, ক্যাথারিন মেয়ো বা বেভারলি নিকলস। এঁরা পর্যটক হলেও মুখ্যত প্রচারক।

কিন্তু একেবারে অন্য রকমের পরিব্রাজকরাও—এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে—ভারত-ভ্রমণে এসেছেন। প্রভুজাতির প্রতিনিধি হয়ে নয়, ব্যক্তি হিসাবে। প্রচার করতে নয়, পরিচয় করতে। এমন পরিচয়ের কাহিনী ছিল ফর্স্টারের "এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া" (১৯২৪)। তাব আট বছর পরে বেরিয়েছিল জে আর অ্যাকার্লের "হিন্দু হলিডে"*—সম্প্রতি পরিবর্ধিত হয়ে পুনঃপ্রকাশিত। আরো পরে (১৯৪৪) পেণ্ডেরেল মুন-রচিত "স্ট্রেঞ্জারস ইন ইণ্ডিয়া" অনুরূপ সহানুভূতির সঙ্গে লেখা।

তৃতীয় বইটির সঙ্গে প্রথম দু'টির পার্থক্য মূলগত। মুন এসেছিলেন শাসক হয়ে—আই-সি-এস হয়ে। কিন্তু ফর্স্টার আর অ্যাকার্লে এসেছিলেন প্রধানত বেড়াতে। তাঁদের কাঁধে তাই শাদা আদমীর বোঝা ছিল না। তাঁদের গতি তাই বহুগুণ স্বাধীন ছিল, দৃষ্টি ছিল বহুগুণ স্বচ্ছ। তাঁদের লেখাও তাই এই দ্বিবিধ গুণে উজ্জ্বল। ছোকরাপুরের মহারাজা একদিন অ্যাকার্লেকে বলছিলেন, "প্রথম তোমার নাম শুনে আমার মনে হয়েছিল একটি স্রোতস্বিনীর কথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ডের উপর দিয়ে যেন স্বচ্ছন্দগতিতে বয়ে চলেছে।" এটি অ্যাকার্লের বইয়েরও বর্ণনা।

ছোকরাপুর কোথায় ? লেখক বলছেন, মানচিত্রে খোঁজা মিছে। যেখানেই হোক, ওটা গোটা ভারতবর্ষ নয়। যে অংশই হোক, তার কাহিনী আজকের কাহিনী নয়। টাকার দাম তখন ছিল এক শিলিং চার পেনি। তার চেয়েও বড়ো তফাৎ, ইংরেজ আর ভারতীয়দের মধ্যে তখন ছিল চীনে দেয়াল। আমরা তো চিরকাল বিদেশী-বিদ্বেষী অলবেরুনির কালেও ছিলেম। ইংরেজ আমলে অপর দিক থেকেও বাধার অন্ত ছিল না। আমার পুরানো ফিনিক্স সংস্করণের ৩০ পৃষ্ঠায় মিসেস মণ্টগমারী অ্যাকার্লেকে বলছেন, "ভারতীয়দের অন্ধকার, কুটিল মন তুমি কখনো বুঝতে পারবে না। আর যদি পারো, তবে বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটবে। আমার তোমাকে ভালো লাগবে না।" বাহান্ন পৃষ্ঠা পরে ব্রিষ্টো মেমসায়েব আরো স্পষ্ট করে বলছেন, "Look here, let me give you a word of advice : don't go Indian !"

* *Hindoo Holiday* by J. R. Ackerley, (Chatto & Windus, London, 10/6d.)

অ্যাকার্লে তবু এসব বিচক্ষণ সাবধান-বাণী উপেক্ষা করে ভারতবর্ষ ও ভারত-বাসীদের জানতে চাইলেন। শুধু বাইরের বাধা নয়—তার দৃষ্টান্ত উপরে উদ্ধৃত হয়েছে—কাছে আসার কাজটা এমনিতেই অত্যন্ত শক্ত ছিল। পাঁচ ফুট খাটো লোকের সাত ফুট লম্বা লোকের সঙ্গে করমর্দন করতে যাওয়া যে কী ভয়ানক শাস্তি, তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানি। অ্যাকার্লের কাজ আরো শক্ত। তাঁর প্রয়াস পদতলে শায়িত দুর্ভাগা ভারতীয়দের সঙ্গে করমর্দন। শুধু করমর্দন নয়, স্নেহচুম্বন (২৭৪ পৃষ্ঠা)।

পায়ের তলার লোকেব সঙ্গে হাত মেলানো, তথা ঠোঁট মেলানো, প্রায় এমন বাহাদুরী যাকে সার্কাসের খেলা বলা চলে। দৈহিক ভঙ্গীটা হাস্যকর, কিন্তু কাজটা সহস্রগুণে শক্ত হয়ে ওঠে, যদি এই হাত-মেলানো আক্ষরিক অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়া থেকে মনস্তাত্ত্বিক পর্যায়ে উন্নীত করি। এই কঠিন কাজে অ্যাক্রোব্যাট অ্যাকার্লে অবলীলাক্রমে সফল হয়েছেন।

কী করে? একটা ব্যাখ্যা তাঁর স্বচ্ছ আন্তরিকতা। কিন্তু আন্তরিকতা আর্টের শত্রু না হলেও কখনোই সে আর্টের আসন পুরোপুরি পূরণ করতে পারে না। বিকল্প ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে দেখি লেখকেব উদ্ভাবনীশক্তি পরিমিত। সত্য বলতে কি, "হিন্দু হলিডে" ঠিক উপন্যাস নয়। জীবন্ত চরিত্র আছে অনেকগুলি, কিন্তু চলন্ত একটা গল্প নেই। কিন্তু লেখকের দৃষ্টি আছে। তিনি এমন অসংখ্য জিনিস দেখেছেন, যা আমাদের মানসিক আসবাবের অঙ্গ বলে আজ আর আমরা লক্ষ্যই করিনে। আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন আমাদের পণপ্রথা আর পঞ্জিকাগত প্রাণ, আমাদের স্ত্রীজাতির পদে পদে অবমাননা, আমাদের বর্ণবৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা ও দাসোচিত লেলিহানতা – প্রত্যেকটি লজ্জাকর নির্লজ্জতা তাঁর চোখে পড়েছে। কিন্তু ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে কদাচিৎ। মুন্সী আব্দুল তাঁকে উত্যক্ত করেছে, কিন্তু মহারাজা ও শর্মার জন্যে তাঁর গভীর স্নেহ। যেসব বর্বরতা অন্যান্য ভারতীয়দের পর্যন্ত ক্রোধের বিষয়, সেগুলিও অ্যাকার্লেকে ক্রুদ্ধ করে নি। রাজনীতিক অভিসন্ধিশূন্য এমন মানবিক সহনশীলতা ইংরেজে দুর্লভ।

এই সহনশীলতার পশ্চাতে আছে সদাসকৌতুক বিস্ময়বোধ। অ্যাকার্লের কৌতুক, কোথাও কোথাও অতিমাত্রায়, ভারতীয়দের ইংরেজি-বিভ্রাটের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অবশ্য-পাঠ্য এই বইখানির প্রধান আকর্ষণ এই যে, তৎকালীন প্রভুজাতির অংশ হয়েও একটি ইংরেজ তখনকার ভারতীয়দের ভালোবাসতে ও বুঝতে চেয়েছিলেন। অনায়াসে তিনি তাঁর সেই বোঝার রায় দিতে পারতেন, যেমন পরবর্তী পর্যটকরা দিয়েছেন। কিন্তু অ্যাকার্লে তা করেন নি। বইটির এক জায়গায় মহারাজা অ্যাকার্লেকে বলছেন, "How does one make up one's mind ?" বিশেষ করে বৃহৎ একটি জাতি সম্বন্ধে ? এ সমস্যা শুধু ছোকরাপুরের মহারাজার নয়। লেখকেরও। সমালোচকেরও। বোধহয় প্রত্যেক মানবিকেরই।

৩০ অগস্ট ১৯৫০

রবার্ট লিণ্ড

ফরাসি বেল্-লেৎর-এর বাঙলা নামকরণ 'রম্য রচনা' যিনি করেছেন, তাঁকে মানপত্র দেয়া উচিত। প্রথমত, কথাটি মধুর। দ্বিতীয়ত, তাঁকে এই কথাটি উদ্ভাবন করতে হয়েছে বস্তুটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রধানত পরভাষার মধ্য দিয়ে হওয়া সত্ত্বেও। কয়েকজন লেখকের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার কল্যাণে বাঙলা সাহিত্যে রম্য রচনা পরিমাণে প্রচুর কিন্তু গুণে দীন।

পরিমাণের প্রাচুর্য আত্মপ্রত্যক্ষ। আপেক্ষিক গুণ-দৈন্য রবার্ট লিণ্ডের আলোচ্য সংকলনটি* হাতে নিলে সন্দেহ করবার উপায় থাকে না। গুটি ষাটেক সাহিত্য, সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধের এই সঞ্চয়নটি পাঠকদের উপভোগের জন্য এবং অন্যান্য লেখকদের উপকারের জন্য।

সাহিত্য, বস্তুত গোটা আর্ট, সম্বন্ধেই দুটি একেবারে বিপরীত মত আছে। একদল বলেন, শিল্প হচ্ছে শিল্পীর আত্মগোপন, শুধু শিল্পপ্রকাশ।

***Books and Writers* by Robert Lynd (Dent, 16 s.)**

দ্বিতীয় দল বলেন, আর্ট হচ্ছে শিল্পীর স্বকীয় ব্যক্তিত্বের অকুণ্ঠ আত্মস্ফূর্তি।

রম্য-রচনাকে যদি আর্টে পাংক্তেয় করা হয়, তাহলে আমি বলব, সাহিত্যের অন্তত এই শাখাটিতে রচয়িতার আপন ব্যক্তিত্বের অলজ্জ বিকাশ অপরিহার্য। সে ব্যক্তিত্ব রূঢ় হতে পারে, যেমন ছিল উলকটের। সে ব্যক্তিত্ব স্নিগ্ধ হতে পারে, যেমন ছিল লিণ্ডের। কিন্তু 'নো মুস্তাক, নো টেস্টে'-এর অনুসরণে আমি বলব, 'নো পার্সন্যালিটি, নো রম্য-রচনা।' প্রথমটির অকিঞ্চনতার জন্যে দ্বিতীয়টির উৎকর্ষ বাঙলায় ব্যাহত হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণটি বোধ হয় এই যে, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্যে আজো আমাদের সেতুবন্ধন হয়নি। দৈনিক কাগজের আটটি পাতায় নেতাদের বিবৃতি, রাজনীতিক রোমাঞ্চ আর উদ্বাস্তু-সংবাদের পরে সাহিত্যের জন্যে স্থান সঙ্কুলান হয় না।

রবিবাসরীয় সাময়িকীতেও এই তিনটি বস্তু প্রায়শঃই উপচে পড়ে আর তার পর ফলিত সাহিত্যের চর্চা করে বিশুদ্ধ, অর্থাৎ অসাময়িক ও অনুদ্দেশ্য সাহিত্যের জন্যে জায়গা কোথায়? সাহিত্যে আর সাংবাদিকতায় এই বিচ্ছেদের অপর প্রমাণ এই যে, সাহিত্যের শতকরা পঁচানব্বই ভাগে আজ যে ভাষা প্রচলিত, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলি থেকে আজো তা নির্বাসিত।

লিণ্ড যে ধরণের রম্য-রচনার চর্চা করে গেছেন, তার সঙ্গে দৈনিক সংবাদপত্রের সম্বন্ধ অতি নিকট। তাঁর লেখার মধ্যে ব্যাপ্ত আছে অবসরের সুর, প্রাত্যহিক বার্তাবাত্যার প্রতি ঔদাসীন্যের সুর; কিন্তু সেই সঙ্গেই সম-পরিমাণে আছে ফ্লিট স্ট্রিটের কর্মব্যস্ততার নির্ভুল প্রভাব। আয়াস আর অনায়াসের এমন কুশল সংমিশ্রণ দুর্লভ। দ্রুত ও বিলম্বিতের এই সমন্বয়েরই কল্যাণে রবার্ট লিণ্ডের প্রবন্ধগুলি একাধারে সাহিত্য ও সাংবাদিকতা। এমন লেখা দৈনিকে বা সাপ্তাহিকে স্বাগত, আবার শক্ত মলাটের মধ্যেও আদৌ বেমানান নয়। প্রাতরাশে এ চায়ের অনুপান, নৈশ ভোজনান্তে এ

যোগ্য শয্যাসঙ্গী। দুবেলার জন্যেই সমান উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করতে হয় সাহিত্য-সাংবাদিককে।

সাহিত্য সম্বন্ধে লিণ্ড ছিলেন নির্দলীয়। উদারমতাবলম্বী। একেবারে বিপরীত রকমের বিভিন্ন লেখকদের লেখা তিনি সমানভাবে উপভোগ করেছেন এবং সেরূপ অকপট মতানুভবতার সঙ্গে প্রকাশ করে লেখকদের উৎসাহ ও পাঠকদের শিক্ষা ও আনন্দ দিয়েছেন। তার বর্তমান সম্পাদক, রিচার্ড চার্চ বলেছেন লিণ্ড ছিলেন ক্লাসিসিস্ট; যেহেতু তিনি শিল্প-সৃষ্টিতে প্রকৃতিস্থ সংযমের গুরুত্ব স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিলেন। অপর পক্ষে, চার্চ যোগ করেছেন লিণ্ড ছিলেন রোম্যান্টিক; কেননা তিনি সেই শিল্প-সৃষ্টিতে অ বিসীম বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা কখনোই অস্বীকার করেন নি। এ দুয়ের কোনো একটা চরমে গিয়ে কিন্তু তিনি তার বিবেক বন্ধক রাখেন নি। আপন শিক্ষা, অধ্যয়ন ও রুচি অনুযায়ী প্রত্যেকটি লেখা ও লেখককে বিচার করেছেন মুক্ত মন নিয়ে।

রাষ্ট্রনীতিতে অনিশ্চয়তাই যেমন নিরপেক্ষতা নয়, তেমনি সাহিত্য-বিচারেও মুক্ত মনের অর্থ শূন্য মন নয়। উদার রুচিরও অর্থ নয় ভালো-মন্দে অপার্থক্য। লিণ্ডের সমালোচনা-প্রণালীতে তাই অনুমোদন বা অননুমোদন কোনোটাই অকারণ নয়। এতে তাই শুষ্ক বিশ্লেষণ যেমন নেই, তেমনি নেই অনর্থক বাগ্‌বয়ন। তাঁর বলবার বক্তব্য ও বলার ভঙ্গী একসঙ্গে পা ফেলে হাত ধরে চলে, একে অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে না। তাই তার সাহিত্য-সমালোচনা শুধু সাহিত্য নয়, শুধু সমালোচনা নয়; দুই-ই।

লিণ্ডের প্রবন্ধ প্রসঙ্গে আরেকটা কথা মনে পড়ল। কোথাও এতটুকু অযত্নের আভাস নেই। সহজ ও অনায়াস লেখার নামে ইদানীং একটা যে স্টাইল-বিরোধিতা দেখা দিয়েছে, তার ফলে ভালো একটা কথা লেখা যেন বর্বরতার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। গুছিয়ে সাজিয়ে একটা কথা বললেই চতুর্দিকে রব উঠবে: হুঁ, স্মার্ট রাইটিং, তবে—। এই রকমের অর্বাচীন সমালোচনা শুধু বাঙলায়ই নিবদ্ধ নয়, বাইরেও এর প্রকোপ ক্রমবর্ধমান। এই অযত্ন রচনার ছোঁয়াচ থেকে (হেনরি জেমস যাকে বলতেন 'ইনফেকশন

অব ব্যাড রাইটিং') লিও মুক্ত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, কাগজের প্রবন্ধের পরিমিত পরিসরে, স্থানাভাবের জন্যে. কালাভাব সত্ত্বেও, ওজন করে ও চয়ন করে শব্দ নির্বাচন না করলে চলে না। তিনি জানতেন যে, স্বাভাবিক হওয়া মানে অপরিচ্ছন্ন হওয়া নয়। চুল আঁচড়ানো মানে বাবুয়ানা নয়। গয়না পরা মানে অসতী হওয়া নয়।

কিন্তু আসল কথাটি হচ্ছে এই যে, এরকমের রচনার প্রধান উৎস, আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে সংবাদপত্র। লিও নিজে তাঁর রচনাগুলি লিখেছেন বিভিন্ন কাগজের জন্যে—ডেলি ডিসপ্যাচ, টুডে, ডেলি নিউজ, নেশন ও নিউ স্টেটসম্যান প্রভৃতি কাগজে তিনি নিয়মিত লিখতেন। যদি জানতে পাই যে, লিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, আপন অপ্রতিরোধ্য অনুপ্রেরণায় নিরুপায় হয়ে, কখনো একটিও প্রবন্ধ লেখেন নি, তাহলে আমি অন্তত বিস্মিত হব না।

আমি নিজে ওটা কখনো পেরে উঠিনি। সাহিত্য-সাংবাদিকের লেখার আদেশ আসতে হয় বাইরে থেকে (নইলে এবা সাহিত্যিক হোতো), সে ডাকের সাড়া আসতে হয় রচয়িতার অন্তর থেকে (নইলে এরা সাংবাদিক হোতো)। এ-লেখা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদকের হাতে পৌঁছে দিতে হয়—নইলে লেখাই হয় না। এ-লেখা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হয়—নইলে তা গ্রন্থের আকার ধারণ করে এবং কাগজ থেকে বহিষ্কৃত হয়।

এমন দিন কবে আসবে, যখন বাঙালী লেখকের পুস্তক-সমালোচনা কাগজে স্থান পেয়ে পরে আবার পুস্তকাকারে পাঠকের মনোরঞ্জন করতে পারবে? সাময়িক লেখায় যখন চিরন্তনীর গুণ থাকবে, আর সাহিত্যিক লেখায় ক্ষণিকার রূপ?

১৮ অক্টোবর, ১৯৫২

সি ডে ল্যুইস

ইংরেজি কাব্যের অনেক ফুল ফুটেছে ইটালির বাগানে। বায়রন, শেলি, কীটস্, ব্রাউনিঙ্ প্রমুখ নানা ইংরেজ কবির জীবনের (এবং মরণের) সঙ্গে ও-দেশ নিবিড়ভাবে জড়িত। ভেনিস, পিসা, রোম, ফ্লোরেন্স,

নেপলস, কাপ্রি—ইটালির প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য শহরের স্মৃতিময় রূপ-কীর্তনে ইংরেজি কাব্য-কানন মুখর। তবে সেসিল ডে ল্যুইস কি আবার সেই পুরানো পান্তর পরিক্রমা করেছেন?

বইয়ের* গোড়াতেই, নামপাতায়, জ্যাসপার মোর থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কবি প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন: "ইটালি-ভ্রমণ হচ্ছে আবিষ্কারের অভিযান, শুধু প্রকৃতি আর নগরের আবিষ্কার নয় ভ্রামণিকের নিজের অন্তর ও আত্মার আবিষ্কার।" বলা বাহুল্য, এ বিষয় কখনো পুরানো হবার নয়, কেননা, মানুষের মন হচ্ছে এমন গ্রন্থ যা 'চিরকাল চোখে চোখে নূতন নূতনালোকে পাঠ করো রাত্রিদিন ধরে।' বিশেষ করে সে-হৃদয় যদি কবি ল্যুইসের হৃদয়ের মতো ভাবসমৃদ্ধ, গীতি-মুখর ও জ্ঞানধনী হয়।

তবু ভয়ের কারণ ছিল। যে বিষয়বিমুখ আত্মানুচিন্তন এবং অন্তহীন আত্মবিশ্লেষণ প্রায় সমগ্র আধুনিক কাব্যের আবেদন মর্মান্তিকভাবে সীমিত করে রেখেছে, উপরের উদ্ধৃতিটাতে তার ভয়াবহ প্রশ্রয় আছে। তাছাড়া এই ল্যুইসই কিছুদিন আগে তাঁর পেঙ্গুইন সংকলনের ভূমিকায় লিখেছিলেন: 'আমরা বোঝাতে লিখিনে, বুঝতে লিখি।' অর্থাৎ আধুনিক কাব্য এইজন্তে দুর্বোধ যে তা শুধু কবির সঙ্গে তাঁর নিজের একান্ত গোপনীয় ভাব-বিনিময়, শ্রোতা সেখানে অনাহূত। স্বারোপিত এই নিঃসঙ্গতার ফল শুধু কাব্যের অবিক্রেয়তা নয়, আধুনিক কাব্যের নিঃসীম বিষণ্ণতারও উৎস এখানেই।

কিন্তু ল্যুইসের "দি পোয়েটিক ইমেজ্" নামক অনবদ্য বক্তৃতামালার পাঠকদের অজানা নেই যে, কাব্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত অন্যান্য অনেক সহ-কবিদের তুলনায় অনুগ্র। তিনি যে আধুনিক কবিদের স্পষ্টতমদের মধ্যে একজন তার নতুন পরিচয় আছে আলোচ্য গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে। তিনি যে বিষাদ ছাড়া অন্যান্য অনুভূতিকে কাব্যে অপাংক্তেয় জ্ঞান করেন না, তারও মুখর প্রমাণ আছে কাব্যটির বহুস্থানে।

* *An Italian Visit*, by C Day Lewis. (Cape, 7s. 6d.)

যেখানে কবি আত্মদর্শনে ব্যাপৃত, সেখানেও বৈচিত্র্যের অপ্রাচুর্য নেই। প্রারম্ভেই কবি নিজেকে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন: টম, ডিক আর হ্যারি। (এই নামচয়নেও কাব্যটির আবেদন-ব্যাপকতা স্পষ্ট)। কাব্যের প্রথম অংশ ত্রয়ীর আলাপ। একটি মানুষে তিনটি মানস, লক্ষ্য অমর রোম। টম বলছে সে স্ন্যাপশট নেবে। ডিক বলছে, সে তা ডেভেলপ আর প্রিণ্ট করবে। হ্যারি বলছে, সে সেগুলি চিরন্তনীর ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবে। কাব্যটির প্রধান গুণ এই যে, এই তিন স্তরেই এর উপভোগ সম্ভব। এ যেন এমন ফুল, যা খোঁপায় পরতে পারো মালা গেঁথে প্রিয়ের গলায় দিতে পারো আবার দেবতার পায়ে পুজো দিতে পারো।

"দি পোয়েটিক ইমেজ" গ্রন্থে ল্যুইস হার্বার্ট রীডের মন্তব্য উদ্ধৃত করে মেনে নিয়েছিলেন যে, কেবলমাত্র মূর্ত প্রতীক নিয়ে কাব্য হয় না। আরো বলেছিলেন, সেই সঙ্গে চাই এমোশন, সেন্স্যুয়াসনেস এবং প্রোজ মীনিং। ভাব, ইন্দ্রিয়-সজাগতা ও গদ্যের বক্তব্যগুণ—এই তিনের অপূর্ব সমন্বয়ে "অ্যান ইটালিয়ান ভিজিট' সত্যকার সার্থক কাব্য হয়েছে। চিন্তা এখানে কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়নি, বাক্যচাতুরীতে আনন্দলোক লুপ্ত হয়ে যায়নি। ল্যুইস তাঁর নিজের কাব্যে দেখিয়েছেন যে, অসংলগ্ন সমাজের সদুত্তর অসংলগ্ন রচনা নয় ("দি পোয়েটিক ইমেজ," ১১৭ পৃ:)।

আনন্দ লোপ পায়নি, কিন্তু রোমান্টিক কবিদের সংশয়লেশশূন্য উচ্ছ্বাস কোথায় মিলবে আধুনিক কাব্যে? "We did not, you will remember, come to coo." নানা সভ্যতার শ্মশান এই রোম নগরীর বর্তমান দৈন্য তাই ল্যুইসের দৃষ্টি এড়ায়নি। ফোরাম আছে, কলীসিয়ম আছে—তারই পাশে আছে বেটি গ্রেবলের পায়ের প্রাচীর-বিজ্ঞাপন। শাদা-কালোর এই ছবির বর্ণনা মুহূর্তের জন্যেও কাব্যধর্মভ্রষ্ট হয়নি। তারই সঙ্গে আছে জিজ্ঞাসা: এই বিরাট সভ্যতার মৃত্যু হোলো কী করে? উত্তরের ইঙ্গিত আছে:

পুরানো পরিচিত কাহিনী সে।
জলহীন স্নানাগার, শুষ্ক নির্ঝরিণী।

তারও আগে মরেছিল ধর্মের ধারা
উচ্চাশার উষর মরুতে।
অভিলাষ ব্যাধি হোলো, বিলাসের মতো,
যেন সিফিলিস।
পলে পলে ক্ষয়ে গেল, পচে গেল
সভ্যতার খাস্থ্য সজীব।

এর পরে তাই কবিকে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে কবরের কাছে, সেখানে নিজেকে স্বাগত মনে হয়েছে। পরে ফ্লোরেন্সে পালিয়ে যেতে হয়েছে স্থাপত্যে শান্তি খুঁজতে।

বইয়ের ষষ্ঠ পর্বে আবাব মৃত্যুর চিন্তা। আবার সংশয, যখন পলায়নরত বর্তমানের মধ্যে শাশ্বতের সন্ধান করতে হয়েছে। এই নৈরাশ্যসমুদ্রে—

প্রেম ছাড়া আর আছে কোন তরী?
উঠেই পড়ি।

কবি এ অভিযানে বিষাদমুক্ত হননি, কিন্তু নিরাশও হননি।

আমাদের বর্তমান কাব্যবিমুখতার জন্যে প্রধানত আধুনিক কাব্যের ত্রুটি দায়ী, আমাদের রুচিভ্রম নয়। পাঠকের হৃদয়ে কাব্য আজ শুধু উচ্ছ্বাস দিয়ে প্রতিধ্বনি জাগাতে অক্ষম, কেননা সেই হৃদয় আজ অবিমিশ্র আনন্দ আর দ্বন্দ্বহীন নিশ্চিন্ততায় শয়ান নয। তাই কাব্যের আসনে আবেগকে আজ কিছুটা জায়গা দিতে হয় যুক্তি আর বিশ্লেষণকে। এই দুই নবাগত যদি সবটা জায়গা জুড়ে বসে, তাহলে কাব্য স্বধর্মভ্রষ্ট হয, কিন্তু সুষ্ঠু সমন্বয় হলে কাব্য সমৃদ্ধতর হয়—যেমন ডে ল্যুইসের রচনায় হয়েছে।

সপ্তম ও অন্তিম অধ্যাযে কবি আবার নিজেকে তিন ভাগে ভাগ করে যাচাই করেছেন ইটালি-ভ্রমণে তাঁরা কে কী পেয়েছেন। আলো পেয়েছেন (সঙ্গে ছাযা ছিল), গান পেয়েছেন, প্রাণ পেয়েছেন। আমরা এমন একখানি কাব্য পেয়েছি, যার সানন্দ পাঠে—ইটালিকে জানতে পাই, কবিকে জানতে পাই। নিজেকেও জানতে পাই।

২৮ মার্চ, ১৯৫৩

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

আমাদের অনেকেরই অপর নাম গডাচর। আমরা ভুঢও চাই, টামাকও চাই।

সমরসেট ম'ম অবশ্য বারবার বলেন যে, তাঁর লেখার (এবং সকল সাহিত্যের) এক এবং অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দ দেয়া, কিন্তু তাঁরও রচনায় এমন প্রচ্ছন্ন অনুযোগের অন্ত নেই যে, তাঁকে কেউ সুধী বলে সম্মান দিল না। বিপরীত দিকের দৃষ্টান্ত সেই অপঠিত লেখকগণ যাঁদের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, 'সাধারণ পাঠক ছেলে-মেয়ে-মেলানো গল্প ছাড়া আর কিছুর রসগ্রহণে অক্ষম।' সার্থক লেখক তাহলে কাকে বলব? যিনি শুধুই সরস এবং লোকপ্রিয়? না, যিনি সারবান এবং নীরস, তাই অল্পপ্রিয়? আমি প্রশ্নটার উত্তর দেব না, কেননা এই দ্বিভাজনটাই আমি ভ্রান্ত বলে মনে করি। সরসতা আর সারবত্তাব সম্বন্ধ আমার কাছে অহিনকুলের সম্বন্ধ নয়।

তবু যে-রচনার প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দদান নয়, শিক্ষাদান, তা অতীব সুপাঠ্য হলেও তাকে সাহিত্য বলে মানতে আমার বাধে। তাই, মনে আছে, বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে যখন সাহিত্যের জন্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছিল তখন আমি একটি বেতার বক্তৃতায় তার প্রতিবাদ করেছিলুম। বলেছিলুম, রাসেলের অনেক রচনা সাহিত্য, কিন্তু যেহেতু সাহিত্য-সৃষ্টি তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি সাহিত্যপুরস্কারে অনধিকারী। আজো এ মতটা পুরোপুরি পরিহার করিনি।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার সাহিত্যিক চিত্তে বিপরীত একটা প্রবৃত্তি লক্ষ্য করে বিব্রত হয়েছি। সেটাকেই গদাধরী প্রবৃত্তি বলছিলুম।

যখন দেখি কোনো ভাবুক সাহিত্যের কোনো মনোহারী মাধ্যমে তাঁর মৌলিক চিন্তা প্রকাশ করেন বলে লেখক হিসাবে পাঠকদের কাছে আদৃত হন কিন্তু জ্ঞানী হিসাবে পণ্ডিতদের মহলে অবজ্ঞাত থাকেন, তখন সেই হিং-টিং-

ছুট-মার্কা পাঠশালার গুরুমশাইদের এই বলে গাল দেবার লোভ দমন করতে পারিনে যে, লেখকটির একমাত্র অপরাধ তিনি অনুস্বার-বিসর্গের স্তূপ জড়ো করেননি, শক্ত কথা সুন্দর ও সরস ভাষায় বলেছেন। অর্থাৎ, একান্ত স্বার্থপরের মতো, সাহিত্যিক প্রসঙ্গত ভাবুক হলে তাঁর জন্যে ভাবুকের পুরো সম্মান দাবী করি, অথচ ভাবুক প্রসঙ্গত সাহিত্যিক হলে তাঁকে সাহিত্যিকের ষোলো আনা সম্মান দিতে কার্পণ্য করি।

দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি, বার্নার্ড শ-র জন্যে দার্শনিকের স্বীকৃতি চাই কেননা 'ম্যান এ্যাণ্ড সুপারম্যান' বা 'ব্যাক্ টু মেথ্যুসেলা' নাটকে তিনি জীবন সম্বন্ধে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ও মত প্রকাশ করেছেন যা নীরস গদ্যে বিবৃত হলে অনায়াসে দর্শন বলে পরিগণিত হোতো। আবার বার্ট্রাণ্ড রাসেল যখন মুখ্যত দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন করতে বসে অনায়াসে সাহিত্য সৃষ্টি করে বসেন তখন তাই নিয়ে তুষ্ট থাকিনে। প্রশ্ন তুলি সজ্ঞান উদ্দেশ্যের। জিজ্ঞাসা করি, রাসেল কি সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, না জ্ঞান বিতরণ করতে ?

দার্শনিকদের বেলায় এটা অত্যন্ত গর্হিত রসহীনতা বলে মনে করি যে, তাঁরা সাহিত্যের বাসায় দর্শনের জন্ম হলে সে শিশুকে অন্ত্যজ বলে অবজ্ঞা করেন। অথচ সঙ্গে সঙ্গে এই অযৌক্তিক দাবীটাও করি যে, দর্শনের ঘরে সাহিত্যের আকস্মিক অর্থাৎ অপূর্ব-পরিকল্পিত জন্ম হলে সাহিত্যে তার পাংক্তেয় হবার অধিকার নেই।

তাহলে কি লেখকের উদ্দেশ্যই শুধু লেখার শ্রেণী-নির্দেশ করবে ? অর্থাৎ সাহিত্যসৃষ্টি রচনার মূল উদ্দেশ্য হলে তবেই তা সাহিত্য, আর অসাহিত্যিক অভিসন্ধি থাকলে তা সুরচিত হলেও সাহিত্য নয় ? রাসেলের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির কালে প্রশ্নটার সরাসরি উত্তর দিয়েছিলুম। বলেছিলুম, না। আজ এতটা নিঃসন্দেহ নই। কেননা যদি ধরেও নিই যে, সাহিত্যের একমাত্র সঙ্গত উদ্দেশ্য আনন্দবিধান তাহলেও প্রশ্নটার সমাধান হয় না। আনন্দেরই যে রূপ পরিবর্তন হচ্ছে দিনে দিনে। কালকের রসিকতা আজ রুচিহীন মনে হয়। গত পরশুর চাঁদ-চকোর নিয়ে হায়-হায় আজ অসহ্য গলিত ভাবালুতা

বলে প্রত্যাখ্যাত। তারও আগের দিনের ঈশ্বর নিয়ে রামপ্রসাদী ভজনা বা পরমপুরুষের অতি-সরলতা আজ ক'টি শিক্ষিত মনে অনুকূল সাড়া পাবে?

বর্তমানবিরক্ত কেউ যদি বলেন ঈশ্বর গুপ্তের পুনরাবির্ভাব চাই, কবিতাও আবার কান্তে আর কীর্‌কিগার্ড ছেড়ে চাঁদ-চকোরে ফিরে না গেলে আত্মস্থ হবে না এবং আধুনিক মন আবার বিশ্বাসের কোলে না ফিরলে বর্তমান বিভ্রান্তি বিদায় নেবে না—তাহলে তা নিয়ে বিবাদ করবারও দরকার নেই। ইতিহাসে প্রত্যাবর্তন বলে কোনো বস্তু নেই। তাই তাঁদের ব্যবস্থা এমন ওষুধ যা খেলে রোগ হয়তো সারলেও সারতে পারে, কিন্তু রোগী যে তা সেবন করবে না তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সাহারার রোগীকে হাইড্রোপ্যাথি বুঝিয়ে কী লাভ? ব্রডওয়ের মেয়েকে রান্নাঘরে ফিরতে বলা কি অরণ্যে কান্না নয়?

নন্দনশাস্ত্রের সহস্র সূত্র আবৃত্তি করলেও আজকের ঔপন্যাসিক তাই কিছুতেই তাঁর সমাজচেতনা পুরোপুরি পরিহার করতে পারবেন না। কবির পক্ষেও আজ তাই শুধুমাত্র চন্দ্রাহত হয়ে উচ্ছ্বাসসবস্ব কাব্যরচনা সম্ভব নয়। বর্তমান সাহিত্যে তাই প্রেরণা সব সৃষ্টির জননী হলেও বুদ্ধি এবং বিশ্লেষণকে ধাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করতেই হয়। অর্থাৎ ভাবুকের পক্ষে সাহিত্যিক হওয়া যদিও শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয়, সাহিত্যিকের পক্ষে আজ যৎকিঞ্চিৎ ভাবুক হওয়া প্রায় অপরিহার্য। অর্থাৎ বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো পণ্ডিত ব্যক্তি যদি সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহলে তাঁকে সাদরে সাহিত্যিক বলে গ্রহণ করলে সাহিত্যের শুচিতা নষ্ট হবে না।

আশি বছর বয়সে রাসেল ঠিক সেই কাজটি করেছেন। পাঁচটি ছোট গল্পের একটি সংকলন* প্রকাশ করেছেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য আনন্দদান। প্রতিটি কাহিনীর বর্ণনায় দার্শনিক রচনার স্বচ্ছতা ও দীপ্তি বর্তমান।

গল্পগুলি কেমন? প্রকাশক বলছেন এগুলি আর কারো লেখা হলেও

*Satan in the Suburbs by Bertrand Russell (The Bodley Head, 9s. 6d.)

তাঁরা বইটি প্রকাশ করতেন। হবে। কিন্তু আমি পড়তুম না। এবং এখন জানি কী হারাতুম। ভয়ানক কিছু নয়।

১১ এপ্রিল, ১৯৫৩

জেমস বসওয়েল

একেবারে ভৃত্য না হলেও, 'শুধু সঙ্গে এসেছে'—সাধারণ্যে এই ছিল বসওয়েলের পরিচয় দুদিন আগে পর্যন্ত। হবুচন্দ্রের যেমন গবু, ডন কুয়োটির যেমন সাঙ্কো পাঞ্জা, পাঠ্য-বইয়ের যেমন জে, এল, ব্যানার্জী, গায়কের যেমন তবলচি—জনসনের তেমনি বসওয়েল, এই ছিল লোকগৃহীত ধারণা। এই অসত্য চিত্রটি আরো দৃঢ়মূল হয়েছে জনসন-চরিতামৃতের দৈর্ঘ্যের কল্যাণে, কেননা ওই ওজরে অপূর্ব জীবনীটি অনেকের আছে কোনো কোনো সভাপতির ভাষণের মতো 'পঠিত বলিয়া গৃহীত।' ফলে জনসন ও বসওয়েল দুজনেরই অপঠিত অমরত্ব লাভ হয়েছে, যোগ্য পরিচয় ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

দুই পাখীতে দেখা হয়েছিল ১৭৬৩ খৃস্টাব্দের ১৬ই মে। দেখা তো নয়, যেন হিন্দু বিয়ে। এর পরে আর এক ছাড়া অপরের পরিচয় নেই। চিত্রটি আরো বিকৃত হয়েছে নানা কিম্বদন্তীতে। পাঠালস সবাই আজ ধরে নিয়েছি যে, জনসন ছিলেন একটি ভালুক (মিসেস বসওয়েলের বর্ণনা) আর বসওয়েল তাঁর পোষা কুকুর (cur থেকে bur করলেই গোল্ড্‌স্মিথের বর্ণনা হবে); অর্থাৎ একজন বেঁচে আছেন ক্যারেকৃটর হয়ে, আর অপর জন ডিক্টাফোন হয়ে।

জনসনের সাহিত্যিক গুরুত্ব অন্তত পণ্ডিতজনের অজানা ছিল না। কিন্তু বসওয়েলের সম্যক পরিচয় সম্ভব হোলো মাত্র গত কয়েক বছরের মধ্যে যখন প্রধানত কর্নেল ঈশম্ ও য়েল বিশ্ববিত্যালয়ের চেষ্টায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় বসওয়েলের নবাবিষ্কৃত কাগজপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশ করবার ব্যবস্থা হলো। অক্লান্তলেখনী বসওয়েলের এই বৃহৎ পত্রসম্ভার বর্তমানে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত

হচ্ছে। বছর দেড়েক আগে এলো প্রথম গ্রন্থ : লণ্ডনে বসওয়েল ১৭৬২-৬৩, এখন এসেছে হল্যাণ্ডে বসওয়েল ১৭৬৩-৬৪*।

Bozzy-রে পাবে না Sam-জীবনচরিতে।

কিন্তু বসওয়েলের. নিজের সম্বন্ধে লেখায় তাঁর কোন ছবি পাঠকের চোখে ভেসে ওঠে? স্তাবকের যে ছবি আমাদের মনে লোহার পেরেক দিয়ে আঁটা আছে, সম্প্রকাশিত কাগজপত্রে তার পরিপূর্ণ খণ্ডন নেই। কিন্তু এই ঘৃণ্য লেলিহানতায়ও একথা অবলুপ্ত হয়ে যায় না যে এখানে ওখানে একটি দুটি কথায় বসওয়েল তাঁর সমকালীন পরিবেশের সুন্দর একটি চিত্র রেখে গেছেন উত্তরকালের জন্তে।

পরিবেশ কিন্তু স্থান পেয়েছে শুধু প্রসঙ্গত। মঞ্চের মধ্যস্থল থেকে বসওয়েল নিজেকে স্থানচ্যুত হতে দেননি কখনোই। মঞ্চে তাঁর অবস্থানও সর্বদা এক বেশে নয়। প্রায় বহুরূপী। কখনো মনে হয় Bozzy সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়; পরক্ষণে মনে হয়, বাবু চোরবেশে ভীরু সাধু অতিশয়। এই দুটি চরিত্রই যে আলোচ্য গ্রন্থে সমভাবে স্বপ্রকাশ তার জন্তে বসওয়েলের বংশধররা বিব্রত হলেও পাঠকদের বাধিত হওয়া উচিত।

প্রবৃত্তি ও প্রতিজ্ঞার দ্বন্দ্বে জর্জরিত যে বসওয়েল ১৭৬৩র ৪ঠা অগস্ট লণ্ডন ছেড়েছিলেন, বলা বাহুল্য হল্যাণ্ডে পদার্পণ করেই তিনি অন্ত ব্যক্তি হয়ে যান নি। বিদেশে গেলেও তাঁর সঙ্গে এলো উচ্চাভিলাষ ও নিম্নাভিরুচি, যেন সদা-কলহমানা দুটি সপত্নী। একাধিক অর্থে বসওয়েল চিরজীবন বহুপত্নীক ছিলেন।

দিন্‌কা মোহিনী তাঁর উচ্চাভিলাষ। তিনি (মাদ্রাজে মাইকেলের মতো) সাতটা থেকে আটটা ওভিড পড়েন, আটটা থেকে ন'টা তার ফরাসি সংস্করণ, দশটা থেকে এগারোটা ট্যাসিটাস, তিনটে থেকে চারটে ফরাসি, চারটে থেকে পাঁচটা গ্রীক, ছ'টা থেকে সাতটা দেওয়ানী আইন, আটটা থেকে দশটা ভল্‌তেয়ার—তারপর দিনপঞ্জী, চিঠি আর অন্তান্ত বই। নিয়ম করে রোজ

* *Boswell in Holland*: Yale Edition of the Private Papers of James Boswell. Edited by Frederick A. Pottle (Heinemann, London, 25 s.)

অন্তত দশ লাইন কবিতা লেখা পর্যন্ত আবশ্যিক। শুধু বিদ্যাভ্যাসই যথেষ্ট নয়। মিতাচারী হতে হবে, এবং (স্বটু রক্ত যাবে কোথায় ?) মিতব্যয়ী হতে হবে। বিচক্ষণ হতে হবে। সর্বোপরি, গণ্যমান্য ভদ্দরলোক হতে হবে।

কিন্তু রাত্‌কা বাঘিনী সমান পরাক্রান্তা। লণ্ডন জর্নালে ছিল (১২-১-৬৩): "কাল রাত্রে কামদেবের আশীর্বাদে পাঁচবার লুইসার ক্রোড়ে পরমা তৃপ্তি লাভ করেছি। তাতে শুধু অমিত তেজেরই প্রমাণ দিই নি, মিতব্যয়িতারও ; মোট খরচা হয়েছিল নীট আঠারো শিলিং !" হল্যাণ্ডে এসে এই তেজ বহুল পরিমাণে শান্ত হয়েছে, কিন্তু অস্থিরমতিত্ব যাবে কোথায় ? একবার মনে হয় স্টুয়ার্টের ভগিনী বিহনে জীবন অর্থহীন, পরে জেলিড আসে প্রবলতর আবেদন নিয়ে।

এই সমস্ত 'পেকাডিলো' কিন্তু কখনোই বসওয়েলকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি। আনন্দসন্ধানের অন্তরালে বার বার রচিত হয়েছে 'ইন-ভাযোলেবল্ প্ল্যান,' অলঙ্ঘ্য নীতিনির্দেশ। তাব পরেই আসে লঙ্ঘনের জন্যে অনুশোচনা ও বিলাপ।

আমার ধারণা, অনুশোচনা সাহিত্যে সাধারণত বড়ো উপেক্ষিত হয়ে থাকে। কামনার উচ্ছ্বাস কাব্যে বিস্তর, তার ব্যর্থতার জন্যে ক্রন্দনেরও স্থান সাহিত্যে বৃহৎ। কিন্তু চরিতার্থতার অবসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে নেই বললেই চলে।

ওটার উদ্ভব প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। এই জন্যেই বসওয়েলের অনুশোচনার আতিশয্যে হাস্য সম্বরণ করতে না পারলেও সঙ্গে সঙ্গে সমান অবাক হতে হয়।

এই অনুশোচনা নিয়ে প্রকাশ্যে বিলাপ করলে প্রতিবেশীরা হাসে। আরো যারা রুচিবাগীশ তারা বলে, লোকটা অস্বাভাবিক, মর্বিড। ডস্টয়েভস্কির অনেক চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণের রায় অনুরূপ। আমি কিন্তু একমত হতে পারিনে। আমি বলি, সংবেদনশীল মন যেমন গভীরতর আনন্দ-বেদনার অধিকারী, তেমনি অতিরিক্ত অনুতাপেরও ভুক্তভোগী। ওরা অস্বাভাবিক নয়, হৃদ্‌মোটর ওদের আর পাঁচজনেরই মতো ; বিলাপ করে শুধু এই জন্যে যে ওদের সাইলেন্সারটা বিকল হয়েছে, অর্থাৎ প্রকাশ না করে উপায় নেই।

পূর্বরাত্রির আনন্দের গান তো অনেকের কণ্ঠে; পরপ্রভাতের পরিতাপে সিদ্ধকণ্ঠ বসওয়েল। বসওয়েলের বিলাপ শোনবার মতো। সমাজে সফল ও নিজের কাছে সার্থক হবার প্রায় পরস্পরবিরোধী স্বপ্ন সত্য করবার জন্যে বসওয়েল যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, তার বর্ণনায় বইটির প্রতি পৃষ্ঠা কৌতূহলোদ্দীপক।

সমান কৌতূহল জাগাবে বসওয়েল ও জেলিডের পত্রাবলী। এই জেলিডই উত্তরকালের মাদাম দ্‌ শারীয়ের্‌। বেন্‌জামিন কন্‌স্টঁর "অ্যাডল্‌ফ্‌." (বোধহয় বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ খণ্ডোপন্যাস) যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে এই অসামান্যা নারী অপরিচিতা নন।

২ অগস্ট, ১৯৫২

সার্ চার্লস ডারউইন

১৯৫৫-৫৬-র ফ্রান্স নয় (আর্থার ক্যেসলার: 'দি এজ্‌ অব্‌ লঙিঙ')। ১৯৮৪-র ইংল্যাণ্ড নয় (জর্জ অরওয়েল: '১৯৮৪')। এমন কি ২১৪৯ খৃস্টাব্দের ক্যালিফর্নিয়াও নয় (অল্ডাস্‌ হাক্সলে: 'দি এপ্‌ য়্যাণ্ড্‌ এসেন্স')। উপন্যাসও নয় এগুলির মতো। একেবারে ইতিহাস, তা গোটা পৃথিবীর, এবং সময়ের ব্যাপ্তিটা আগামী দশ লক্ষ বৎসর। এই নাতিক্ষুদ্র বিষয় হলো বিজ্ঞানী সার্‌ চার্লস্‌ ডারউইনের বিষয়*। ইনি 'অরিজিন অব স্পীসিস্‌'-লেখক ডারউইনের পৌত্র।

ঠিক দশ লক্ষ কেন? কারণ জীববিজ্ঞানীরা প্রায় একমত যে কোনো প্রাণিশ্রেণীর পূর্ণ রূপান্তর ঘ'টে নতুন একটা প্রাণিশ্রেণীর উদ্ভব হতে প্রায় অতটা সময় লাগে। বিবর্তন নিরবচ্ছিন্নভাবে সর্বদাই চলতে থাকবে, কিন্তু মানুষ সম্পূর্ণ অন্য একটা প্রাণীতে পরিণত হবে মোটামুটি দশ লক্ষ বছর পরে।

* *The Next Million Years by Sir Charles Darwin (Rupert Hart-Davis 15 sh.).*

এ থেকে যদি ধরে নেয়া যেতো যে মানুষের মৃত্যু আগামী দশ লক্ষ বছর স্থগিত থাকবে তাহলে কোনো কোনো মনে আশার সঞ্চার হোতো।

কিন্তু তারও উপায় নেই।

এমন দুঃসাহসিক ভবিষ্যদ্বাণীতে নিযুক্ত হয়ে লেখককে বারবার বলতে হয়েছে যে অসংখ্য অজ্ঞেয়পূর্ব অনিশ্চয়তা ইতিহাসের গতিপথে প্রক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর ভুবনভাগ্যগণনা ভণ্ডুল করে দিতে পারে। গ্রহে-গ্রহে মরণ-কোলাকুলি হওয়া অসম্ভব নয়; পৃথিবী নামক গ্রহটির মধ্যেও এমন আত্মধ্বংসী বিপর্যয় ঘটতে পারে যে, তারপর স্মৃতিভারে কোষ্ঠী পড়ে রবে, ভারযুক্ত জাতক যে নাই!

বিজ্ঞানী ডারউইনের কাছে এই জাতকটি একটি বন্য জানোয়ার। শুধু আজকে নয়, বরাবর সে বন্য থাকবে। তাকে পোষ মানাবার চেষ্টার ত্রুটি হবে না,—নানা 'ক্রীড্', অর্থাৎ মতবাদ, আফিম হয়ে আসবে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কিছুদিনের জন্যে--হয় তো গোটাকয় শতাব্দী—সে 'অ্যানিম্যাল ফার্ম' গড়বে; কিন্তু নেপোলিয়নদের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন অনুত্তরিত, তাই এমন একটা 'মাস্টার ব্রীড্' কখনো হবে না যা জন্মজন্মান্তর প্রভু হয়ে থাকবে, আর বাকি মানবজাতি বিনা প্রতিবাদে তাদের আজ্ঞাবাহী হবে। মানুষের স্বভাব নূতনের সন্ধান, অজানাকে নিয়ে পরীক্ষা; সে নবনবোন্মেষশালী, তাই অন্য জীবদের থেকে পৃথক।

তাই যদি হয়, তাহলে এও কি সম্ভব নয় যে মানুষ তার উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এমন সমস্ত নতুন নতুন আবিষ্কার করবে—বিজ্ঞানে ও চিন্তায়—যে সে তার বর্তমানের ও ভবিষ্যতের সমস্যাগুলিরও সমাধান করতে পারবে, যেমন করেছে অতীতের সমস্যাগুলির? ডারউইন আশাশীল নন। কেননা, বিজ্ঞান যদিও তার বাল্যে অপরিসীম সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিল, আজ সেই বিজ্ঞানই স্বীকার করতে বাধ্য যে সে-আশার অনেকটা অলীক। বিজ্ঞান তো কেবল নিত্য নতুন কলকব্জা আবিষ্কার করে না, সে এমন কতগুলি কেবল নীতি নির্ণয় করে যার পরিবর্তন নেই, যার উত্তরণ অসম্ভব।

বিজ্ঞানের এই সম্ভাবনার সামনে সীমানা টেনে দেয়ার দিকটা প্রায়ই উপেক্ষিত হয়ে থাকে। ডারউইন দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, এক শ' বছর আগেও

কেউ জানতো না থার্মোডাইনামিক্‌সের আইনগুলির কথা, অথচ সেগুলিকে আজ না মেনে উপায় নেই কোনো এঞ্জিনের, যেমন উপায় নেই বৃন্তচ্যুত আপেলের মাটিতে না পড়ে।

ডারউইন বলছেন, এ পর্যন্ত মানবাধ্যুষিত পৃথিবীর ইতিহাসে চারটি বিপ্লব হয়েছে। এক, প্রাগৈতিহাসিক যুগে আগুনের আবিষ্কার—যাতে খাদ্যে বৈচিত্র্য ও সাময়িক প্রাচুর্য এলো। দুই, কৃষির আবিষ্কার, হাজার দশ-পনের বছর আগে,—যাতে যাযাবর শিকারী স্থিত থেকেও ভুক্ত হতে শিখল। তিন, নগর স্থাপন, হাজার ছয়েক বছর আগে,—যাতে বাসের জায়গা বাড়ল, উৎপাদন বাড়ল ও দুর্দিনের জন্যে খাদ্যসঞ্চয় শেখা হোলো। আর, চতুর্থ বিপ্লবটি হচ্ছে বিজ্ঞানের বিপ্লব। এই চতুর্থটির বয়স এতই অল্প যে, দুঃস্থা বিধবা যেমন একমাত্র শিশুসন্তানের বড়ো হয়ে বড়ো হবার আশায় বুক বাঁধে, তেমনি মানবজাতিও আশা করে বিজ্ঞানের মুখ চেয়ে আছে যে একদিন সে বড়ো হবে এবং সেদিন সব মুশকিলের আসান হবে। ডারউইন বলছেন, হবে না।

মুশকিলগুলি প্রধানত কী? পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির প্রচারচাতুরীতে ও আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চিন্তাবিভ্রমে আমরা প্রায় একথা বিশ্বাস করতে বসেছি যে, আজ মানবজাতির প্রধান সমস্যাটা নৈতিক। সত্য জিতবে, না অসত্য জিতবে? ডারউইন বলছেন, এটা গুরুতর প্রশ্ন সন্দেহ নেই, কিন্তু গোড়ার কথা এটা নয়। প্রশ্ন সত্যের ততটা নয়, যতটা সত্তার। মানুষ বাঁচলে তবে তো সে ভালো হবে, বা মন্দ হবে! প্রধান সমস্যাটা তাই বাঁচার। মানুষ, হয়তো, শুধু রুটি নিয়ে বাঁচে না, কিন্তু রুটি বাদে কে বাঁচে?

এখানে গভীর দুশ্চিন্তার কারণ আছে। পৃথিবীতে আজ যতটা খাদ্য উৎপন্ন হয় তা, (বন্টনের প্রশ্ন আলাদা), মানবজাতির পক্ষে মোটামুটিভাবে পর্যাপ্ত। খাদ্যের পরিমাণে ও খাদকের সংখ্যায় মোটামুটি একটা সাম্য না থাকলে অনশন বা অপচয় অবশ্যম্ভাবী। প্রথমটির সম্ভাবনা আসন্ন এবং তার সমাধান সুদূরপরাহত। শুধু খাদ্যই নয়, মানবজীবনের পক্ষে অপরিহার্য এমন অন্যান্য বহু উপকরণের বেলায় আমরা এখন বেপরোয়াভাবে

মূলধন ভেঙে চলেছি। একদিন দেখব এবং সেদিন দূরে নয়—কখন দেউলে হয়ে গেছি, জানতেও পারিনি !

কয়লা বা তেলের কথা ধরা যাক। এ দুটি জিনিস পৃথিবীর গর্ভে সঞ্চিত হয়ে আসছিল গত ৫০০,০০০.০০০ বছর থেকে। কিন্তু আজ আমরা যে হারে এদের ব্যবহার করছি তাতে আগামী এক শ' বছরের মধ্যে আর এক কৌটা তেলও অবশিষ্ট থাকবে না, আর পাঁচ শ' বছরেরও আগে সমস্ত কয়লা নিঃশেষিত হয়ে যাবে। তারপর কল চলবে কী দিয়ে, ঘরে আলো জ্বলবে কোন শক্তিতে? আণবিক শক্তির কথা অনেক শোনা যাচ্ছে। কিন্তু, লেখক বলছেন, এ আশা অতিকৃত।

ভূগোল বলছে, দ্বিতীয় আমেরিকা কোথাও লুকানো নেই। বিজ্ঞান বলছে, সে আলাদিনের প্রদীপ নয়। অতএব স্থানাভাব ঘটবে, খাদ্যাভাব ঘটবে; কেননা খাবার বাড়ে গাণিতিক হারে, আর লোক বাড়ে জ্যামিতিক হারে। এ দ্বন্দ্বে মানুষের হার সুনিশ্চিত। নিমাই চন্দ্রকে বলেছিল, কী হে, তোমার ঘাড়ে কি ম্যালথসের ভূত চাপল নাকি? অন্ততঃ ভারতবর্ষে আমরা যদি ম্যালথসের হুঁসিয়ারি কানে না তুলি, তাহলে তাঁর ভূত যে অদূরভবিষ্যতেই আমাদের ঘাড় মটকাবে, সে সম্বন্ধে আমার অন্তত লেশমাত্র সন্দেহ নেই।

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

স্বাঁদাল

বাঙলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শনে কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ তদানীন্তন (১৫৫৫ খৃস্টাব্দ) আহোম রাজাকে লিখেছিলেন, "তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত

হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বর্ত্তাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক।" অর্থাৎ পত্র আর বার্তার বাহন মাত্র রইল না, পত্ররচনাও ব্যবহারিক স্তর থেকে সাহিত্যিক পর্যায়ে উন্নীত হোলো। সাহিত্যের আরেকটি শাখা হোলো।

এ-শাখার একটি সুন্দর পাতা রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'। তাইতে তিনি ১৮৯৫-র ৮ই মার্চ লিখছেন, "চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্ত আরো একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে······চিঠি মনের ঠিক যে রস দোহন করতে পারে, কথা কিম্বা প্রবন্ধে কখনোই তা পারে না।" স্তঁাদালের পত্র-সঞ্চয়নে* এই রসের অভাব নেই।

কিন্তু অন্যান্য রস থেকে পত্রসাহিত্যের রস বিভিন্ন হওয়া উচিত। এ পার্থক্য দু রকমের। বস্তুতে এবং আধারে। সাহিত্য-রচনায় যে অবশ্যম্ভাবী প্রয়াস আছে, পত্র লিখতে তার দায় নেই। পত্রে তাই লেখককে পাই আটপৌরে পোষাকে। এখানে সব সময় মনে রাখতে হয় না যে, পাঠক নামক অপরিচিত একটি ব্যক্তির মনস্তুষ্টি সাধন না করতে পারলে লেখকের রচনা ব্যর্থ হোলো; এখানে অজ্ঞাত পাঠকমণ্ডলীর অজ্ঞেয় রুচি সর্বদা কনুইয়ের কাছে এসে মন্ত্রণা দিতে থাকে না যে, পাঠক তোমাকে ভালোমন্দ মিশিয়ে দেখবে না, তোমাকে বিচার করবে শুধু তোমার বর্তমান রচনা দিয়ে, একবারও মনে রাখবে না যে, এর আগে তুমি হযতো তাকে আনন্দ দিয়েছিলে। পাঠককে গল্প শোনাতে হলে তোমার একাধিক সহস্র কাহিনীর প্রত্যেকটি গল্পকে চিত্তহারী হতে হবে, নইলে গলা হারাতে হবে।

পত্র-প্রাপকের বা প্রাপিকার বিচার এত কঠোর নয়, এত নির্মম নয়। এখানে তাই লেখকের অপেক্ষাকৃত কম সচেতন একটা চেহারা দেখতে পাওয়া সম্ভব। আধারের নিরাভরণতা বস্তুকেও মুক্তি দেয়, অর্থাৎ পত্র-সাহিত্যের

* *To The Happy Few,* **Letters of Stendhal, Translated by Norman Cameron** (*John Lehmann, 21s.*)

মধ্য দিয়ে লেখকের অন্তরের, তাঁর ব্যক্তিত্বের, একটি অনাবৃত রূপ আবিষ্কার করা সম্ভব—যা হয়তো লেখকের জীবনের অজ্ঞাতপূর্ব কোনো দিক উদ্ঘাটিত করে দিয়ে তাঁর সাহিত্যেও নতুন আলোকপাত করবে।

লক্ষ্য করতে হবে যে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমি বার বার শুধু সম্ভাব্যতার উপর জোর দিয়েছি; জোর করে বলিনি যে, এমন হতেই হবে; কেননা, পত্র-সাহিত্যের বেআব্রু আন্তরিকতা সম্বন্ধে এই বহুগৃহীত মতটা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করিনে। পত্র লিখতে বসেও সত্যি আমরা সম্পূর্ণরূপে আন্তরিক কখনো হইনে, ওখানেও নিজেকে একেবার ধরা দিইনে। শব্দ-মাধুরীতে যে লেখকের সত্যকার প্রীতি আছে, তাঁর পত্র-রচনাও কখনোই একেবারে সাহিত্যগুণবিরহিত হতে পারে না। প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের যে কোনো পত্র। দ্বিতীয়ত, পত্র লিখতে বসে পাঠকের মন ভোলাতে সজ্ঞান কোনো চেষ্টা করিনে বটে, কিন্তু যাঁকে চিঠি লিখছি, তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা কি সত্যি একেবারে বিস্মৃত হতে পারি? আমি সত্যি যত ভালো, তার চেয়ে আরো একটু ভালো করে নিজেকে দেখাবার লোভ সম্বরণ করা কি এতই সোজা? প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় আমি যেম আমার সবচেয়ে ভালো জামাটা পরে নিই, রুমালে একটু সুরভি মাখিয়ে নিই, ভালো করে চুল আঁচড়ে পাকা চুলগুলি সযত্নে অবশিষ্ট কালো চুলগুলির তলায় লুকিয়ে রাখি—পত্র-সাহিত্যেও এমন অনান্তরিক লুকোচুরির অবকাশ আছে। এখানেও আমরা মুখোস পরি; সে-মুখোস কখনো অননুভূত অনুতাপের, কখনো বা অতিকৃত অনুভূতির।

স্তাঁদালের প্রসঙ্গে অবশ্য এ আলোচনাটা অনেকাংশে অবান্তর। তাঁর উপন্যাসে সচেষ্ট কোনো স্টাইল নেই (স্টাইল সম্বন্ধে তাঁর মতের জন্যে ব্যালজাকের কাছে লেখা চিঠিটি দ্রষ্টব্য), অতএব পত্রে যে তা থাকবে না, তা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে আত্মজীবনীর অংশ এত বেশি যে, তাঁর সাহিত্যে তাঁর জীবনের প্রতিফলন অত্যন্ত স্পষ্ট। সাহিত্য ও জীবনের এই একাত্মতার জন্যেই স্তাঁদালের পত্রগুলি তাঁর অন্যান্য রচনার মতোই অবশ্যপাঠ্য।

ঠিক একই কারণে পত্রগুলি একটু নৈরশ্যজনকও বটে। কেননা এতে নতুন ও বিভিন্ন কোনো রচনা-রীতি নেই। নেই তাঁর জীবনের অন্য কোনো দিকের নবাবিষ্কার। তাঁর উপন্যাসগুলি পড়ে পাঠকের মনে লেখকের যে রূপটি উদিত হয়েছিল, তাঁর পত্র পাঠে সে ধারণার সমর্থন মেলে। নতুন কোথাও আলো পড়ে না, যেখানে আগে অন্ধকার ছিল।

কিন্তু স্ত াঁদালের জীবন ও সাহিত্য এমনিতেই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। মঁসিয়ে অঁরি বেল (১৭৮৩—১৮৪২) ছিলেন সরকারী কর্মচারী; ফরাসি হয়েও তিনি ছিলেন সত্যকার য়ুরোপীয়ান, ভ্রমণ করেছেন ওই মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত; ইটালিকে, বিশেষ করে মিলানকে, ভালোবেসেছেন নিজের দেশের চেয়ে বেশি; অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে লিখতে শুরু করেছেন এবং তাও ব্যর্থপ্রেমের বিষণ্নতায়, সান্ত্বনার সন্ধানে কিম্বা শুধু দুঃসহ নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির জন্যে; তবু জার্মান একটা ছদ্মনামে নিজের নাম উৎকীর্ণ করে গেছেন অসীম ঐশ্বর্যশালী ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাসে।

ইটালিয়ান ভাষায় তিনি নিজে তাঁব সমাধিফলকের জন্যে লিখে গিয়েছিলেন: Visse, Scrisse, Amo—সে বেঁচেছে, সে লিখেছে, সে ভালোবেসেছে। বস্তুত এই তিনে মিলেই হয়েছিল তাঁর জীবনের ত্রিবেণীসঙ্গম। প্রথমে সেনাবাহিনীতে, তারপর রাজদূত হিসেবে এবং অবসর পেলেই স্কালা থিয়েটারের বাক্সে জীবনকে তিনি স্পর্শ করেছেন অসংখ্য বিন্দুতে; যা দেখেছেন, যা উপভোগ করেছেন, যা থেকে বেদনা পেয়েছেন, তার সব কিছু সবিস্তারে লিখেছেন আপন প্রতিভার রঙে রাঙিয়ে; আর ভালোবেসেছেন জীবন ভরে, অর্থাৎ ভালোবাসতে চেয়েছেন। অভিনেত্রীকে, অভিজাত মহিলাকে, শেষ পর্যন্ত একটি মার্চেসাকে।

এই নানামুখীন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ স্ত াঁদালের 'চার্টারহাউস অব পার্মা,' 'লাইফ অব অঁরি ব্র্যলার্দ,' 'দ্ লামুর,' 'দি স্কার্লেট অ্যাণ্ড দি ব্ল্যাক।' জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার, বিশেষ করে প্রেমের, এমন বিস্তৃত বিশ্লেষণ

বিশ্বসাহিত্যে বেশি নেই। আলোচ্য পত্রগুলিও সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টির নির্ভুল পরিচয় বহন করছে।

১ নভেম্বর, ১৯৩২

কিন্তু স্তাঁদালের জীবন সম্বন্ধে তাঁর নিজের সমস্ত উক্তির অবিশ্বস্ততা মনে রাখা দরকার। স্টেফান ৎসাইগ বলেছেন, 'Few have lied more arrantly or quizzed the world with greater delight than Stendhal.' এই শিল্পিসুলভ দুর্বলতা তাঁর পত্রেও বোধহয় অবর্তমান নয়। তাঁর শিল্পসৃষ্টির কথা অবশ্য আলাদা। সে সম্বন্ধে ৎসাইগ বলেছেন, ওই একই বাক্যে, 'few have told the truth to better advantage or with more profundity than he.' উদ্ধৃতিটি ৎসাইগের *Adepts in Self Portraiture* বই থেকে।

আর্থার ক্যেসলার

আর্থার ক্যেসলারের প্রায় প্রতিটি লেখা তাঁর নিজের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ঘিরে রচিত। তবে আবার তার উপর খোলাখুলি আত্মজীবনীর* প্রয়োজন কী ছিল? বইটি পড়লে সন্দেহের নিরসন হয়। বর্তমান শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা শক্তিমান লেখকদের অন্যতম একজনের জন্ম থেকে সাম্যবাদে উপনায়ন পর্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্তের বিবরণ ও বিশ্লেষণ এতে বিস্ময়কর নৈপুণ্য ও অকপট আন্তরিকতার সঙ্গে অঙ্কিত। এই চিত্র শুধু লেখকের অন্যান্য বইয়ের পরে আরেকটি বই নয়, এ তাঁর সমগ্র জীবনের তথা রচনাবলীর টীকা। আগে যে পূর্ণমুদ্রিত ছবি দেখেছিলেম এখন তার 'প্রোগ্রেসিভ্ প্রুফ্' মিলল।

লেখকের নিজের দিক থেকেও এ বইয়ের প্রয়োজন ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ক্যেসলার যখন স্পেনে জেনারেল ফ্রাংকোর জেলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন তখন তিনি শপথ করেছিলেন: "এবার যদি জীবদ্দশায় এখান থেকে মুক্তি পাই তবে একটি আত্মজীবনী লিখব। সে লেখা এমন অকপট ও আত্মসমালোচনায় এমন নির্মম হবে যে তার তুলনায় রুসোর

* *Arrow in the Blue,* by Arthur Koestler (Collins with Hamish Hamilton 18s.)

'কনফেশন্‌স' ও চেলিনির 'মেমোয়ার্স' বুজরুকি বলে মনে হবে।" সেই মানৎ বা শপথের ফল এই বই। এ শুধু পূর্ববর্ণিত কাহিনীর পুনর্বর্ণন নয়, প্রসরণও নয়; এ তার স্বচ্ছ বিশ্লেষণ। অনুবীক্ষণের তলায় যেন রক্তের কাঁচ, এক্স-রের সামনে রোগী।

এই রকমের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সারা বইটিতে পরিব্যাপ্ত। ক্যেসলারে এটা অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে এই অভ্যাসটি সমধিক সঙ্গত ও সার্থক হয়েছে। ক্যেসলার আধুনিক য়ুরোপীয়ন মানবের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও আশানৈরাশ্যের সক্রিয় অংশীদার; তাই তাঁকে জানলে আমরা শুধু একজন লেখককে জানিনে, য়ুরোপের ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হই।

স্বচ্ছল গৃহস্থের একমাত্র সন্তান। নিঃসঙ্গ, যে নিঃসঙ্গতা সারা জীবনে ঘুচল না। পর পর তিনটি আয়া সাদিকা অত্যাচারিণী। নিঃসঙ্গতার সঙ্গে যুক্ত হলো ভীতি, বিনা অপরাধে শাস্তির ভয়। এ ভয়ও সারা জীবনে কাটল না। পটভূমিতে মা-বাপে নিরবচ্ছিন্ন বিরোধ। শিশুর আত্মমুখ না হয়ে উপায় কী? এই আত্মমুখীনতার ইন্ধন জোগায় শিশুর অসাধারণ বুদ্ধিপ্রাখর্য। মোদ্দা কথা, শৈশবে ও কৈশোরে ক্যেসলারের মাথা ভর্তি হলো নানা বিচিত্র পাণ্ডিত্যে, কিন্তু জ্ঞান রয়ে গেল আয়ত্তের অতীত। মনও রয়ে গেল অপরিণত। অপরিণত, কিন্তু অত্যন্ত স্পর্শসজাগ। আকাঙ্ক্ষা আরো উঁচু। বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে। ধরণীর এই আবরণ বিজ্ঞান অনেকটা ইতিমধ্যেই উন্মোচন করেছে। বাকিটুকুও বিজ্ঞানই করবে। ক্যেসলার বিজ্ঞানের ছাত্র হলেন। এঞ্জিনীয়রিং পাশ করে তিনি বিশ্বকর্মা হবেন, বিশ্বের সব কিছু ব্যাখ্যা করবেন টুকরো টুকরো করে, কোনো যন্ত্রের কলকব্জা সব আলাদা করে যেমন দেখানো যায়। শুধু এই মানবাধ্যুষিত পৃথিবী নয়, সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডল তিনি নখাগ্রে আনবেন। আকাশের নীলে উপলব্ধির শরক্ষেপ, এই ছিল প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু রক্তে ছিল য়ীহুদী যাযাবরী বীজ। অনিকেতনিক পরিবারটি যেমন নিরন্তর বাড়িবদল ও দেশবদল করেছে, কোথাও মূল খুঁজে পায়নি, ক্যেসলারের মনও তেমনি বারবার বিভ্রান্ত হয়েছে। নিষ্ঠাহীনতা তাঁকে শুধু এক প্রেমিকা

থেকে আরেক প্রেমিকার বাহুতে টেনে নিয়ে যায়নি, টেনে নিয়ে গেছে এক প্রেম থেকে আরেক প্রেমে (যথা, জায়নিজম থেকে কম্যুনিজম), এক ভাষা থেকে অপর ভাষায়। জুডাসের অভিশাপ তো আগেই ছিল; ফ্লাইইং ডাচম্যানও শুধু রূপকথায় তীর খুঁজে মরে না। ক্যেসলার জাতিতে একজনের উত্তরাধিকারী, চরিত্রে আরেকজনের। এ অভিশাপ আজো ঘোচেনি। 'অ্যারো ইন দি ব্লু' সেই অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী, শাপমোচনের নয়।

ঘরছাড়ার ধর্মই এই যে, ঘর নেই বলে তার যেমন হুতাশনের শেষ নেই, তেমনি ঘর পেলে ঘর না ছেড়েও তার শান্তি নেই। ক্যেসলারও তাই এই টানাপোড়েনের যন্ত্রণা সারাজীবন ভোগ করেছেন। ভিয়েনায় লেখাপড়া ছেড়ে তিনি বিভোর হলেন দেশের স্বপ্নে—প্যালেস্টাইনকে য়ীহুদী রাষ্ট্র করতে হবে। স্বপ্ন মিলিয়ে যেতে, বলা বাহুল্য, দেরী হোলো না। বুদ্ধিজীবীর পক্ষে বিজ্ঞাপন বেচা, লেমনেড বিক্রী ইত্যাদি বিলাস বরাবর ভালো লাগতে পারে না। ক্রমে ক্যেসলার তাই হলেন যা তিনি বারোখানা বই লিখেও রয়ে গেলেন: সাংবাদিক। তাঁর প্রত্যেক লেখায় খবরের কাগজের হেডলাইনের সজীবতা আছে, চিরন্তনতার পরিমাণ তার চেয়ে অনেক কম। তাই তিনি যে 'ওশনিক ফীলিং'-এর কথা বলেছেন তা চোখে লাগে, মনে ধরে না।

দেশের স্বপ্ন গেলে খোঁজ পড়ল স্বপ্নের দেশের। রাশিয়ার বিপ্লবে তখন পুরো জোয়ার, ভাঁটার পালা তখনো আসেনি। সবাই তখন সাম্যবাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখনো মস্কোর মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়নি গণবিচারের প্রহসন। ক্যেসলার ১৯৩১ খৃস্টাব্দে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন—সেটা জাগ্রত বুদ্ধির সন্দেহের সমাধি, ব্যক্তিসত্তার আত্মসমর্পণ।

নাবিকের সেই নিরাপদ বন্দরেও ক্যেসলারের বসতি স্থায়ী হোলো না। হবারই নয়। ক্যেসলারের মতো অস্থিরচিত্ত ব্যক্তির স্থায়ী ঠিকানা কখনো জিরুসালেম বা মস্কো হতে পারে না। তাঁর একমাত্র ঠিকানা য়ুটোপিয়া।

কিন্তু সে কাহিনী এ বইয়ে নেই। পার্টিতে যোগ দেয়ার সঙ্গেই বর্তমান গ্রন্থে যবনিকা পড়েছে। শেষে লেখক বলছেন: শেষ করলুম যেমন পুরানো

সীরিয়ল ছবি শেষ হোতো—নায়ক নদীর উপর দড়ি ধরে দোদুল্যমান, নীচে কুমীরের দল হাঁ করে।…সবাই জানতো যে, নায়ক কখনোই কুমীরের গহ্বরে পড়বে না,—কিন্তু, আমি তাই পড়েছিলুম।" কম্যুনিস্টদের এ বর্ণনা সঠিক নয়, কিন্তু সেটা অপ্রাসঙ্গিক। আসল কথা হচ্ছে এই যে, লেখকের মনে হয়েছে তিনি কুমীরের পেটে পড়েছিলেন।

কিন্তু মতামতের প্রশ্ন আলাদা। ক্যেসলারের অভিজ্ঞতায় অংশ গ্রহণ করা মানেই কিছু তাঁর মতের ভাগ নেয়া নয়।

২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫২

অগভীর আলাপপ্রসঙ্গে এক বন্ধু (শক্তিমান কবি ও সমালোচক) সেদিন ক্যেসলারকে 'পোলিটিক্যাল দেবদাস' আখ্যা দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এমন বর্ণনায় শ্রদ্ধার বাষ্পমাত্র নেই। সুবিচারেরও আতিশয্য আছে বলে মনে করিনে। 'দি গড ছাট ফেইল্ড'-এর আর পাঁচজন কম্যুনিজমের খাঁচায় গিয়েছিলেন চোখ মুদেভাবের আবেগে, একমাত্র ক্যেসলার ওই আদর্শবাদ বরণ করেছিলেন আপন বুদ্ধির নির্দেশে। সেই বুদ্ধিরই অনুজ্ঞায় পরে কম্যুনিজম প্রত্যাহার করেছেন। এই যাওয়া-আসায় কখনোই আমি তাঁর সহযাত্রী ছিলুম না, কিন্তু তাই বলে প্রত্যাবর্তনের জন্যে অসততার অপবাদ দেব কেন? তাছাড়া, তার সাহিত্যিক শক্তিমত্তাই বা অস্বীকার করব কেন? সর্বশেষে বলি, আমার বর্তমান রাজনীতিক পক্ষপাতিত্ব বর্তমান ক্যেসলারের বিপরীত; তবু তাকে শুধু সাংবাদিক বা প্রচারক বলে অবজ্ঞা করতে আমার বাধে, তাঁর সততার দ্বিধাদ্বন্দ্বের কুশল প্রকাশও আমি দেবদাসের পর্যায়ে এনে উপহাস করতে পারিনে। পার্বতীর প্রেমে আমরা সবাই পড়ি, আদর্শের প্রেমে পড়ে নৌকা পোড়াতে পারি ক'জন? ক্যেসলার সারা জীবন তাই করেছেন। মতভেদ সত্ত্বেও আমি তার লেখা পড়ব।

আঁদ্রে জিদ

প্রায় দু'বছর আগে বিরাশি বছর বয়সে আঁদ্রে জিদের মৃত্যু হলে ফরাসি কম্যুনিস্ট দৈনিক 'ল্যু'মানিতে' শিরোনামে ঘোষণা করেছিল: The Corpse Is Dead! মনে আছে, সদ্যোমৃতের প্রতি এই অশোভন অসম্মান প্রদর্শনে আমি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হয়েছিলেম।

আলোচ্য গ্রন্থে* দেখছি ১৯২৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারিতে জিদ্ তাঁর দিন-লিপিতে লিখেছিলেন, "এখন আমি যেন এক প্রকার মরণোত্তর জীবন যাপন করে চলেছি।"

কিন্তু কী অসীম প্রভেদ এই দুটি আপাতসদৃশ মন্তব্যে! কম্যুনিস্টদের চোখে জিদ্ বেঁচে থাকতেও মৃত ছিলেন, কেননা ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে তিনি সোভিয়েট রাশিয়া থেকে ফিরে এসে তাঁর নৈরাশ্য এবং শঙ্কা অকপটে ও নির্ভয়ে ব্যক্ত করেছিলেন। এমন লোকের মরণ হওয়া উচিত বৈকি! আর, জিদের নিজের চোখে তিনি মরে গিয়েছিলেন, কেননা তাঁর স্ত্রী ম্যাডেলিন তাঁকে ভালোবাসেননি। এমন লোকের বেঁচে থেকে লাভ কী? ভালো-বাসাহীন জীবন কি মৃত্যুরই সামিল নয়? আকাশ-পাতাল প্রভেদ এই দু'টি দৃষ্টিভঙ্গীতে। একটিতে জীবন সার্থক হয় হৃদয়ের মিলনে। অপরটিতে মৃত্যু-দণ্ড দেওয়া হয় রাজনীতিক বিচ্ছেদে।

অথচ ম্যাডোলন যে আঁদ্রে জিদের পত্নী তা পর্যন্ত কিছুদিন আগে জানবার উপায় ছিল না। তাঁর জুর্নালে বরাবর তিনি প্রকৃত নামের বদলে 'এম্যানুয়েল' নামটি ব্যবহার করে এসেছেন। এই বইয়ের প্রকাশের আগে পর্যন্ত সবাই জানতো যে আঁদ্রে জিদ বিবাহিত, যে তিনি আধুনিক ফরাসি সাহিত্যের সর্বশেষ রাজা; কিন্তু তাঁর রাণী কে তা নিয়ে কৌতূহলের অন্ত না থাকলেও নিশ্চিত জ্ঞানের অভাব ছিল।

কৌতূহলের কারণ ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জিদের রচনা যেমন এক পক্ষের অকৃপণ প্রশংসা অর্জন করেছে. তেমনি অপর পক্ষও অজস্র অপবাদ থেকে বিরত থাকেনি। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে, লেখক সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল জিদের মতো আর কোনো লেখক এত বেশি করে এতদিন ধরে মেটাননি। মোটা মোটা চারটি গ্রন্থে তাঁর প্রকাশিত দিনলিপিতে জিদের জীবন উদ্‌ঘাটিত। তার উপর আছে 'ইফ ইট ডাই···'এবং অন্যান্য আত্ম-জীবনোদ্ভূত রচনা। কিন্তু এত বলার পরেও একটা জায়গায় অন্ধকার ছিল।

* *Et Nunc Manet In Te* and *Intimate Journal*, by Andre Gide. Translated by Justin O'Brien. (Secker & Warburg 10s 6d)

সেটি তাঁর বিবাহিত জীবন। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর জুর্নালে আগাগোড়া অস্পষ্ট।

অস্পষ্টতা অজ্ঞানকৃত নয়। ওখানে আলো না ফেলবার কারণ ছিল। বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। তাছাড়া তা নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনায় তাঁর পত্নীর প্রবল আপত্তি ছিল। প্রকাশ্যে কেন, জিদের সঙ্গে পর্যন্ত এ নিয়ে আলোচনায় ম্যাডেলিনের রুচি ছিল না। এ তর্কে তিক্ততা ছাড়া আর কী ফল হয়? ম্যাডেলিন তাই আত্মনিগ্রহের মধ্য দিযে আত্মনিযোগ করলেন ধর্মে আর গৃহকর্মে। জিদের জীবন থেকে নিজেকে একেবারে লুপ্ত করে দিলেন। আত্মনিবদ্ধ জীবন সাঙ্গ হলে সেই সঙ্গে গেল ম্যাডেলিনের নিজের কথা। সে আর জানা যাবে না।

, কিন্তু জিদের কাছে এমন কোনো প্রসঙ্গ নেই যা এত ব্যক্তিগত যে তা লোক-চক্ষু থেকে গোপন কবতে হবে। তাঁব মত হচ্ছে: "আমি যা তার জন্যে আমি বরং ঘৃণিত হব, কিন্তু আমি যা নই তার জন্যে প্রশংসায় আমার প্রয়োজন নেই।" তাই তিনি ব্যবস্থা করে গিযেছিলেন যে, তাঁর লোকান্তরিতা পত্নীকে লেখা পত্র আর দিনলিপির অপ্রকাশিতপূর্ব অংশগুলি তাঁর মৃত্যুর পরে সাধারণ্যে প্রকাশ করা হবে। এই বইতে তাই আছে জিদের জবানী, তাঁর অনবদ্য স্পন্দিত গদ্যে রচিত স্বীকৃতি ও সমর্থন। এক-তরফা, তবু নিজের প্রতি অকরুণ এবং আন্তরিকতায সমুজ্জ্বল।

বিবাহটা ব্যর্থ হোলো কেন? কী ঘটেছিল? উত্তর হচ্ছে, কিছু ঘটেনি, এবং সেইজন্যেই। বিয়ের আগে যাকে দেবী বলে মনে হযেছিল বিযের পরে তাকে মানবী হিসাবে ব্যবহার করবার কথা জিদের কল্পনায় আসেনি। অপর পক্ষও আপন বুভুক্ষু কামনা ব্যক্ত করে স্মরণ কবিয়ে দেননি। অনুরোধও করেননি, অভিযোগও করেননি।

আরো একটু ঘটনা আছে। উত্তর আফ্রিকায় যখন জিদের সঙ্গে অস্কার ওয়াইল্ডের সাক্ষাৎ হয়েছিল তখন পরস্পরের বহুবিধ সাদৃশ্য উভয়ের সানন্দ বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল। রোমের মডেল মেয়েরা জানে, এটাও পুরো ব্যাখ্যা নয়।

তবে কী? উত্তর জিদের বইয়ে নেই। থাকতে পারতোও না। জিদে আর ম্যাডেলিনে যে বিচ্ছেদ তা আরো মূলগত। আকাশের উল্কাকে কে বাঁধতে পারে আঁচলে? রবীন্দ্রনাথ তাই অমিতের বিয়ের ব্যবস্থা করেই ছুটি নিয়েছেন। তার বিবাহিত জীবনের কথা লেখেননি।

কিন্তু জিদের সেখানে ক্ষান্ত হওয়ার উপায় নেই। ধর্মে তিনি প্রটেস্ট্যাণ্ট, তাই পুরুতের কাছে গিয়ে নিয়মিত স্বীকৃতির দায় ছিল না। কিন্তু শিল্পীর সমস্যা তো ঈশ্বরকে বোঝানো নয়। তার সমস্যা নিজকে বোঝা. নিজের শিল্পী বিবেককে বোঝানো। জিদ তা-ই করতে চেয়েছেন সারা জীবন ধরে। আমাদের আনন্দের কারণ এই যে তা থেকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য জন্মলাভ করেছে। তবু—

রহস্য যদি রহস্যই রয়ে গেল, তবে জিদ কেন লিখতে গেলেন এ বই? না লিখে উপায় ছিল না বলে। আত্মরোমন্থন জিদের মজ্জাগত অভ্যাস। অনুক্ষণ এই আত্মানুচিন্তন, প্রকাশ্যে চিত্তপ্রক্ষালন, তাঁর সততার পরিচায়ক। আত্মজিজ্ঞাসাও অপ্রশংসনীয় কর্ম নয়। কিন্তু এর আতিশয্যে কল্পনা পাখা মেলতে পায় না। টাইমস্ লিটারেরি সাপ্লিমেণ্ট তো ইতিমধ্যেই (২৯-৮-৫২) বলেছেন, "এখনই কি প্রায় স্থিরভাবে ভবিষ্যতের রায় অনুমান করা চলে না যে, জিদের সারা জীবনের প্রভূত রচনাবলীর মধ্যে অল্পই বাঁচবে? যে তাঁর লেখার অধিকাংশই ভবিষ্যতে স্তূপীকৃত সাক্ষ্য হিসাবে রক্ষিত হবে—যাতে কৌতূহলী কেউ কখনো এসে শুধু এইটুকু আবিষ্কার করবে যে জিদ—জিদ ছিলেন?"

আমি আমিই, এটাকে আমি একেবারে তিরস্কার বলে মনে করিনে কিন্তু।

১০ জানুয়ারী, ১৯৫৩

পল গোগ্যাঁ

গোড়াতেই দুটি একান্ত নেতিবাচক উক্তির উল্লেখ করতে হবে। বইটিতে* পল গোগ্যাঁ বার বার বলেছেন, এটা বই নয়। "দিস ইজ নট এ বুক",

* *The Intimate Journals of Paul Gaugin*, translated by Van Wyck Brooks. (Heinemann, London, 15s).

এই পাঁচটি কথা যে কত পাতায় কতবার লেখা আছে তার শেষ নেই। একমত হতে বাধা নেই। এটা সত্যি বই নয়। অবনীন্দ্রনাথের ছবি-লেখা নয়, লেওনার্দো দা ভিঞ্চির জ্ঞানগর্ভ আলোচনা নয়। এ হচ্ছে লেখকের রাজ্যে চিত্র-শিল্পীর পথ ভুলে প্রবেশ। তবু অনধিকারের প্রশ্ন অবান্তর, কেননা লিখতে অন্তত—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—লাইসেন্স, ডিপ্লোমা বা পারমিট দরকার হয় না। বরং কয়েকজন লেখক যেমন,—যথা রবীন্দ্রনাথ,—মাঝে মাঝে কলম সরিয়ে রেখে তুলি ধরে পরোক্ষ ইঙ্গিত করেন যে, এমন কয়েকটা কথা আছে যা কথায় বলবার নয়, তেমনি কোনো চিত্রকর যখন তুলি ছেড়ে কলম ধরেন, তখন আমি এই কথা ভেবে খুশি হই যে, তাহলে এমনও কিছু আছে যা তুলির বলা অসাধ্য।

ভূমিকায় পল গোগাঁর ছেলে বলেছেন, "গোগাঁকে ঘিরে একটা অদ্ভুত রূপকথা গড়ে উঠেছে। যাঁরা আমার বাবার চিত্রপ্রতিভা সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ তাঁরাও তাঁর জীবন নিয়ে ওই রূপকথায় কৌতূহলী ও বিশ্বাসী।··· এক যে ছিল শেয়ার-দালাল। মধ্যবয়সী মধ্যবিত্ত, একান্ত সাধারণ। তাঁর স্ত্রী ছিল, আর ছিল তিনটি সন্তান। তাঁর বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের কেউ কখনো সন্দেহও করেনি যে, তিনি সমৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ছাড়া আর কিছু হতে অভিলাষী। তারপর একদিন হঠাৎ প্রায় স্বপ্নবৎ তিনি তাঁর সবকিছু বদলে ফেললেন। যে ঘুমিয়েছিল সে সাধারণ ভদ্দরলোক—যে জেগে উঠল সে একটি দানব। দানব বলল, কা তব কান্তা—ইত্যাদি। ভদ্রতা চুলোয় গেল, সম্ভ্রান্ত হবার বাসনার হোলো বিসর্জন। ছবি আঁকা ছাড়া তাঁর আর কোনো কামনা রইল না জীবনে। ব্যস্, তিনি প্যারিসে পালিয়ে গেলেন, পরিবারের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেন, ছবি আঁকতে লাগলেন, পরে সভ্যতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাহিতি গিয়ে বর্বরের জীবনযাত্রা বরণ করে নিয়ে সুখে দুঃখে আঁকলেন, বাঁচলেন ও মরলেন···চমৎকার গল্প। প্রতিবাদ করতে মায়া হয়। কিন্তু হায়, গল্পটা সত্য নয়।"

সমরসেট ম'মের বহুপঠিত ও অত্যন্ত উপাদেয় উপন্যাস 'দি মুন অ্যাণ্ড সিক্স পেন্স' যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের পক্ষে কাহিনীটা সনাক্ত করা শক্ত

হবে না। ওখানে গোগাঁর নাম ছিল না, কিন্তু পরে 'দি রেজর'স এজ' বইতে ম'ম স্পষ্টই বলেছেন যে, চার্লস স্ট্রিকল্যাণ্ড পল গোগাঁ ছাড়া আর কেউ নয়। দ্বিতীয় বইটিতে এই স্বীকৃতিও আছে যে, গোগাঁ সম্বন্ধে তিনি অল্পই জানতেন, যে তাঁর উপন্যাসের নানা উপকাহিনী একেবারেই উদ্ভাবিত। এক্ষেত্রে তাঁর পিতা সম্বন্ধে এমিল গোগাঁর সাক্ষ্যই গ্রাহ্য হওয়া উচিত। কিন্তু তবু, ম'মের জীবনী-উপন্যাসের যতটাই কল্পিত হোক, গোগাঁর নিজের অন্তরঙ্গ দিনপঞ্জীতে যেন এমিলের জবানীর চেয়ে ম'মের গল্পেরই সমর্থন বেশি।

গোগাঁর নিজের কথা আরো বিশদভাবে জানতে পারলে ভালো হোতো। কিন্তু তাঁর ছবিতে যা ছড়ানো আছে, তা থেকে তাঁর জীবন সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ একটা বর্ণনা উদ্ধার করা অসম্ভব। আর আলোচ্য বইতে (যা বই নয়) যা আছে, তা এত এলোমেলো, মাঝে মাঝে এত অসংলগ্ন, যে তা থেকেও শিল্পীর জীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অসম্ভব। যখন যা মনে এসেছে লিখে গেছেন—অবাধে, নির্ভয়ে, অলজ্জ অনাবরণে। কখনো কোনো শিল্পী সম্বন্ধে, কখনো কোনো ঘটনা সম্বন্ধে। বইয়ের শেষে (!) ভূমিকায় গোগাঁ লিখেছেন, "এমন একটি বই লেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না যা শিল্পসৃষ্টি বলে পরিগণিত হবে (চেষ্টা করলেও পারতুম না)।···কিন্তু আমি সভ্য ও বর্বর জগতের এত দেখেছি ও শুনেছি যে, সেকথা লেখার অধিকার আমার আছে। সমালোচকদের সাধ্য কী আমাকে নিরস্ত করে!"

বইতে যা আছে তা অনাদরণীয় নয়। আছে শিল্প, জীবন ও সভ্যতা সম্বন্ধে একজন মহান্ শিল্পীর মতামত। প্রকাশ নিখুঁত না হলেও অকপট। মতগুলি বিবেচনাপ্রসূত না হলেও অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। কৌতূহলোদ্দীপক তো নিশ্চয়ই।

সবচেয়ে অবাক লাগে এই কথা ভেবে যে, হঠাৎ গোগাঁ কী করে নিজেকে তাঁর পরিচিত পরিবেশ থেকে এমন পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারলেন, কী করে পারলেন প্রচলিত সামাজিকতা থেকে এমন করে মুখ ফিরিয়ে

নিতে। বোর্স থেকে বোহীমিয়ার দুস্তর দূরত্ব তিনি কেমন সহজে অতিক্রম করলেন।

একবার বেড়া পেরুলেই সব কিছু বদলে গেল। যা ছিল একঘেয়ে ধূসর, তা কত রকমারি রঙ ধরল। সে রঙে কত ছবি স্নান করল যা দেখে কত রসপিপাসুর তৃষ্ণা মিটল! কালো রঙের বাটিটা শুধু বাকি রইল পিছনে-ফেলে-আসা 'সভ্য' সমাজের জন্যে। কালো কালিতে লেখা এই বইয়ের সেইটেই প্রধান ত্রুটি, তথা প্রধান আকর্ষণ। প্রতিবেশী বিশপকে চটাবার জন্তে গোগাঁ তাঁর বাড়ির নাম দিলেন 'দি হাউস অব কার্নাল প্লেজার'। পারিবারিক দায়িত্বের কথা কেউ স্মরণ করিয়ে দিলে গোগাঁ বলতেন, অনভিনীত ঔদাসীন্তের সঙ্গে, 'পরিবার চুলোয় যাক'। ক্রিস্টিয়ানিটির নাম শুনলে রাগে জ্বলে উঠতেন। ক্যাথলিক পরে পেগান হলে যা হয়। সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও গোগাঁর তাঁর আর্টের প্রতি নিষ্ঠা কখনো শিথিল হয়নি। বার বার বলছেন, শিল্পসৃষ্টি আকস্মিক নয়। তার জন্তে সাধনা চাই, মুক্তি চাই।

মুক্তি মানে সমাজবন্ধন থেকে অব্যাহতি। সমাজ তা সহজে দেয় না, দিলে সমাজই থাকত না। তবু যে সেই মুক্তি কেড়ে নেয় তাকে তার জন্তে মূল্য দিতে হয়। এজন্তে বিলাপ করাও মিছে। সমাজ থেকে মুক্ত না হলে গোগাঁ যেমন অন্ত ব্যক্তি হতেন, তেমনি সমাজ তাঁকে সহজে মুক্তি দিলেও গোগাঁকে আমরা যেমন পেয়েছি, তেমন পেতুম না।

পিটিরিম সরোকিন

ব্যক্তিবিশেষের চরিতামৃত বা যুদ্ধবিশেষের জয়কীর্তন, এই ছিল আদি ইতিহাস। মধ্যযুগে ঐতিহাসিক হলেন ঈশ্বরের প্রচার-সচিব। রেনেসাঁসের পরে ইতিহাস অতীতের আলোচনা করল বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে। শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের রঙীন আশাও অতীতের ছবিতে প্রতিফলিত হলো।

এদিকে স্তূপীকৃত ইতিহাস-গ্রন্থে রাশীকৃত ঘটনাতরঙ্গ পরস্পরকে আঘাত করে ফেনোদ্গীরণ করল, গর্জন করল। বেশির ভাগ ঐতিহাসিক (যথা অ্যাক্টন ও ফিশার) মুগ্ধ হয়ে তীরে বসে সমুদ্রের অপার ব্যাকুলতা, সুগম্ভীর মৌন আর সমুচ্ছল কলকথা শুনলেন। তার বেশি জানতে চাইলেন না। জনকয় উদ্ধত উৎসুক কিন্তু এতে তুষ্ট না থেকে ইতিহাস মন্থন করতে চাইলেন ঘটনাসমুদ্রের গর্ভ থেকে অর্থামৃত আবিষ্কার করবার মানসে। তাঁরা ইতিহাসকে বিবরণ-সর্বস্ব আত্মতৃপ্তি ত্যাগ করে আত্মজিজ্ঞাসু হতে উদ্বুদ্ধ করলেন। ইতিহাসের কাছ থেকে তাঁরা ব্যাখ্যা দাবী করে বললেন: কেন এমন হয়েছে এবং অমন হয়নি? ঘটনাপারম্পর্যে কার্যকারণ কোথায়? ইতিহাসের বিবর্তনের সূত্রটি কী? কোন চাঁদের টানে ইতিহাসের ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলেছে? আর ব[illegible] বা চলেছে কোন নিয়মে?

ইতিহাসের মধ্যে এই নিয়মের আবিষ্কার কে প্রথম করতে চেয়েছিলেন বলা শক্ত। 'ইতিবৃত্ত' কথাটার মধ্যে কি লুকিয়ে আছে এই বিশ্বাস যে ইতিহাস বৃত্তগ[illegible]? 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুখানি চ সুখানি চ,' এই উক্তিতেও অনুরূপ ধারণার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু আমাদের ইতিহাস য়ুরোপের তুলনায় 'একান্ত অস্পষ্ট। ওখানে হাজার দুয়েক বছর আগে এ-বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে ইতিহাস হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিবিম্ব, মানব-জীবনের প্রতিচ্ছবি। ঋতুমালায় যেমন গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত নির্ধারিত নিয়মে ঘুরে ঘুরে আসে, ব্যক্তিজীবন যেমন শৈশব-কৈশোর-যৌবন-জরা পেরিয়ে মৃত্যুতে পরিণতি লাভ করে, তেমনি তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে সভ্যতার গতিও এই নিয়মের দাস। নিয়ম যখন নিয়তির মূর্তি ধরে মানুষের পুরুষকারের আত্মসমর্পণ দাবী করল, তখন এলো খৃস্টিয়ানিটি তার আশাবাদিতা নিয়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তি ও উনবিংশ শতাব্দীর যন্ত্রপ্রাপ্তিতে এই বৃত্তনিয়তির দাসত্বে বিশ্বাস আরো শিথিল হোলো।

কিন্তু কারো কারো মনে সন্দেহ রয়েই গেল যে প্রগতির অগ্রগতি অবধারিত নয়, মানুষ যেমন এগুতে জানে তেমনি পিছিয়েও পড়ে। এই নৈরাশ্যবাদীরা তাই ইতিহাসের গতির সরল রেখার সারল্যে সন্দিহান হয়ে

অন্যতর নক্সার সন্ধান করলেন। ১৭২৫ খৃস্টাব্দে নেপলসের জিওভানি ভিকো চেষ্টা করলেন ইতিহাসের বিচারে বেকন্-দর্শিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে। এক শ বছর পরে তাঁর ফরাসি শিষ্য জুল্ মিশলে (১৭৯৮—১৮৭৪) সেই প্রেরণায় লিখলেন: "পৃথিবী সৃষ্টির সঙ্গে একটি সংগ্রামের শুরু হয়েছিল এবং সে সংগ্রামের শেষ হবে শুধু বিশ্বাবসানের সঙ্গে। এ সংগ্রাম হচ্ছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের, বস্তুর বিরুদ্ধে আত্মার, নিয়তির বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণের। ইতিহাস এই অনন্ত সংগ্রামের কাহিনী বৈ আর কিছু নয়।" উদ্যম এবার নিয়তির স্থান অধিকার করল।

এই প্রচেষ্টার ফল যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি, তাদের প্রকৃতি কিরূপ, গতি সর্পিল না সরল, আয়ু কতটুকু? অধুনা এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন নিকোলাই ডানিলেভস্কি (১৮২২—১৮৮৫), অসভাল্ড স্পেংলার (১৮৮০—১৯৩৬), আর্নল্ড টয়নবি (১৮৮৯—), ভাল্টার শুবার্ট, এল এস সি নরথ্রপ (১৮৯৩—), আলফ্রেড ক্রোবার (১৮৭৬—), অ্যালবার্ট শোয়াইৎসার (১৮৭৫—), এবং নিকোলাই বের্ডায়েভ্ (১৮৭৪—১৯৪৮) প্রমুখ পণ্ডিতগণ। এঁদেরই সঙ্গে, যদিও বোধ হয় কয়েক ধাপ নীচে, নাম করতে হয় পিটিরিম সরোকিনের এবং তিনিই আলোচ্য গ্রন্থে * ভার নিয়েছেন পূর্ববর্তীদের ঐতিহাসিক দর্শনের বিশ্লেষণ ও বিচার করে তাঁর নিজের মতের সঙ্গে সাদৃশ্য ও পার্থক্য প্রকাশ করবার। বিষয়টি প্রত্যক্ষতই বিশেষ দুরূহ, রুশ লেখকের ইংরেজিও ঠিক প্রাঞ্জল নয়, কিন্তু তবু বইটি সার্থক হযেছে লেখকের চিন্তার স্পষ্টতার গুণে। এতগুলি মতের স্থূল বৈশিষ্ট্যগুলির এই তালিকাকরণ ও বিশ্লেষণ অন্তত তাঁদের কাজে আসবে যাঁদের, আমার মতো, মূল বইগুলির প্রত্যেকটি পড়বার সময় বা সামর্থ্য নেই।

উপরের নবরত্নের ঐতিহাসিক দর্শনের মিলিত, বিভিন্ন ও বিপরীত মতগুলির মধ্যে দু'টি ঐক্য লক্ষণীয়। এক, তাঁরা সবাই একমত যে ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক সীমাবদ্ধ দেশবিশেষের ইতিহাস (যা আমরা পড়ি) ইতিহাসই

* *Social Philosophies of an Age of Crisis* by Pitirim A. Sorokin, (A & C. Black, London, 20s.)

নয়; ইতিহাস হবে সংহত কোনো সভ্যতা বা সংস্কৃতির, (যদিও এদুটি বস্তুর সংজ্ঞা ও সংখ্যা নিয়ে এঁদেরই মধ্যে মতভেদ বর্তমান)। দুই, ইতিহাসের যাত্রায় অবশ্যম্ভাবী প্রগতিপ্রবণতায় এঁদের কারোই অবিচল আস্থা নেই। সত্য বলতে কি, এঁরা সবাই কমবেশি নৈরাশ্যবাদী। কেউ কেউ সভ্যতার নিশ্চিত মৃত্যুতে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু সবাই শঙ্কিত যে গত পাঁচ-ছয় শতাব্দী ধরে যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা নিরঙ্কুশভাবে বিশ্বনিয়ন্ত্রণ করে এসেছে তার অবসান আসন্ন। সে সভ্যতার গোধূলিতে এই পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি আশার দিবালোক সহ্য করতে পারছে না। এখন সে হয় ফিরে যেতে চাইছে অন্ধকার মাতৃজঠরের নিরাপত্তায় (যেমন বাটারফিল্ড বা ওকশট), কিংবা প্রায় অসহায় হয়ে তাকিয়ে আছে নতুন এক অবতারের আবির্ভাবের আশায়, (যেমন টয়নবি)। এই নৈরাশ্যের উৎস সেই স্থির বিশ্বাস যে সভ্যতা অনির্বাণ প্রদীপ নয়, যে সংস্কৃতির যেমন মধ্যাহ্ন আছে তেমনি সন্ধ্যা ও রাত্রিও আছে। অর্থাৎ ইতিহাস সরল রেখা নয়, বৃত্ত।

এমত কতটুকু সত্য? এ প্রশ্নের উত্তর অসম্ভব। তবে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মানুষের আশা ও বিশ্বাস যখন শীতের পাতার মতো ঝরে যায় তখন সে বর্তমান দৈন্যের নজির খোঁজে অতীতের ইতিহাসে; তখন সে মানতে চায় যে তার আজকের জরা গতকালের ভ্রান্তি বা অমিতাচারের পরিণাম নয়, জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই ঐতিহাসিক দর্শন অতীতকে সত্যনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করুক আর না-ই করুক, এর প্রধান মূল্য এই যে বর্তমান মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য এতে স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত। সরোকিন সাধারণের নির্বোধ আশালুতায় বাদ সেধে ভালো বৈ মন্দ করেননি।

২৯ নভেম্বর, ১৯৫২

হ্যারল্ড ল্যাস্কি

কলম যে তলোয়ারের চেয়ে শক্তিধর, এ কথাটা কলম দিয়েই লেখা। তাই, পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু কলম যে নানা মনে স্থায়ী আঁচড় কাটতে

পারে সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যে কলম রাজনীতির প্রচারে নিয়োজিত হয়, তার প্রভাব আরো দ্রুত এবং ব্যাপক, তাই রাজনীতির যুদ্ধে লেখনী অস্ত্র যে কোনো অস্ত্রের সঙ্গে তুলনীয়। গত পঞ্চাশ বছরে যে ক'জন ব্যক্তি চিন্তাজগতে একটা নতুন আবহাওয়া আমদানী করেছেন হ্যারল্ড ল্যাস্কি নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মনোবিজ্ঞানে যেমন ফ্রয়েড, অর্থনীতিতে কীন্‌স্‌, কাব্যে টি এস এলিয়ট, তেমনি রাজনীতিতে (যদিও পূর্বোক্তদের প্রতিভা তাঁর ছিল না) হ্যারল্ড ল্যাস্কি অনেকগুলি মনের অনেকগুলি জানালা খুলে দিয়েছিলেন। সে হাওয়ায় যত সহস্র তরুণ মনে একদা ঝড় উঠেছিল তার মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যাও অল্প ছিল না। একটি অধ্যাপকের জীবনে এইটেই কম পুরস্কার নয়।

তাঁর জীবনীকার কিংসলি মার্টিন* দেখিয়েছেন, ল্যাস্কি নিজে শুধু শিক্ষকের পুরস্কার নিয়ে তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর আদর্শবাদ এমন গভীর ছিল যে ছাত্রমনের নরম মাটিতে সাম্যবাদের বীজ বপন করেই তিনি কখনো ক্ষান্ত হতে পারেন নি, দলীয় রাজনীতির পতিত জমি আবাদ করেও তিনি সোস্যালিজমের সোনা ফলাতে চেয়েছিলেন। প্রেরণা মহতী সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রয়াসের এই বিক্ষেপের জন্যে উভয় ক্ষেত্রেই তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে। রাজনীতি-বিদ্যায় তিনি তেমন কোনো মৌলিক অমর গ্রন্থ লিখে যাননি, যদিও অমন বই লেখার মতো ক্ষমতার তাঁর অভাব ছিল না। রাজনীতিকর্মে তিনি একাধিকবার অপ্রীতিকর বিসম্বাদের লক্ষ্য হয়ে দলীয় বন্ধুদেরও বিড়ম্বনার কারণ হয়েছেন। অধ্যাপকদের সভায় তিনি মাঝে মাঝে তাঁর যোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হতেন, কেননা, তিনি গুরুগিরির নিয়ম মতো বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ হারাতে প্রস্তুত ছিলেন না। অন্য দিকে, পলিটিশানদের সভায় অনেকেই তাঁকে কিঞ্চিৎ সন্দেহের চোখে দেখতেন: ল্যাস্কি বড়ো বেশি বুদ্ধিমান! "হি থিংক্‌স্‌ টু মাচ্‌, অ্যাণ্ড সাচ্‌ মেন্‌ আর্‌ ডেঞ্জেরাস্‌।"

ল্যাস্কি একই সঙ্গে যে দুটো ক্ষেত্রে কাজ করতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্যে সাফল্যের চেয়ে বেশি বিফলতা অর্জন করেছিলেন—এই অবস্থাটার

* *Harold Laski*, A Biographical Memoir, by Kingsley Martin. (Gollancz 21s)

মধ্যে আমাদের বর্তমান সমাজের বৃহৎ একটা সমস্যা নিহিত আছে। কর্মে আর চিন্তায়, থিয়োরি আর প্র্যাকটিসে, ক্রমশ যে বর্ধমান দূরত্ব রচিত হচ্ছে, ল্যাস্কি সেই ব্যবধান ঘোচাতে চেয়েছিলেন, দুয়ের মধ্যে সেতুবন্ধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, সফল হননি। অথচ গণতন্ত্র যতদিন না এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে ততদিন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্লেটোর যুক্তি খণ্ডন করা সম্ভব হবে না। প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, রাজনীতিতে জনপ্রতিনিধিত্বের নীতি ক্ষুণ্ণ না করেও কী করে ভাবুকের সঙ্গে রাজনীতিক কর্মীর মিলন ঘটানো সম্ভব। শুভবুদ্ধিশূন্য রাজনীতিক কর্মের পরিণাম ইতিহাসে রক্ত দিয়ে লেখা আছে। কর্মপঙ্গু বন্ধ্যা চিন্তার করুণ কাহিনীও লেখা আছে চোখের জলে। গণতন্ত্র যদি এ দুয়ের সমন্বয় সাধন করতে অসমর্থ হয়, তাহলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়।

ল্যাস্কির নিজের জীবনের দ্বিমুখীনতার ব্যাখ্যা কিংসলি মার্টিন সন্ধান করেছেন ল্যাস্কির পরিবেশে। গৃহহীন ছিন্নমূল য়ীহুদী পরিবারে স্বাচ্ছল্য থাকতে পারে, কিন্তু জন্মগত যে চিত্তস্থিরতা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের রক্তে বর্তমান, য়ীহুদী তা থেকে বঞ্চিত। য়ীহুদীর একমাত্র ঠিকানা তাই য়ুটোপিয়ায়, কল্পলোকে। মর্ত্যের সঙ্গে স্বভাবতই তার সাদৃশ্য অল্প। ইজরেলের সঙ্গেও য়ুটোপিয়ার মিল খুব বেশি নয়।

এমন অবস্থায় ল্যাস্কি নিরাশাবাদী হয়ে পড়লে বিস্ময়ের কারণ ছিল না। অন্যান্য অনেক য়ীহুদীর তাই হয়েছে। কিন্তু ল্যাস্কির পক্ষে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে তিনি কখনো আশা হারাননি। এই আশা তাঁকে মাঝে মাঝে পাতি-কম্যুনিস্ট থেকে অভিন্ন করেছে, আবার গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থাও অবিচল রেখেছে। ফলে তিনি দু'পক্ষেরই অভিশাপ কুড়িয়েছেন। চার্চিল-বীভারব্রুক তাঁকে নানা অপপ্রচার থেকে নিষ্কৃতি দেননি, আবার কম্যুনিস্টরাও তাঁকে বর্ণচোরা লিবারেল বলে উপহাস করেছেন।

আসলে কম্যুনিস্টদের রায়টা বোধহয় একেবারে অসঙ্গত নয়। নানা চরিত্রগত সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও—যেমন খ্যাতসান্নিধ্যে ছেলেমানুষী গর্ব বা অন্যের

কথা একটু বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলবার দুর্বলতা—মানুষ হিসাবে ল্যাস্কি যে অত্যন্ত দয়ালু ও সহৃদয় ছিলেন তা শুধু তাঁর জীবনীকারই বলেননি, তাঁর অগণিত ছাত্রছাত্রী দেশ-বিদেশে সেই সাক্ষ্যই দেবে। 'অধ্যাপকের পক্ষে ছাত্রের প্রশংসাপত্রের চেয়ে আর কোন সুপারিশ বেশি মূল্যবান? সহস্র ইংরেজ মধ্যবিত্তের মনে সমাজচেতনা আর সহস্র ঔপনিবেশিক ছাত্রের মনে স্বাধীনতাপিপাসা জাগানো কি একটি জীবনের পক্ষে তুচ্ছ সাফল্য?

আর রাজনীতি? অ্যাট্‌লি ল্যাস্কিকে একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, অধ্যাপকের পরামর্শে তাঁর প্রয়োজন নেই। তবু ল্যাস্কি লেবার গভর্নমেন্টকে বারবার সাবধান করেছেন যখনি সে দল সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে। শুধু অ্যাট্‌লি নয়, চার্চিল-বল্ড্‌ইন, এমন কি রুজভেল্টকে পর্যন্ত তিনি নিয়মিত পত্র লিখে উপদেশ বিতরণ করতেন। সে উপদেশ সর্বদা গৃহীত হয়নি—কলম তলোয়ারের চেয়ে শক্তিশালী নয়—কিন্তু ল্যাস্কির অজস্র রচনা ও বক্তৃতা যে অলক্ষ্যে লক্ষ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তার প্রমাণ সবটা প্রত্যক্ষ না হলেও পরিমাণে অল্প নয়। সেই ব্যাপক ও গভীর প্রভাবের একটি ত্রুটি বাস্তববিমুখতা, যার ফল কোনো কোনো সময় সফেন উচ্ছ্বাস। সেই প্রভাবের প্রধান গুণ আশাবাদী নিষ্ঠা, যা বাদ দিলে রাজনীতি কূটনীতির পর্যায়ে নেমে আসে।

৭ মার্চ, ১৯৫৩

নাট্যসমালোচনা

বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যের অন্তত একটি শাখার দৈন্যের জন্যে আমাদের ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। সেটি নাট্য সমালোচনা। গ্রীনল্যাণ্ডের কবিরা সাপ নিয়ে কাব্য রচনা না করলে যদি দোষী সাব্যস্ত না হন, সাহারার গীতিকাররা আমাদের মতো বর্ষা সঙ্গীতে পারদর্শী না হলে যদি দণ্ডিত না হন, তাহলে সেই একই কারণে নাট্যবিভাগে বাঙালী সমালোচকের নিষ্ক্রিয়তা নিশ্চয়ই ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু ইংরেজিতে শুধু প্রভূত ঐশ্বর্যশালী

নাট্যসাহিত্যই নেই ; তাকে ঘিরে বৃহৎ একটি নাট্যালোচনা-সাহিত্যও গড়ে উঠেছে। এই আলোচনার অভ্যাস এত বিস্তৃত ও তার স্থান এত গুরুত্বপূর্ণ বলেই এ নিয়েও আলোচনার অন্ত নেই। অভিনেতা অভিযোগ করেন, অভিনেত্রী অভিমান করেন, প্রযোজক শিরে কর হানেন—আলোচক নির্বিকার। তাঁর নির্দয় নিরপেক্ষ কর্তব্য তিনি সম্পাদন করে চলেন, কেউ দিনের পর দিন, কেউ সপ্তাহের পর সপ্তাহ। সব মিলিয়ে সাংস্কৃতিক মণ্ডলে মস্তোন্মাদনা সদা-সজাগ।

থাক, কিন্তু তাই নিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী দূরে বাগবিস্তার কেন? প্রশ্নটা স্বাভাবিক, কিন্তু আমার অছিলা আছে। নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েও যে ন'জন লেখক-সমালোচক আলোচ্য বইয়ের* আলোচনায় যোগ দিয়েছেন, তাঁরা প্রধানত নাটক ও নাট্যসমালোচনা সম্বন্ধে লিখলেও প্রসঙ্গত এমন অনেক প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, যা ব্যাপকভাবে সমগ্র আলোচনা সাহিত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য। তাদের বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলিও কলাক্রিয়ার অন্যান্য শাখার সমালোচনার প্রতি বহুলাংশে প্রযোজ্য। তাঁদের মিল ও অমিলে মিলিয়ে আলোচকের ভূমিকার নির্দিষ্ট সংজ্ঞার আভাস মেলে।

আলোচনার সূচনা করেছেন নাট্যকবি খৃস্টফার ফ্রাই। তিনি আলোচক নন, তিনি আলোচনার লক্ষ্য। কিন্তু আশ্রমমৃগ সেজে তিনি 'ন হন্তব্য, নহন্তব্য' অনুরোধের অন্তরালে একবারও আশ্রয় ভিক্ষা করেননি। তিনি শুধু বলছেন, আলোচকরা যেমন একমত নন, তেমনি অভ্রান্তমতও নন। তাঁদের কাছ থেকে নাট্যকারের প্রধান কাম্য হচ্ছে এই যে, তাঁরা শুধু শেখাতে চাইবেন না, শিখতেও প্রস্তুত থাকবেন ; যে তাঁরা তাঁদের বিচারপ্রবণতা প্রখর করবার জন্যে বিস্ময়বোধের পূর্ণ সংহার করবেন না ; যে তাঁরা লেখকের বক্তব্য আপন বিশ্বাসের প্রভাবে সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে এইটে বিচার করবেন যে, লেখক যা বলতে প্রয়াসী তা তিনি কীভাবে বলতে সমর্থ হয়েছেন। সর্বোপরি, আলোচকের সকাশে অনুরোধ যে তিনি সৃজনী সমালোচনা করবেন।

* *An Experience of Critics*, edited by Kaye Webb (Perpetua Ltd., London, 7s 6d.)

ধারাবাহিকভাবে এগুলির উত্তর দেয়া সম্ভব। আমি বলব, আলোচক শিখতে প্রস্তুত, যে বিস্ময় ও বিচার কিয়দংশে পরস্পরবিরোধী এবং বাকীটুকুতে সমন্বয় আদৌ দুর্লভ নয়, যে লেখকের বক্তব্য সম্বন্ধে বিচার না করে শুধু তার প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করা মানে প্রতিমা উপেক্ষা করে শুধুমাত্র চালচিত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা, যে সৃজনী সমালোচনা দাবী করার অর্থ আলোচকের আলোচ্যস্বাধীন সত্তার স্বাগত স্বীকৃতি। অর্থাৎ আলোচক স্বয়ং স্রষ্টা ও শিল্পী। অর্থাৎ তাজমহল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি বেঁচে রইবে, তেমনি ওই কবিতাটি বিলুপ্ত হলেও তার সার্থক কোনো ভাষ্য আপন মহিমায় বিরাজ করতে পারবে। উপমা মল্লিনাথস্য।

কিন্তু এ উক্তি রঞ্জনস্য। যে আটজন নাট্যসমালোচকের কাছে ক্রাই তাঁর বক্তব্য নিবেদন করেছিলেন, তাঁদের অন্তত সাতজন প্রত্যাশিত প্রিয় ভাষণে কর্তব্য সমাধা করেছেন। অবজার্ভার' পত্রিকার আইভর ব্রাউন অনসুরাম্ভ পরিহাসে বলেছেন, "I am asked for my Approach to Dramatic Criticism. It is, I must confess, through the Stalls Entrance."

পরিহাসান্তে বলেছেন যে, নাট্যালোচকের নাট্যোৎসাহী হওয়া চাই এবং সমালোচনা সৌজন্যশূন্য হওয়া উচিত নয়। প্রবীণ ডার্লিংটন ('ডেলি টেলিগ্রাফ') বলছেন, সমালোচনা যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্ত নয়, সে শুধু ভালো-লাগা না-লাগার প্রিয়পাঠ্য প্রকাশ। 'ন্যুজ ক্রনিকল' পত্রিকার অ্যালান ডেন্ট ইংরেজি নাট্যালোচনার বিবর্তন আলোচনা করে বলেছেন (আমি সিরিল কনলির পরিভাষায় বলছি) : লে হান্ট থেকে জেমস এগেট পর্যন্ত যে 'ম্যাণ্ডারিন'* আলোচনার প্রচলন ছিল, তার অবসান হয়েছে এবং শুরু হয়েছে 'ভার্নাকুলার' লেখা। এতে আক্ষেপের কিছু নেই। ডেন্ট আলোচকদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : সারবান সুভাষী, নিঃসার সুভাষী ও নিঃসার কুভাষী। হ্যারল্ড হবসন ('সাণ্ডে টাইমস') সমালোচককে ঐতিহাসিক হতে বলেছেন,

* 'ম্যাণ্ডারিন' ও 'ভার্নাকুলার' কথা দুটির বিশদ ব্যাখ্যার জন্য Cyril Connollyর *Enemies of Promise* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তাঁর কাজ ভবিষ্যতের পাঠকের জন্যে বর্তমানের নাট্যাভিজ্ঞতার স্থায়ী রূপ দান করা। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' কাগজের ফিলিপ হোপ-ওয়ালেস ফ্রাইর প্রশ্নের উত্তরে সবিনয়ে বলেছেন, "We will try, Mr. Fry." ষষ্ঠ সমালোচক এরিক ক্যেষন ('পাঞ্চ') বলছেন, সমালোচনা বিজ্ঞান নয়। ব্রাউনের সহকারী ট্র্যু ইনও উৎসাহ ইত্যাদি গুণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন।

খৃস্টফার ফ্রাইর উদ্ধৃত অনুরোধের অকরুণ প্রতিবাদ করেছেন 'নিউ স্টেটসম্যান অ্যাণ্ড নেশন' কাগজের কাথবার্ট ওয়র্সলে। মঞ্চের যবনিকা, তাঁর কাছে লৌহ যবনিকা, সমালোচক আর শিল্পীর বা পরিবেশকের সম্বন্ধ তাঁর মতে বন্ধুত্বমুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দুয়ে সহযোগিতা অনাবশ্যক ও অনভিপ্রেত। নাট্যকার বা অভিনেতা কেঁদে বলবে, 'আমাকে ভালোবাসো, আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো।' কর্তব্যপরায়ণ নির্মমতার সঙ্গে আলোচককে বলতে হবে, 'তোমার কাজ ভালোবাসানো, তোমার কাজ নিজেকে বোঝানো। কান্না মিছে।' এই মতে সমালোচকের দায়িত্ব তার পাঠকের প্রতি অভিনেতৃকুল শিশুর মতো প্রশংসা চাইবে, কিন্তু সমালোচকের কাজ প্রশ্রয় দিতে অস্বীকার করা। বইটির পরিশিষ্টে দেখলুম ওয়র্সলে ইস্কুল মাস্টার ছিলেন। অবাক হইনি।

উপাদেয় ও পুষ্টিকর আলোচনা। সঙ্গে আছে রনাল্ড স্থার্লের উপভোগ্য কার্টুন। সবশেষ পৃষ্ঠায় আলোচকের মস্তিষ্কে কী কী গুণের উপস্থিতি প্রয়োজন তার একটি নক্সা আছে। এ অঞ্চলের সমালোচকদের ওটা না দেখাই ভালো। সবাই একসঙ্গে আত্মহত্যা করলে সম্পাদকরা কাগজ ভর্তি করবেন কী দিয়ে?

টি এস এলিয়ট

প্রথম মহাযুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। ১৯১৭ খৃস্টাব্দ। সাহিত্যগগনে সেদিন টি এস এলিয়টের যখন উদয় হোলো তখন তাঁকে শান্তশিষ্ট স্তিমিতজ্যোতি কোনো তারা বলে কেউ ভুল করেনি। যে স্বল্পসংখ্যক লোক

সেদিন এই নতুন কবিকে লক্ষ্য করেছিলেন তাঁরা ভাবলেন, ইনি ধূমকেতু। কুসংস্কার তো শুধু ধর্মগত নয়, চিন্তাগতও। তাই সেই ধূমকেতু-দর্শনে নানা ভীরু চিত্তে আশংকার অন্ত ছিল না। কে জানে বিধাতার কৌতুকের এই জ্বলন্ত পুচ্ছের পশ্চাতে আছে কোন ঘরজ্বালানী কুগ্রহ?

পরে যখন (১৯২২) 'দি ওয়েইস্ট ল্যাণ্ড' প্রকাশিত হোলো, সহসা সমস্ত সাহিত্যজগৎ দু'ভাগে বিভক্ত হোলো। এক দল বললে, এ কাব্য অ-পূর্ব সৃষ্টি। অপর দল বললে, এ সৃষ্টিছাড়া। উৎসাহী অনুরাগীরা বললে, 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর পরে এমন মহাকাব্য রচিত হয়নি। সমোৎসাহী বিরোধী দলের জবাব এলো, আদমের পরে এমন মহাফাঁকি আর হয়নি। দু'পক্ষের কারো মনেই সন্দেহ রইল না যে, এলিয়ট নতুন কবি, তাঁর কাব্যের প্রতি ছত্রে অতীতের দৃপ্ত প্রত্যাখ্যান। ইংরেজি ক্যালেণ্ডারকে যেমন ভাগ করা হয় খৃস্টপূর্ব আর খৃস্টাব্দে, তেমনি ইংরেজি কাব্যকে এর পর থেকে ভাগ করতে হবে এলিয়টপূর্ব আর এলিয়টোত্তর যুগে।

অন্তর্যামী কিন্তু হাসছিলেন। হাস্যবোধ করে ১৯২৮ খৃস্টাব্দে এলিয়ট নির্ভয়ে ঘোষণা করলেন, "সাহিত্যে আমি ঐতিহ্যনিষ্ঠ (ক্ল্যাসিসিস্ট), রাজনীতিতে রাজতন্ত্রী (রয়্যালিস্ট), আর ধর্মে অ্যাংলো-ক্যাথলিক"। তিরিশটা সিগারেটের চেয়ে সস্তা পেঙ্গুইন-সংস্করণে এলিয়টের প্রবন্ধ-সংগ্রহের* সম্পাদক বলছেন, এই ত্রিবিধ বিশ্বাসেরই মূলে আছে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি এলিয়টের অবিচল নিষ্ঠা।

দৃশ্যত: যাঁর কাব্যের প্রথম গুণ তার চিত্তচমৎকারী নূতনত্ব, তাঁর সম্বন্ধে এমন উক্তি নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। উক্তিটিকে এলিয়টের আরো একটা হেঁয়ালি বলে যাঁরা হেলা করেন না তাঁদেরও অনেকের ব্যাখ্যা এই যে ওটা এলিয়টের মানসিক বয়োবৃদ্ধির বহির্লক্ষণ, গতকালের তপ্ত বিদ্রোহী আজকের শীতল সংরক্ষণশীল হয়েছেন। কিন্তু এলিয়টকে এমন সাহিত্যিক র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড মনে করা যে কতটা ভ্রান্ত তার স্পষ্ট ও সহজদৃশ্য প্রমাণ তাঁর কাব্যের উপরিতলে না মিললেও তাঁর গদ্য রচনায় সর্বত্র মেলে। সেইজন্যেই

* *Selected Prose* by T. S. Eliot, edited by John Hayward (Penguin, 2s.).

বিশেষ করে তারিখটার উল্লেখ করেছি : ১৯২৮। সেইজন্যেই আলোচ্য সংকলনটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

প্রবন্ধ বা প্রবন্ধাংশগুলি দুই শ্রেণীর। এক, সাহিত্যসমালোচনা। দুই, সমাজ-সমালোচনা। প্রভেদটা শুধু বিষয়গত, কেননা দৃষ্টিভঙ্গীর যে মূলগত ঐক্যের কথা একটু আগে হেওয়ার্ডের উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত হয়েছে সেটা সত্যি সম্পাদকের মনগড়া আরোপণ নয়, সেটা এলিয়টের মানসে নিহিত। সমাজে যেমন তিনি শান্ত ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে চান, তেমনি সাহিত্যে তিনি চান ঐতিহ্যের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। এলিয়টের অ্যাংলো-ক্যাথলিক আনুগত্যের প্রশ্ন তুলব না, তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় পরিমিত। কিন্তু রাজনীতিতে যিনি আজকের দিনে নিজেকে রয়্যালিস্ট বলে অভিহিত করতে কুণ্ঠিত নন, তাঁকে ভুল বোঝা সহজ—বিশেষ করে এইজন্যে যে তাঁর রাজনীতিক ও সাহিত্যিক মতামতে মূলগত ঐক্য আছে।

মোদ্দা কথা, মার্কিন রিপাবলিকে জন্মগ্রহণ করেও এলিয়ট যে নিজেকে রয়্যালিস্ট আখ্যা দিয়ে থাকেন তার আসল কারণ তাঁর কাছে রাজা মানে ইংল্যাণ্ডের ষষ্ঠ জর্জ, রাশিয়ার দ্বিতীয় নিকোলাস নয়। এমন মনার্কিতে রাজা প্রজার স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক নয়, রক্ষক। নিঃশোণিত বিপ্লব এমন ব্যবস্থায় নিরন্তর অলক্ষ্যে ঘটতে থাকে পরিবর্তন সেখানে বর্তমানের স্বাভাবিক পরিণতি; সেখানে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বা বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় না, তাই প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ নেই দুয়ের মধ্যে। দুয়ে সেখানে সন্ধি। কবি এলিয়টকে সব সময় গতকাল আর আজ-এর বিবাহে মন্ত্রপড়া পুরোহিত বলে মনে হয় না—বরং বিপরীত ধারণাই বহু মনে বদ্ধমূল—কিন্তু প্রাবন্ধিক এলিয়টের হৃদয় ও মস্তিষ্ক যে অতীত ঐতিহ্যে স্থিরনিবদ্ধ তার প্রমাণ মেলে যে কোনো নিবন্ধের যে কোনো অংশে। এই ঐতিহ্য-নিষ্ঠা যে কোনো মৃত অতীতের পূজা নয়, তা এলিয়ট বারবার বুঝিয়ে বলেছেন।

একেবারে আনকোরা নতুন অতীতসম্পর্কশূন্য শিল্পসৃষ্টি একেবারেই অসম্ভব, এলিয়টের একথা অন্তত আলোচকের পক্ষে সর্বদা স্মরণীয়। আলোচক এলিয়টের রচনাগুলি যে এক মুহূর্তের জন্যও 'রম্যরচনা' শ্রেণীতে

অবতরণ করেনি, সর্বদা প্রবন্ধের গম্ভীরতর পর্যায়ে থেকেছে, তার কারণ শুধু এলিয়টের অবিশ্বাস্য পাণ্ডিত্যই নয়, আসল কারণ তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, 'নো পোয়েট, নো আর্টিস্ট অব এনি আর্ট, হ্যাজ হিজ কমপ্লীট মীনিং এলোন।' পুরো ইংরেজি সাহিত্যকে গ্রীক ও ল্যাটিনের পরিপ্রেক্ষিতে আর আধুনিক সাহিত্যকে প্রাচীন সাহিত্যের পটভূমিতে বিচার করে এলিয়ট মিল্টন, ব্লেক, য়েটস, হার্ডি প্রভৃতি কবিদের কীর্তির উপর শুধু নতুন আলোকপাত করেননি, সার্থক আলোচনার প্রথম সূত্রগুলি ব্যাখ্যান ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

পঁচিশ বছর আগেও কে কল্পনা করতে পারত যে, শুধু এলিয়টের 'দুর্বোধ' কাব্য নয়, তাঁর অসরল প্রবন্ধ-সংকলনও ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সাহিত্যপত্রের অতিসীমাবদ্ধ গণ্ডী অতিক্রম করে বহুলপ্রচার পেঙ্গুইনে প্রকাশযোগ্য বলে বিবেচিত হবে? পাঠক-জগতের যে বিপ্লব এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের জন্যে দায়ী, তার গুরু এলিয়ট নিজে। এলিয়ট বদলাননি, আমরা বদলেছি। পাঠক যখন কোনো লেখকের কাছে এই রকমের হার মানে, তাতে উভয়েরই জয়।

১৬ মে, ১৯৫৩

সার ডেসমণ্ড ম্যাকার্থি

একটি নয়, দুটি ভূমিকা দিয়ে বইটির* শুরু। দুটিরই প্রয়োজন ছিল। রেমণ্ড মর্টিমার ও সিরিল কনলি, এই দুই শিষ্যোপম সমালোচক, সার ডেসমণ্ড ম্যাকার্থির ফোটোগ্রাফের উপর দু' তিনটি নিপুণ রেখা এঁকে ছবিটি পূর্ণাঙ্গ করেছেন, কেননা মর্মান্তিক সত্যটা হচ্ছে এই যে ম্যাকার্থির প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় প্রচ্ছদের ছবিতে যেমন নেই, তেমনি তাঁর সমগ্র রচনায়ও নেই; আলোচ্য সংগ্রহে তো নয়ই। প্রায় সারা জীবন তিনি লিখেছেন, কিন্তু বেশির ভাগই কাগজের জন্যে। সেই অত্যন্ত সুলিখিত প্রবন্ধের ফুলগুলি দপ্তরির সুতো দিয়ে গাঁথলেই যে গ্রন্থ

* *Memories by Sir Desmond MacCarthy (MacGibbon & Kee, London 16s).*

হয় না, সাহিত্যের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, ম্যাকার্থি সে কথা জানতেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রগত আলস্য ও অস্থিরচিত্ততা কাটিয়ে ওঠা তাঁর সাধ্যের অতীত ছিল। লেখক হবার সমস্ত যোগ্যতা সত্ত্বেও ম্যাকার্থি সেই একটি মারাত্মক অক্ষমতার জন্তে শুধু খবরের কাগজের সমালোচক বলে পরিচিত, লেখক বলে নন। এখানে যোগ করা দরকার যে প্রভেদটা শ্রেণীগত গুণগত নয়। মাঝারি লেখক হওয়ার চাইতে ভালো পত্রিকানবিশ হওয়া শ্রেয় হতেও পারে নাও হতে পারে। তা সমরসেট ম'ম যাই বলুন না কেন), কিন্তু নগণ্য লেখক হওয়ার চেয়ে সম্মানিত সমালোচক হওয়া নিশ্চয়ই শ্রেয়।

ডেসমণ্ড ম্যাকার্থি তা হয়েছিলেন আপন গুণে, আপন দক্ষতায়, সর্বোপরি আপন উদারতায়। মর্টিমার ও কনলি দু'জনেই ম্যাকার্থির এই উদারতার কথা বারবার বলেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত উদারতার কথা এ প্রসঙ্গে অবান্তর। তাঁর হৃদয়ের সেতু তাঁর জীবনের সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। আমার আলোচনা সমালোচক হিসাবে তাঁর উদারতা নিয়ে, এবং এ সম্বন্ধে আমি মর্টিমার ও কনলির সঙ্গে পুরোপুরি একমত নই। একবারও এমন কথা বলছি না যে সমালোচক ম্যাকার্থির উদারতা পুজোর পরে বাতাসার মতো নির্বিচারে প্রশংসার লুটের স্তরে নেমে এসেছিল কিন্তু সমালোচকের উদারতা মানে যদি এই হয় যে তিনি যে কোনো গ্রন্থ থেকে রসগ্রহণে সমান সমর্থ তাহলে সেটাকে আমি একটু সন্দেহ না করে পারি না। আমাকে যিনি ভালোবাসেন (এমন যদি কেউ থাকতেন) তিনি যদি পরম উদারতার সঙ্গে আমায় বলতেন যে তিনি সবাইকেই ভালোবাসেন তাহলে তাকে আমি সবিনয়ে বলতুম যে তাঁর প্রেমে আমার কাজ নেই। আমার ধারণা এই যে প্রেমের মধ্যে বহুর মধ্য থেকে একজনের নির্বাচন অতএব তার সকলের উক্ত বা উহ্য প্রত্যাখ্যান, অবশ্যম্ভাবীরূপে নিহিত। সাহিত্যপ্রেমেও এ নিয়মের বিশাল ব্যতিক্রম অসম্ভব।

সৌভাগ্যক্রমে ডেসমণ্ড ম্যাকার্থির সমালোচনায়ই আমার মতের সুস্পষ্ট সমর্থন আছে। তিনি বলেছেন মোপাসাঁর গল্প তাঁর ভালো লাগে, সঙ্গে সঙ্গে অনবদ্য একটি প্যারডির সহযোগে একথা বলতেও দ্বিধা করেননি যে সেই বিপরীত রকমের গল্পে তাঁর রুচি নেই যাতে কোনো কিছু ঘটে না, নায়িকা

গল্পের শেষে পাখির খাঁচায় চিনি ফেলে আর জানালার বাইরে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বয়ে যায়। কতগুলি জিনিস ভালো লাগা মানেই অন্য জিনিসগুলি ভালো না লাগা।

কিন্তু সমালোচকের উদারতার একটা তৃতীয় অর্থ আছে, এবং সেই অর্থে ডেসমণ্ড ম্যাকার্থির ভালো লাগার বিস্তৃতি বিস্ময়কর। থার্বার, টেনিসন, কিপলিং, গলসওয়ার্দি, ম্যাক্স বীরবরম, জয়েস্, লেরমন্টভ, ওয়েলস—এত বিভিন্ন রকমের লেখক ও লেখার সানুকম্প সমালোচনা সপ্তাহের পর সপ্তাহ সমান পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সম্পাদন করতে হলে যে গুণের প্রয়োজন তারও নাম নিশ্চয়ই উদারতা। এই উদারতার উৎস সমালোচকের মনে এই বিশ্বাস যে তাঁর কর্তব্য লেখকের বক্তব্য মেনে নিয়ে তারপর লেখার বিচার করা। এই নীতির বিপদ এই যে সমালোচনা এতে অনেক সময় শুধুমাত্র ভাষা ও বিন্যাসের আলোচনায় পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু বিষয় ও বিন্যাসে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করতে না পারলে সে সাহিত্যসমালোচকই নয়, এবং ম্যাকার্থি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর সমালোচক। তাঁর উদারতার অর্থ তাহলে এই দাঁড়াল যে তিনি কোনো লেখকের প্রতি সজ্ঞানে অবিচার করেননি। লেখকদের চোখ দিয়ে প্রথমে দেখতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে তবেই লেখকের চক্ষু পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছেন, কখনো বা মস্তিষ্ক পরীক্ষার, তার আগে নয়। টেনিসন সম্বন্ধে অডেনের ঔদ্ধত্যের কঠোর তিরস্কারটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

তবু সেই সর্বপ্রথম প্রশ্নটি অমীমাংসিত রয়ে গেল। এত বিদ্যা, নিঃসন্দেহ বুদ্ধি ও রচনাশৈলী সত্ত্বেও ম্যাকার্থি কেন লেখক হতে পারলেন না? কেন শেষ পর্যন্ত রয়ে গেলেন যাকে বলে l'homme de lettres? ইতিপূর্বেই আলস্যের উল্লেখ করেছি। সেটা পুরোপুরি ঠিক নয়। কই, সাপ্তাহিকের দাবী মেটাতে তো ত্রুটি হয়নি? সেই রচনায় কই কোথাও তো এতটুকু অযত্নের আভাস নেই! অলস হলে এগুলি সম্ভব হয় কী করে?

মর্টিমার বলেছেন, একটা কারণ এই যে তিনি লেখার চেয়ে পড়তে ভালোবাসতেন, বোধ হয় পড়ার চেয়েও আলাপ করতে। নিজে জানি, এ দুটিই নিঃসন্দেহে লেখার শত্রু। আরো একটা এবং বোধ হয় সব চেয়ে

বড়ো, কারণ এই যে ডেসমণ্ড ম্যাকার্থি পরে স্যর ডেসমণ্ড ম্যাকার্থি হয়েছিলেন। ওই নাইটহুডেরই হয়তো মূল্য দিতে হয়েছে কোনো গ্রন্থ রচনা না করে। তিনি একাধারে 'ম্যান অব লেটার্স' এবং 'ম্যান অব দি ওয়ার্ল্ড' হয়েছেন। কঠোর, নিঃসঙ্গ নিয়মানুবর্তিতায় যে সাহিত্যের সৃষ্টি হতে পারতো তা অপচিত হয়েছে পাঠে, আলাপে ও বন্ধুত্ববিনিময়ে। কে বলবে কোনটা শ্রেয়?

সমালোচনায় অনুসরণ করার মতো আদর্শ হিসাবে ডেসমণ্ড ম্যাকার্থির দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধেয়। কিন্তু লেখকযশঃপ্রার্থী আমার কাছে এ দৃষ্টান্ত সমান ভয়াবহ। মিলটনের সেই 'ওয়ান ট্যালেন্ট হুইচ ইট ইজ ডেথ টু হাইড,' সাপ্তাহিকে তার জীবন্ত সমাধি দেয়াও নিশ্চয়ই ক্ষমণীয় নয়।

১৩ জুন ১৯৫৩

প্রিচেট ও উইলসন

সাপ্তাহিক পুস্তক-সমালোচনা নয়, তার চেয়ে একটু বেশি উচ্চাভিলাষ নিয়ে এই 'প্রতিধ্বনি' নামে প্রবন্ধ-পর্যায় শুরু করেছিলুম। আশা ছিল, আমার লেখক-সত্তা না হারিয়েও সমালোচক হব। বাঙালী থেকেও বিদেশী সাহিত্যে পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করব।

ধারণাটা সুয়েজের পশ্চিম থেকে ধার করা। নানা সমালোচকের মধ্যে দুজনের কাছে আজ সেই ঋণ স্বীকারের সুযোগ ঘটল। লণ্ডনের "নিউ স্টেটসম্যান এ্যাণ্ড নেশন' এবং নিউ ইয়র্কের 'নিউ রিপাবলিক' সাপ্তাহিক দুটি কখনো যাঁদের হাতে পৌঁছেছে, তাঁদের বলে দিতে হবে না যে, আমার উত্তমর্ণদের নাম ভি এস প্রিচেট এবং এবং এডমণ্ড উইলসন। সম্প্রতি দুজনের দুটি সমালোচনা-সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকা থেকে পুস্তকে পদোন্নীত এই রচনাগুলি সমালোচকের চাতুর্য-প্রদর্শনী নয়, কেননা দুজনেই লেখক; এগুলি নির্বিচার নিন্দা বা প্রশংসাও নয়, কেননা দুজনেই সজাগ সমালোচক।

প্রিচেটের আলোচনাপদ্ধতির দুটি মূল সূত্র তাঁর বইটির* প্রতি ছত্রে প্রত্যক্ষ। এক, কোনো নতুন বইকে তিনি আকাশ থেকে পড়া বা ভুঁইফোঁড় আবির্ভাব বলে মনে করেন না। তিনি জানেন যে, প্রতিটি নতুন লেখা সেই লেখকের আত্মবিকাশের এবং সেই সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটি স্তর। দুই, কোনো পুরানো বইকে তিনি সসম্ভ্রমে সরিয়ে রাখেন না, নতুন সংস্করণ পড়েন যেন নতুন কোনো বই ছাপাখানা থেকে সদ্য বেরিয়েছে। অর্থাৎ, আধুনিক সাহিত্যকে তিনি বিচার করেন পরীক্ষিত প্রাচীনের পরিপ্রেক্ষিতে। আর প্রাচীন সাহিত্যের পুনর্বিচার করেন সমসাময়িক বা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। তাই মানৎসোনি, চেলিনি, গালডস, সুইফট, টলস্টয় ইত্যাদির আলোচনা আছে, যেন তাঁরা আজকের লেখক। পাশে আছে ক্যেসলার কারব্যাংক, জিদ ইত্যাদির আলোচনা, যেন এঁদের জবাবদিহি করতে হচ্ছে প্রাচীন সাহিত্যের পতাকাবাহী হিসাবে।

প্রিচেটের বইয়ের নাম থেকেই বোঝা যায় যে, তাঁর আলোচনার ক্ষেত্র কখনোই নবপ্রকাশিত গ্রন্থটিতে সীমাবদ্ধ নয়। অনেক সময় তাই এমন মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে আলোচ্য বইটি উপলক্ষ্য মাত্র, আলোচকের আসল উদ্দেশ্য সাধারণভাবে সাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করে নিজেকে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। অভিযোগটি অশ্রুত নয় এবং এটা আসে সাধারণত লেখকের কাছ থেকে। অক্ষম বা অতিমাত্রায় স্বার্থপর আলোচকের হাতে পড়লে লেখকের এই দুর্দশার আশঙ্কা আদৌ অমূলক নয়। কিন্তু প্রিচেটের মাত্রাজ্ঞান প্রখর। তাই তিনি নবীন লেখককে স্বীকৃত দিকপালদের সঙ্গে তুলনা করে তাঁদের সম্মান করেন; বিস্মৃত দিকপালদের সমাধি থেকে উদ্ধার করে সমকালীনদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁদের নতুন জীবন দান করেন।

'জীবন' কথাটা অযত্ন-প্রযুক্ত নয়। প্রিচেটের সাহিত্য সমালোচনার তৃতীয় নীতিটি হচ্ছে লেখকের জীবনের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের যোগাযোগ আবিষ্কার করা। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি তাই আত্মজীবনী নিয়ে, বা সেই সব লেখক সম্বন্ধে যাঁদের লেখায় তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ সবচেয়ে বেশি।

**Books In General* by V. S. Pritchett (Chatto and Windus 12s. 6d).

কার্লাইল-দম্পতি সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা এই পদ্ধতিটির একটি যোগ্য প্রতিনিধি।

বলা বাহুল্য, লেখকের জীবনের সঙ্গে তাঁর লেখার এই যোগাযোগ স্থাপন কেবলমাত্র মৃতদের বেলায়ই প্রশস্ত। দ্বিতীয়ত, এ-পদ্ধতিতে সাহিত্যের অসাহিত্যিক সমালোচনাও প্রশ্রয় পেতে পারে। প্রিচেটের রচনায় যে এ ত্রুটি নেই, তা তার শিক্ষা ও রুচির পরিমাপ।

মার্কিন সমালোচক এডমণ্ড উইলসনের আলোচনাপদ্ধতিতে * উপরে উল্লিখিত সবগুলি গুণ বর্তমান। কিন্তু একবারও তাকে অ-মার্কিন বলে ভুল করবার উপায় নেই। নিন্দা বা প্রশংসা কোনোটাই তিনি কমিয়ে বলেন না, (ওটা ইংরেজি অতি-ভদ্রতা): হ্যারল্ড নিকলসনকে সবার্বি 'স্নব' আখ্যা দিতে তাঁর দ্বিধা নেই, এচ এল মেঙ্কেন বা নর্মান ডগলাসকে তাদের প্রাপ্য প্রশংসা দিয়েও একথা বলতে উইলসনের বাধে না যে, এঁদের সমাজ-সমালোচনা উপেক্ষার যোগ্য।

এই প্রখর সমাজ-সচেতনতা উইলসনের সাহিত্য সমালোচনার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি অনায়াসে ১৯২৯-এর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সাহিত্যিক ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেন, ওয়াইল্ডারের সাহিত্যের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু অর্থনীতি ও রাজনীতিতে তীব্র কৌতূহল সত্ত্বেও সাহিত্য সম্বন্ধে পারাপুরি সাহিত্যিক উচ্ছ্বাস তার কখনোই প্রশমিত বা ব্যাহত হয়নি। তাঁর সাহিত্য-বিচারের মানও তাই কখনোই অ-সাহিত্যিক নয়, যদিও বিচারের দৃষ্টিভঙ্গী স্বভাবতই অন্যান্য কৌতূহল দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। 'দি প্লেজারস অব লিটরেচার' প্রবন্ধটিতে তিনি স্মরণ করেছেন সেই দিনগুলি যখন তিনি সাহিত্য পাঠ করতেন শুধুমাত্র আনন্দের জন্যে, শুধুমাত্র নব নব রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করতে। নব তত্ত্ব ও নব তথ্য আবিষ্কারের এই যে রেনেশাঁস-সুলভ পুলক, উইলসনের সাহিত্য-সমালোচনা সেই আনন্দের পুনরাবাহন। সাহিত্য, স্ব ও সমাজ—এই তিন দিকে সমান দৃষ্টি রেখে সমগ্রভাবে জীবনের একটা সংহত সার্থকতার সন্ধান—

* *The Shores of Light* by Edmund Wilson (W. H. Allen, 25s).

এর চেয়ে সার্থক ও আনন্দময় আর কোন কাজ থাকতে পারে কোনো সভ্য মানুষের ?

প্রিচেট ও উইলসনকে উপলক্ষ্য করে এই প্রবন্ধটিকে "প্রতিধ্বনি" পর্যায়ের ভূমিকাস্বরূপ মনে করলে অভিযোগ করব না। অনুসরণের দৃষ্টান্ত হিসাবে উইলসন বা প্রিচেটকে গ্রহণ না করে নিকৃষ্ট কাউকে নির্বাচন করা আদৌ শক্ত হোতো না। এঁদের চেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ আবিষ্কার করা শক্ত হোতো।

২৫ এপ্রিল, ১৯৫৩

আমেরিকার প্রতি য়ুরোপ

মনে আছে, ছেলেবেলায় একটা হাসির ছড়া বা গানে শুনেছিলুম 'আসে যদি রুশিয়া, তাড়াইব ঘুষিয়া' বা ওই রকমেরই কোনো কথা। পোর্ট আর্থারের পরেও ওটা হাসিরই কথা ছিল। আজকের দিনে সত্যি রাশিয়া যেদিকে আসবে বলে অন্তত সেদিককার লোকেরা মনে করছে, তাদের হাসির ছলেও অমন কথা বলার সাহস নেই। তারা জানে তাদের কামড়ে আর জোর নেই, গর্জন বৃথা। পশ্চিম য়ুরোপীয় সভ্যতার বড়ো শরিকের আজ দুর্দিন ; ছোটো শরিক কী বলেন ?

ছোটো শরিকের সমৃদ্ধি এখন শিখরে। তাই সে সানাইওয়ালাকে পয়সা দিয়ে দীপক রাগিনী বাজাবার আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত নয়, নিজের ঢাকটাও বড়ো বেশি বিরাম পায় না। সে বাজনায় রাশিয়া ভয় না পেলেও বড়ো শরিকের কানে তা বাজে। তার অভিমানে আঘাত লাগে। ছোটো শরিক জানতে চায়, কেন ? আমেরিকার পক্ষে প্রশ্ন করেছেন ল্যুইস গালাঁতিয়ের, উত্তর দিয়েছেন (বা এড়িয়েছেন) নয়জন য়ুরোপীয়।*

লুইস গালাঁতিয়ের আমেরিকার সুর কোমলে বাঁধেন নি। তিনি সরাসরি

* *America and the Mind of Europe*, edited by Lewis Galantiere (Hamish Hamilton, 6s).

বলছেন, "নীতির দিক থেকে আমাদের (অর্থাৎ আমেরিকানদের) দাবী সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত। অথচ আমরা যেন সর্বদা সসংকোচে আত্মসমর্পণে ব্যস্ত।...
.....অথচ য়ুরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের আজো এই ধারণা দৃঢ়মূল যে নির্যাতন ও শোষণ মার্কিনী বৈশিষ্ট্য, রাশিয়ায় ওবস্তু অজ্ঞাত!"

গাল্‌তিয়েরের বিস্ময় বুঝি, তবু নয়জন নিমন্ত্রিত য়ুরোপীয়ের মধ্যে একজনও কেন তাঁর প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেননি তাও অনুমান করা শক্ত নয়। রেমঁদ আরঁ সোজাসুজি প্রশ্নটির সম্মুখীন হয়ে বলছেন শুধু হাঁ কি না বলে এর উত্তর সম্ভব নয়। ছোটো শরিকের সাহায্য যদি শুধু আর্থিক আর সামরিক হোতো তা গ্রহণ করতে দীর্ঘ দ্বিধার কারণ ছিল না, কিন্তু নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মার্কিন নেতৃত্ব নিঃসংকোচে মেনে নিতে য়ুরোপকে দুবার ভাবতেই হয়। এই য়ুরোপীয় দ্বিধার নানা কারণ আরঁ উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু থলে থেকে বিড়াল বেরিয়ে যায় যখন আরঁ বলেন, "মৌলিক কারণটা হচ্ছে সবলের প্রতি দুর্বলের স্বাভাবিক ঈর্ষা। ..আজ য়ুরোপকে তার পূর্বার্জিত আত্মসম্মান আঁকড়ে থাকতে হয়।" "কিন্তু", একটু পরেই বলছেন, "একথাও গোপন করে লাভ নেই যে, সংস্কৃতিকে নিযাস বা বড়ি করে পরিবেশন করবার যে প্রবৃত্তি আমেরিকানদের প্রায় মজ্জাগত তা য়ুরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের বিতৃষ্ণ শংকার মূল।" পুরানো য়ুরোপ আর নতুন আমেরিকার মধ্যে এই বৈষম্য স্বীকার না করে উপায় নেই।

তবু আরঁর পথ পরিষ্কার। তিনি নিজে বিনা সর্তে মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করবার পক্ষপাতী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যোগ করতে ভোলেন নি যে এ বিষয় তিনি বর্তমান য়ুরোপের প্রতিনিধি নন। বর্শনঁ কিন দ্বন্দ্ব, আরঁ বলছেন, য়ুরোপ সক্রিয়ভাবে আমেরিকার পাশে দাঁড়াবে যদি (১) আমেরিকানরা মোড়লী ছেড়ে সত্যকার নেতৃত্বের পরিচয় দেন, (২) যদি তাঁরা এই দুরাশা পরিহার করেন যে আত্মরক্ষার্থে আমেরিকার অনুগামী হলে য়ুরোপকে সর্বক্ষেত্রে আমেরিকার অনুসারী হতে হবে এবং (৩) যদি তাঁরা সর্বদা স্মরণ রাখেন যে, রুশ-মার্কিন যুদ্ধ হলে সেই রাজায় রাজায় লড়াইয়ে য়ুরোপের ভূমিকা হবে উলুখড়ের, এবং একটু ভয় তাই স্বাভাবিক।

আর্থাব ক্যেসলাব বলছেন, আদৌ তা নয়। "আজকেব দিনে য়ুবোপে জীবন হযেছে ঘুঘুচবা মাঠে চড়ুইভাতি। দুই বিবোধী বন্দুকেব তলায অসহাযভাবে বাঁচাব চিন্তা এতই ভযাবহ যে চোখ বুজে না থেকে উপায নেই।" য়ুবোপেব তাই হযেছে। উপসংহাবে তিনি মার্কিনী নেতৃত্বেব পক্ষপাতী, দ্বিতীয পন্থা নেই বলে।

স্টিফেন স্পেণ্ডাব পুবো প্রশ্নটিই এড়িযেছেন—আমেবিকাব সম্বন্ধে এক বর্ণও বলেন নি এবং য়ুবোপেব মানসেব কথা না তুলে শুধু নিবরসব ইংবেজ লেখকদেব নিরুপায হযে সবকাবী চাকবি নিতে বাধ্য হওযাব কথা আলোচনা কবেছেন। অবান্তব। দ রুজমঁ বলছেন, য়ুবোপেব নৈতিক অবনতি ঘটেছে। নিকোলাস নাবোকফ্ যুদ্ধোত্তব সঙ্গীত-প্রীতিব বৃদ্ধিতে খুশি। সোবি শুধু পিকাসোব 'গ্যের্নিকা'ব ছাযায য়ুবোপীয আর্টেব বিকাশ নিযে আলোচনা কবেছেন। সার্টন আমেবিকানদেব য়ুবোপ ভ্রমণ কবে য়ুবোপকে চেনবাব পবামর্শ দিযেছেন। প্রায প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সুলিখিত এবং কোনো কোনোটি সুচিন্তিত। কিন্তু রুশ পবিস্থিতিব পবিপ্রেক্ষিতে য়ুবো-মার্কিন সম্পর্কেব সাহসিক পর্যালোচনা কবেছেন লেও লানিযা ও মেলভিন লাস্কি।

লানিযা বলছেন, য়ুবোপ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন তাই শান্তিতে আসক্ত। রুশ বিভীষিকা সম্বন্ধে সে আমেবিকাব আশানুরূপ আতংকিত নয কেননা সে সীনিক, সে বিশ্বাস কবে না যে তাব সামনে কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। এই নিবাশাবাদীবা য়ুবোপে আজ সংখ্যাগবিষ্ঠ। লাস্কি নাম কবতেও দ্বিধা কবেন নি। বলেছেন য়ুবোপ আজ এমনই সংকুচিত ও বিহ্বল যে ইংল্যাণ্ড 'নিউ স্টেটসম্যান অ্যাণ্ড নেশন'-এব প্রচাবে বিভ্রান্ত, জঁ-পল সার্ত্র এখনো বিশ্বাস কবেন যে স্টালিন প্রগতিপন্থী। এই বিপযস্ত অবস্থায মালবো নিঃসঙ্গ, ক্যেসলাব দেশত্যাগী, আর্বঁ হাবা যুদ্ধেব মৃত সৈনিক ও কেম্যু আত্মমুখ। বাশিযাব বিরুদ্ধে প্রতিবোধেব সংকল্প কোথাও নেই। নিরুৎসাহ, উদাসীন য়ুবোপেব এই বাস্তব কিন্তু অপ্রীতিকব চিত্র আমেবিকাকে হৃদযঙ্গম কবতে হবে। আমেবিকাকে বুঝতে হবে, কেন সে, উন্মাদনা দূবে থাক, উদ্দীপনা পর্যন্ত জাগাতে পাবে না অ-মার্কিন গণতন্ত্রবিশ্বাসীদেব প্রাণে।

এটা আদৌ অসম্ভব নয় যে বিশ্বের প্রতি মার্কিন ব্যবহারের মূলেই কোথাও ভুল ছিল গো, ভুল আছে।

মার্চ, ১৯৫১

অলডাস হাক্সলে

শেকসপীয়র বা শেলিকে ঈর্ষা করা মূর্খতা। ওঁরা অন্য শ্রেণীর শুধু নন, অন্য পর্যায়ের লেখক। এমন লেখকদের শিল্পসাফল্যে প্রয়াস, অধ্যয়ন ও অনুশীলন নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু প্রতিভার অজস্রতা ব্যতীত শুধুমাত্র চেষ্টায় ওই রকমের সৃষ্টি সাধ্য নয়। আর, প্রতিভা নিয়ে তো ঈর্ষা চলে না; যেমন বিবাদ চলে না ফর্সা রঙ বা কালো চোখ নিয়ে। এসব বস্তু যার আছে তার আছে যার নেই তার নেই। কান্না মিছে, চেষ্টা বৃথা। কিন্তু গুণ যেখানে প্রধানত যত্ন, প্রসাধন, বিচক্ষণতা ও শাড়ী-নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল, তেমন গুণীকে ঈর্ষা করা নীচতা নয়, নিরর্থকও নয়। এ শুধু আয়াসলভ্য উৎকর্ষের জন্য প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হওয়া, সেই প্রয়াসে নিজের প্রেরণার অভাব পূরণে যত্নশীল হওয়া।

অলডাস হাক্সলে তাই কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমার ঈর্ষার পাত্র ছিলেন। সেই 'ক্রোম ইয়লো' থেকে শুরু করে তাঁর গল্প উপন্যাস বা প্রবন্ধ যা কিছু পড়েছি,—সব সময় মনে হয়েছে ইনি আমার চেয়ে কত ভালো লেখেন! কিন্তু এ ভালো যেন নাগালের বাইরে নয়। তাঁর মতো ভ্রমণের সুযোগ, সামর্থ্য ও অবসর আমার থাকলে আমি প্রায় 'জেস্টিং পাইলেট'-এর মতো একখানা বই লিখতে পারতুম, এমন দাবীতে অবিনয়ও নেই, হাক্সলের প্রতি অশ্রদ্ধাও নেই। যদি আমি তাঁর মতো এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা নিয়ে ছেলেবেলা থেকে বসে থাকবার সুযোগ পেতুম, তাহলে 'পয়ন্ট কাউন্টার পয়ন্ট'-এর ফিলিপ কোয়রলসের মতো চরিত্র সৃষ্টি করতে পারতুম, অন্তত 'প্রপার স্টাডিস' বা 'অন দি মার্জিন'-এর মতো প্রবন্ধ লিখতে পারতুম। হাক্সলের কল্পনা আকাশ-ছোঁয়া নয়, তাঁর লেখার যত গুণ (এবং আমি তাঁর পরম গুণগ্রাহী) তার অধিকাংশ পরিবেশপ্রদত্ত বা শ্রমার্জিত, জন্মগত নয়।

জন্মের কথা বাদ দিয়ে, হাক্সলে অদ্যাবধি যা কিছু লিখেছেন তার মধ্যে আর যাই থাক রমণীয় কল্পনা নেই। সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ আছে। তীক্ষ্ণতম বিচার আছে। তাঁর বিশ্লেষণে এমন নির্মম নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী আছে যা, সমালোচকদের মতে, ক্লিনিক্যাল। সাহিত্যে এই ডাক্তারি গ্রাহ্য হবে কি হবে না সে প্রশ্ন অবান্তর, কেননা হাক্সলে নিঃসন্দেহে গৃহীত হয়েছেন। শুধু ইংরেজিভাষী দেশগুলিতে নয়, বাঙলাতেও তাঁর অক্ষম অনুকারী অধুনা প্রবীণ লেখক বলে পরিগণিত।

আমি হাক্সলের অনুকারী নই, কিন্তু অনুরাগী ছিলুম। সেই অনুরাগ ছিল বিভিন্ন দফায় এবং তার অসম্পূর্ণ একটা তালিকা আজো অনায়াসে দাখিল করতে পারি। এক, তাঁর বিদ্যার অবিশ্বাস্য ব্যাপ্তি। দুই, উপন্যাসে সেই বিদ্যার কুশল প্রয়োগ, যদিও বিদ্যা বা বুদ্ধি এখানে অপরিহার্য তো নয়ই বরং প্রায়ই অবান্তর। তিন, কোনো বহু গৃহীত সূত্রকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মানতে তাঁর যুক্তিধর্মী আপত্তি। চার, তাঁর অসামান্য বিশ্লেষণক্ষমতা। পাঁচ, প্রকৃতি, সেক্স, প্রেম, ধর্ম, নন্দনী আতিশয্য ইত্যাদি সহস্র রমণীয় মোহ বা মনোভাবের প্রতি তাঁর নির্মম অ-রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী। ছয়, তাঁর সত্যসন্ধানী অজড়তা। সাত, তাঁর সবল, সযত্ন ও শিক্ষিত লিপিকৌশল। আট, তাঁর চিত্তের দৈবী অতৃপ্তি। নয়, দশ, এগারো ইত্যাদি আরেকটু জায়গা ও সময় থাকলে নাম করা যেতো, কিন্তু হাক্সলের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ ঈর্ষার বহুবিধ কারণ নিশ্চয়ই ইতিমধ্যেই সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে।

পরে যেন কী হয়ে গেল! 'ডু হোয়ট য়ু উইল' বইতে হাক্সলে ওয়ার্ডস্বার্থ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "As the years passed, however, he began to interpret them (প্রকৃতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলি) in terms of a preconceived philosophy. Procrustes-like, he tortured his feelings and perceptions until they fitted his system." আজ হাক্সলেরও যেন সেই অবস্থা হয়েছে যে "Weary with much wandering in the maze of phenomena, frightened by the inhospitable strangeness of the world, men have rushed

into the systems prepared for them by philosophers and founders of religions, as they would rush from a dark jungle into the haven of a well-lit, commodious house. With a sigh of relief and a thankful feeling that here at last is their true home, they settle down in their snug metaphysical villa and go to sleep. And how furious they are when any one comes rudely knocking at the door to tell them that their villa is jerry-built, dilapidated, unfit for human habitation, even non-existent !"

হাক্সলে তাঁর অধুনালব্ধ বেদান্তশয্যায় সুখসুপ্তিতে স্বপ্নবিভোর, এমন বললে অত্যুক্তি করা হবে। বরং তাঁর সমস্ত সাম্প্রতিক রচনাই দুঃস্বপ্নের শরশয্যা। কিন্তু আগে যেখানে তিনি অকরুণ বিচারক হয়ে শুধু প্রমাণাভাবে সব মামলা ডিসমিস করে দিতেন, আজ সেই প্রত্যাখ্যানের পরে তিনি অদ্ভুতের সমাধানের ওকালতি করছেন। প্রমাণের প্রশ্ন তুলছেনই না। আজ তিনি যে 'মেটাফিজিক্যাল ভিলা'-য় মানবজাতিকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন একবারও তাঁর মনে হচ্ছে না সে বাড়িও বসবাসের অযোগ্য হতে পারে, এবং হয়তো তা নিরস্তিত্ব বলেই। এমনকি এ বাড়ি মেটাফিজিক্যালও নয়, যেখানে তর্কের সুযোগ আছে। এ যে মিস্টিক মৌন প্রায় স্প্যানিশ দুর্গ।

তাঁর নতুন বইয়ের * আবরণ ঐতিহাসিক, আগেকার 'গ্রে এমিনেন্স' ও 'থিমস এ্যাণ্ড ভেরিয়েশনস' বইয়ের 'মেইন দ বিরঁ' প্রবন্ধের মতো। নায়ক এখানে গ্রঁদিয়ে, যে-অর্থে 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর নায়ক শয়তান। সপ্তদশ শতাব্দীতে লুড্যঁর কনভেন্টে ভূতের উপদ্রবের রোমহর্ষক কাহিনীর এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুনর্বর্ণনে হাক্সলে হাত দিয়েছেন ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, নৈতিক প্রেরণায়। কনভেন্টের ভূতে-পাওয়া দানবদাসীদের নানা কীর্তি হাক্সলে বিবৃত করেছেন তাঁর ঔপন্যাসিকোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে, কিন্তু তাঁর

* *The Devils of Loudun*, by Aldous Huxley (Chatto & Windus, 18s)

প্রধান লক্ষ্য ওঝা স্বয়ং। ইনি কনভেন্ট থেকে ভূত ঝাড়লেন বটে, কিন্তু সে ভূত এসে চাপল তাঁর নিজের স্কন্ধে।

হাক্সলের সিদ্ধান্ত: "Those who crusade, not for God in themselves, but against the devil in others, never succeed in making the world better, but leave it either as it was or sometimes even perceptibly worse than it was before."

নানা অস্পষ্ট উক্তির অন্তরালে আত্মগোপন করতে পারতুম, কিন্তু স্বদেশের উদাহরণ দিয়ে স্পষ্টই বলি, মহাত্মা গান্ধী (যিনি 'স্যাটানিক' বৃটিশ সরকারের দেহ থেকে সাম্রাজ্যবাদের ভূত ছাড়াতে চেয়েছিলেন) ভারতবর্ষের যে কল্যাণকর পরিবর্তন সাধন করে গেছেন তার চেয়ে শ্রীঅরবিন্দ (যিনি আপন সাধনার বলে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের চেষ্টা করেছিলেন) যদি বেশি উপকার করে থাকেন তবে তা অন্তত আমার কাছে আজ পর্যন্ত অগোচর রয়ে গেছে।

প্রভেদটির সূক্ষ্ম ও নির্ভুল বিশ্লেষণ আছে আর্থার ক্যেসলারের 'যোগী অ্যাণ্ড দি কমিসার' প্রবন্ধে। বাইরে থেকে পরিবর্তন, না ভিতর থেকে? হাকসলে আজ যোগী হয়েছেন। জাগতিক স্তরের সমস্ত প্রচেষ্টা আজ তার কাছে অর্থহীন বা ক্ষতিকর। আজ তার ভূয়োদর্শনের শিক্ষা এই যে মানুষের কাছে কেবলমাত্র মানবীয় অস্তিত্ব অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই সে হয় জন্তুর পর্যায়ে অবতরণ করতে চাইছে (ফ্রান্সে আজ প্রতি এক শ জনের জন্যে একটি মদের দোকান), তা নইলে সে সান্ত্বনা খুঁজছে সামষ্টিক উত্তেজনায় ব্যক্তিসত্তা বিস্মৃত হয়ে (নাৎসী বা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে যা হয়েছে বলে হাক্সলে বিশ্বাস করেন)। উপায়? হাক্সলে বলছেন, উপায় নীচে নামা নয়, অনুভূমিক অগ্রগমনের চেষ্টাও নয়; একমাত্র পথ আত্মাতিক্রমণ, অহম্ এর কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে ...না, বাকিটা আমি বুঝি নে!

আজো আমি লেখক হাক্সলের অনুরাগী, কিন্তু দার্শনিক হাক্সলের নই। পরে কী হবে জানিনে, আজ আমার গান: 'জীবন রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।' দ্বিধা-দ্বন্দ্বে, ভালো-মন্দে মেশানো মনুষ্য-জীবন।

৪ অক্টোবর, ১৯৫৩

সিমেন্স

আমি একেবারে লাজুক নই, কিন্তু নানা চরিত্রগত কারণে অতি মাত্রায় অসামাজিক। তাই নিতান্ত সঙ্গতভাবেই আমি আমার পরিচিতদের মধ্যে জনপ্রিয় নই। আমার পরিচয় অল্পসংখ্যক লোকের সঙ্গে, আমার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধুর সংখ্যা অল্পতর। সাধারণত অভিযোগ করিনে তাই নিয়ে; মেনে নিয়েছি যে নিকট পরিবেশ থেকে আমার এই দূরত্বের জন্যে আমার নিজেরই চরিত্রে হয়তো কোনো ত্রুটি নিহিত আছে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। কবুল করতেই হবে যে, বহুবন্ধু হতে যে সহিষ্ণুতা প্রয়োজন তা আমার নেই। মনের মতো বন্ধু সন্ধান করবার পরিশ্রম, সেই বন্ধুত্বের পরিধি বিস্তৃত করবার ও গভীরতা বৃদ্ধি করবার আয়াস, নবলব্ধ বন্ধুকে নবোপ্ত চারার মতো জীইয়ে রাখবার যত্ন, সেই বন্ধুত্বকে ডক্টর জনসনের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়মিত মেরামতে রাখবার চেষ্টা, ('ফ্রেণ্ডশিপস শুড বি কেপ্ট আণ্ডার কনস্ট্যাণ্ট রিপেয়ার' বোধহয় ছিল তাঁর কথা)—এসবের কিছুই আমি পারিনে। মনে মনে বলেছি, বেশ, কাজ নেই আমার জনপ্রিয়তায়।

আমার প্রথম বই প্রকাশিত হলে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা আদৌ বাড়ল না; বরং কমল, কেননা যাঁরা ইতিপূর্বেই অন্যান্য কারণে আমার প্রতি বিরূপ ছিলেন এখন তাঁরা আট-নয় সংস্করণ বিক্রীত বইয়ের 'জনপ্রিয়' লেখকের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের আরো একটি সুযোগ পেলেন। তিরস্কার হিসাবে 'জনপ্রিয় লেখক' কথা দুটি যে কী বেদনাদায়ক তা নিজের উপর এদের প্রয়োগের আগে জানতুম না। আজ এই সত্য কথাটা কাউকে বিশ্বাস করাতে পারিনে যে জনপ্রিয়তার চাইতে মাইনরিটির লেখক হবার লোভ আমার প্রবলতর ছিল, যদিও আমার প্রায়-'ম্যাণ্ডারিন' গদ্যের প্রতি ছত্র তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে।

অনভিপ্রায় সত্ত্বেও 'বেস্ট-সেলিং' লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে ক্রমে আমার মধ্যে কিছুটা ট্রেড য়ুনিয়নী মনোভাবের সঞ্চার হয়েছে। অন্যান্য লেখক, যাঁদের ভাগ্যে বিক্রয়স্থানে বৃহস্পতি ও সম্মানস্থানে রাহু, তাঁদের প্রতি আমার

সহানুভূতির উৎস ওই উল্লিখিত ব্যক্তিগত ঘটনাটি। আমি তাই সমরসেট ম'মের প্রতি উন্নাসিক অবজ্ঞার সম্মুখীন হলে তৎক্ষণাৎ তাঁর সমর্থনে তরবারি ধারণ করি। একই কারণে সম্প্রতি, অন্যান্যদের মধ্যে, সিমেনঁতে * উৎসাহী হয়েছি।

কিন্তু তার আগে আলোচনা করা যাক জনপ্রিয়তার প্রশ্ন। ম'ম নিজে, বোধহয় তাঁর 'এ রাইটার'স নোটবুক' বইয়ে, বলেছেন যে বেস্ট-সেলারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য একত্র করে একদা তিনি ও তাঁর বন্ধু একটি ছবির চিত্রনাট্য তৈরী করতে গিয়ে কী রকম বোকা বনেছিলেন। কোন বই কেন বেশি বিক্রয় হয় তা পরে হয়তো ময়না-তদন্ত করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব, কিন্তু সেই ফরম্যুলা অনুযায়ী বই লিখে কেউ উদ্দেশ্যে সফল হয়েছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই। কোনো কোনো লেখকের বহুবিক্রয়ের সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই সেটা পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনার পুরস্কার নয়। তবে কেন জনপ্রিয় লেখককে অপ্রমাণিত অভিসন্ধির দায়ে দণ্ডিত করা?

এর উত্তর এই হতে পারে যে যে-লেখার রসগ্রহণে বহুসংখ্যক লোক সমর্থ, নিশ্চয়ই তার মধ্যে এমন সামগ্রী আছে যা বুদ্ধিমান পাঠকের মনোযোগের অযোগ্য। এ যুক্তিতে আর যাই থাক, বহুর প্রতি শ্রদ্ধা নেই। আর যাই না থাক, অতি বেশি আত্মম্ভরিতা আছে। কিন্তু এ কথাও থাক। বহুর প্রতি শ্রদ্ধা আমার নিজেরও পরিমিত, আমার প্রধান দৈন্যও কিছু আত্মম্ভরিতায় নয়। আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে, বহুবিক্রীত গ্রন্থকারকে আর যে দায়েই সোর্পদ ও দোষী সাব্যস্ত করা হোক, বহুবিক্রয়ের অভিযোগ করা অবিচার কেননা বিক্রয়ের বহুত্বের জন্যে লেখক দায়ী নয়। টি এস এলিয়টের 'ফ্যামিলি রিয়ুনিয়ন' জনপ্রিয় হয়নি, 'ককটেল পার্টি' হয়েছে। এক যাত্রীর এই পৃথক ফলে নাটক দুটির উৎকর্ষ-অপকর্ষের পরিচয় কোথায়? এডিনবরা ফেস্টিভ্যালে 'ককটেল পার্টি' ভালো ছিল, আর ওয়েস্ট এণ্ডে বা ব্রডওয়েতে এসে মন্দ হয়ে গেল? ঊর্ধ্বভ্রূ সমালোচকদের এই রকমের মনোবৃত্তির জন্যই ম'ম অসহ্য আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বলতে পারেন, "I too have lived in

* ***Aunt Jeanne*** **by Simenon (Routledge, 8s 6d)**

Arcadia!" কেননা তাঁরও নাটক এককালে লিটল থিয়েটারের শূন্য প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয়েছিল।

বহু জনপ্রিয় লেখক সম্বন্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে তাঁদের গ্রন্থসংখ্যা অভদ্র রকম বৃহৎ। পল ভালেরি যখন 'ফেলিসিটি'-কে সাহিত্যে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করেন তার কারণ বুঝি, কিন্তু সৃষ্টিকার্পণ্য নিশ্চয়ই উৎকর্ষের চূড়ান্ত গ্যারান্টি নয়। কার্পণ্যের সত্য কারণ দৈন্য হওয়াও অসম্ভব নয়। রচনার অজস্রতায় দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখা প্রশ্রয় পেতে পারে, কিন্তু এমন একাধিক লেখকের নাম করতে পারি যাঁরা অনেক মধ্যম শ্রেণীর লেখা লিখে, সেই অনুশীলনের ফলস্বরূপ, পরে তাঁদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন। মোদ্দা কথা, অনেক লেখা অপরাধ হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ, ডিকেন্স, ব্যালজ্যাক, টলস্টয়,— এঁরা কেউই কম লেখেননি। তাঁদের সব লেখাও কিছু সমান ভালো নয়। উত্তরকালের পাঠক তাদের উর্বরতার জন্যে নির্বাসন দণ্ড দেয় না; ভালো লেখা সশ্রদ্ধ চিত্তে ও সানন্দে পাঠ করে, বাকিটা ক্ষমাশীল বিস্মরণের ধুলায় আবৃত থাকে। বেশি লেখার জন্যে ফাঁসি দেয়া অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ফ্যাশন, এবং আমি অন্তত একে সুবিচারসম্মত বলে মানিনে।

এদিক থেকে সিমেনঁ বোধহয় অভূতপূর্ব বিস্ময়। বিভিন্ন নামে তিনি নাকি প্রায় আড়াই শো উপন্যাস লিখে স্থির করলেন যে এবারে তার লেখার উন্নতিসাধন আবশ্যক। তার পরেও তিনি নাকি বছরে গড়ে আটটি উপন্যাস লিখেছেন বারো বছর ধরে, এবং এখনও সেই উৎপাদনের হার প্রায় অব্যাহত। আর যা বলে বলুক অন্য লোক, এমন ক্ষমতার প্রতি আমার অবজ্ঞার চেয়ে ঈর্ষিত বিস্ময় অধিক, কেননা (১) আমি নিজে বছরে একখানাও নিয়মিত লিখে উঠতে পারিনে, এবং (২) এমন বহু লেখকের নাম করতে পারি যাঁরা বছরে একখানা বই লেখেন এবং গণিতের নিয়মানুসারে তা সিমেনঁর লেখার চাইতে আট গুণ ভালো হয় না। না, আমি অন্তত সিমেনঁকে হেলা করতে পারব না।

অন্যান্য সমালোচকের আরো অভিযোগ আছে সিমেনঁর বিরুদ্ধে। তাঁর অধিকাংশ লেখা ডিটেকটিভ বা থ্রিলার জাতীয়। সাহিত্যের এই শাখাটির সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ও শ্রদ্ধা উভয়ই অগভীর। কিন্তু এই শ্রেণীর রচনার

দুঃসাধ্যতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন, এবং এখনও ভুলতে পারিনে যে গুটি দশ খুন থাকা সত্ত্বেও 'হ্যামলেট' শুধুমাত্র রোমহর্ষক শস্তা নাটক নয়। আমি মানতে বাধ্য যে সাহিত্যের এই আপাত-শস্তা মাধ্যমেও সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব।

রেমণ্ড মর্টিমার প্রমুখ কয়েকজন সমালোচক ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছেন, সিমেনঁ এখনই গুরুসাহিত্যে অন্তর্ভুক্তির জন্যে সযত্ন বিবেচনার অধিকারী। দেখলুম, কে একজন সিমেনঁকে ব্যালজাকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'দি আর্ট অব সিমেনঁ' নামে একটি বইও কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে।

এই পর্যন্ত এসে আমার ট্রেড য়ুনিয়নী উত্তেজনা শীতল হয়ে পড়ে। 'আণ্ট জীন' বইতে খুন নেই, (একটি মাত্র আত্মহত্যা আছে), সিমেনঁর চরিত্রচিত্রণ ও পরিবেশসৃষ্টির প্রতিভার নির্ভুল পরিচয়ও আছে। তবু, ব্যালজাকের সঙ্গে তুলনা যেন একটু আগে এসে পড়েছে। আইন-আদালতের কাহিনীর জীবন্ত প্রতিবেদনের সঙ্গে আর যে-টুকু যোগ করে প্রতিভা সার্থক শিল্পসৃষ্টি করে, সিমেনঁতে এখনো তা অবিসম্বাদীরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

৩ অক্টোবর, ১৯৫৩

গ্রেহাম গ্রীন

ফরাসি, নোবেল লরিয়েট, ক্যাথলিক ঔপন্যাসিক ফ্রাসোয়া মোরিয়াক তাঁর 'গ্রেট মেন' বইতে ইংরেজ ঔপন্যাসিক গ্রেহাম গ্রীনকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। টাইমস লিটরেরি সাপলিমেন্ট তাতে খুশি হননি. সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মৃদু প্রতিবাদ জানিয়েছেন; কেননা ফরাসিতে 'গ্রেট মেন' কথার মানে যাই হোক, ইংরেজি অর্থে শক্তিমান লেখক হওয়া মানেই মহাপুরুষ হওয়া নয়। আমি এই মৃদু প্রতিবাদের প্রবল সমর্থক।

কিন্তু সেই সঙ্গেই আমি গ্রেহাম গ্রীনের শক্তিসমৃদ্ধ রচনাবলীর প্রবল অনুরাগী। তাঁর প্রথম নাটকেও* সেই শক্তিমত্তার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে

*he Living Room by Graham Greene (Heinemann, 7s. 6d)

আগাগোড়া—যেমন ছিল 'দি পাওয়ার অ্যাণ্ড দি গ্লোরি', 'দি হার্ট অব দি ম্যাটার', এবং বিশেষ করে 'দি এণ্ড অব দি এফেয়ার' উপন্যাসে। সেই নির্মম বাস্তবতা, সেই কঠোর বাক্‌সংযম, সেই স্পর্শক্ষম জীবন্ত চরিত্রচিত্রণ, সেই শ্বাসরোধকারী অনুভূতিঘনতা, সেই নিখুঁত ঘটনাবিন্যাস ও গঠনপারিপাট্য, সেই জ্বলন্ত ধর্মবিশ্বাস। প্রথম ছ'টি গুণ 'দি ফলন আইডল' ও 'দি থার্ড ম্যান' ছবিতেও ছিল, আলোচ্য নাটকেও আছে। কিন্তু সপ্তম গুণটি ব্যতীত গ্রীনের প্রথম নাটক দু'বার বলা চিরন্তন ত্রিভুজের একান্ত অনভিনব নাট্যরূপের ঊর্ধ্বে উঠতে পারত না। ধর্ম, বিশেষ করে আচারপ্রধান ক্যাথলিক ধর্মে, আমি বর্তমানে অনুৎসাহী; কিন্তু এই নাটকে গ্রীন তাঁর ধর্মবোধের এমন নিপুণ ব্যবহার করেছেন যে নিতান্ত অ-কোলরিজীয় অর্থে আমি সাসপেনশন অব ডিস-বিলীফ করতে বাধ্য হয়েছিলুম।

আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে, আমার এই প্রশংসায় গ্রেহাম গ্রীন বিন্দুমাত্র প্রীত হবেন না। ধর্ম তাঁর কাছে সাহিত্যসৃষ্টির নানা উপাদানের একটি মাত্র নয়, বিশ্বাস তাঁর জীবনের ধ্যান ও লক্ষ্য এবং তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। গ্রেহাম গ্রীন তাঁর 'দি লস্ট চাইলডহুড' বইতে ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বর্তমান শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ধারণা হেনরি জেমসের মৃত্যুর সঙ্গে ইংরেজি উপন্যাসের এক বিপর্যয় ঘটল; ইংরেজি উপন্যাস থেকে ধর্মবোধ ইতিপূর্বেই বিদায় নিয়েছিল, এবার গেল স্বযত্ন লিখনশৈলী। ফলে ইংরেজি উপন্যাস কানা বা খোঁড়া হোলো গোটা একটি ডাইমেনশন হারিয়ে। কেন? গ্রীনের কথায়, "with the religious sense went the sense of importance of the human act."

বস্তুত, গ্রীনের প্রতি আমার অনুরাগের প্রথম কারণই ওই। সাম্প্রতিক উপন্যাস যে অন্তশ্চিন্তনের ঘূর্ণীপাকে ধরা পড়েছিল, গ্রীন প্রমুখ লেখকরা তার মধ্যে হিউম্যান অ্যাক্ট এনে ঘটনাস্রোত বইয়ে দিয়ে তাকে আবার চলিষ্ণু করলেন। কিন্তু কোন দিকে?

তাব আগে বিবেচ্য উপন্যাসেব প্রকৃতিগত কী পবিবর্তন ঘটল। প্রথম, বদ্ধ ঘবে যেন দু'চাবটে জানলা খোলা হোলো। দ্বিতীয়, লবেন্স, ভার্জিনিয়া উলফ ইত্যাদিব হাতে (সে হাতেব প্রভূত ক্ষমতা অস্বীকাব না কবেই বলছি) সবজেক্টিভ নভেল যে কর্মেব সঙ্গে সম্পর্কশূন্য চিন্তাব সিসমোগ্রাফ মাত্র হযেছিল, সেটা প্রায একটা *cul-de-sac.* তাব আগে আব যাবাব পথ ছিল না পববর্তী লেখকদেব। গ্রীনেব উপন্যাসেব চবিত্রগুলিব জাতই আলাদা। ওরা কাজ কবে। শুধু কাজ কবে নয, এত বেশি কাজ কবে যে যাঁবা শুধু তাঁব প্রথম দু'যেকটা লেখা পড়েছেন, পবেব লেখা পড়েননি, তাঁদেব অনেকেব আজো এই ধাবণা বযে গেছে যে গ্রীন আসলে তৃতীয় শ্রেণীব বোমাঞ্চবচনায দ্বিতীয় শ্রেণীব লেখক।

কথাটা পুবোপুবি মিথ্যা নয। 'দি লিভিং রুম' নাটকে নয (যদিও এখানেও নাযক সাইকো-অ্যানালিস্ট অর্থাৎ মনেব গুপ্তচব এবং ঝি মেবী গুপ্তচবীব কাজ কবেছে), কিন্তু 'দি এণ্ড অব দি এফেযাব' উপন্যাসে পর্যন্ত একজন ডিটেকটিভ আছে। তবু তিনি বেমণ্ড চাণ্ডলাব, ডেশিযেল হ্যামেট, পিটাব চেনি বা ওই শ্রেণীব লেখকেব সঙ্গে তুলনীয নন; কেননা তাব বইতে শুধু crime নেই, তাব চেযে বেশি আছে sin. তিনি নিজেই বলেছেন: "We are saved or damned by our thoughts, not by our actions." তাঁব উপন্যাসে তাই চিন্তা যেমন কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হযে নিষ্ফলা সবজেক্টিভ বোমন্থনে পবিণত হযনি, তেমনি কর্মও চিন্তা থেকে অ-বিচ্ছিন্ন থেকে তাঁব উপন্যাসগুলিকে সস্তা বোমাঞ্চকব থ্রিলাবেব পর্যাযে নামতে দেযনি। তাঁব নাযক-নাযিকা 'অন্যায' কবে এই ভেবে সন্ত্রস্ত হয না যে পুলিশ তাদেব ধবে ফেলবে কিনা; তাদেব প্রধান চিন্তা এই যে, তাবা নিজেদেব বিবেকেব কাছে ধবা পড়ে গিযে এখন ছাড়া পাবে কী কবে। এদেব প্রথম প্রশ্ন দাবোয়ানকে ফাঁকি দিযে দেযাল ডিঙিযে পালানো নয, সে তো সোজা কাজ। গ্রীনের নাযকেব সমস্যা হচ্ছে পুলিশেব হাত থেকে পবিত্রাণ পাওযাব পবে সে নিজেব কাছে নিজেকে সমর্থন কববে কী কবে। অনুতাপ কবে ঈশ্বরের ক্ষমা ভিক্ষা করবে, না শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকে অস্বীকার করে 'ড্যাম্‌ড' হবে?

এর পরে বলাই বাহুল্য যে গ্রেহাম গ্রীন গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক। এই গোঁড়ামি কিন্তু অসহিষ্ণু নয়। আলোচ্য নাটকের ফাদার ব্রাউন জানেন যে বিবাহিত মাইকেল ডেনিস কুমারী পেমবারটনের প্রণয়াসক্ত; তাঁর নিজের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে এ প্রণয় নিতান্ত গর্হিত, তবু তিনি দু'জনকে দোষী সাব্যস্ত করবার আগে ভুলতে পারেন না যে ওদের অবৈধ সম্বন্ধ দুরভিসন্ধিপ্রসূত নয়, যে ওরা না জেনে না ভেবে এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে পা দিয়েছে যা থেকে বেদনাহীন নিষ্কৃতি অসম্ভব। কার বেদনা? গ্রীন অবিচার করেননি। ফাদার ব্রাউন বলেছেন, ডেনিস হৃদয়হীন নয়। প্রণয়িণীকে না পেলে সে ব্যথিত হবে, কিন্তু প্রেমিকাকে গ্রহণ করলে তার স্ত্রীর কী দশা হবে? তার প্রথম দায়িত্ব প্রেমবিক্ত বিবাহের কাছে, না বিবাহবহির্ভূত প্রেমের কাছে? সমস্যাটা আমার কাছে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক: গ্রীনের কাছে নৈতিক। ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান ব্যক্তিগতই হওয়া উচিত: আমার সমাধান অন্যের কাছে অবাস্তব। সামাজিক সমাধান বিবাহ-বিচ্ছেদ।

গ্রীনের নৈতিক সমাধান? রোজ্ পেমবারটনের আত্মহত্যা ও তৎপূর্বে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা। সিদ্ধান্তটি নাটকীয় হিসাবে অসার্থক হয়নি। কিন্তু অন্য যে কোনো বিচারে এর চেয়ে ঘৃণ্যতর সমাধান আমি ভাবতেও পারিনে।

২৯ অক্টোবর ১৯৫৩

পল ভালেরি

আজই ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে যাবে না, আমিও আজকের পরেই বধির হয়ে যাব না। এর পরেও প্রতি সপ্তাহে আমি দেশী-বিদেশী অনেকগুলি বই পড়ব, পাঠান্তে আগেরই মতো মনে বহু কথা জমবে, কিন্তু সেগুলি আর

'দেশ'-এর পাতায় উপচে পড়বে না। অর্থাৎ, এটিই আমার 'প্রতিধ্বনি' পর্যায়ের সর্বশেষ প্রবন্ধ।

এই শেষ পাতার জন্যে পল ভালেরির আত্মাবিষ্কারের কাহিনীটি* আলোচনার উপলক্ষ্য হিসাবে পাওয়া দুর্লভ সৌভাগ্য বলে মনে করি। এমন বইই বিরল। যদি বলি বইটি ভালো, সঙ্গে সঙ্গে যোগ করতে হয় যে, এর ৯৪ পৃষ্ঠার মধ্যে অন্তত দশটি আরো-ভালো বইয়ের অঙ্কুর নিহিত আছে। যদি বলি বইটি মন্দ, সঙ্গে সঙ্গে যোগ করতে হয় যে এমন মন্দ বই দশটা সফল বইয়ের যোগফলের চেয়ে বড়ো। বস্তুত এমন বইয়ের সবই সরাসরি ভালো-মন্দ রায়ের ঊর্ধ্বে। ৯-২-১৯০৭ তারিখে আঁদ্রে জিদ তাঁর জুর্নালে লিখছেন, "ইয়েস্টারডে আই স্পেন্ট অলমোস্ট থ্রি আওয়ার্স উইথ হিম (ভালেরি)। আফটারওয়ার্ড নাথিং ওয়াজ লেফট স্ট্যাণ্ডিং ইন মাই মাইণ্ড।" একটুকু ছোঁয়াতে মনে মনে ফাল্গুনী রচা নয়, প্রায় বলা চলে বর্ষার প্রভঞ্জনকে আবাহন জানানো। গ্রহণক্ষম মনের উপর বইয়ের প্রভাবও সত্যি এত প্রবল হতে পারে, বিশেষ করে লেখক যখন ভালেরির মতো শক্তিমান।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, পল ভালেরি য়ুরোপের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লেওনার্দো দা ভিঞ্চির উত্তরসাধক, সর্বমুখীন সাফল্যে না হলেও বহুমুখীন প্রচেষ্টায়। ফরাসি সাহিত্যে তিনি ভলতেয়ার ও য়ুগোর সঙ্গে তুলিত হয়েছেন। অথচ তাঁর জীবন সম্বন্ধে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে জীবনের বৃহৎ একটা অংশে তিনি শুধু যে কোনো সাহিত্য সৃষ্টি করেননি তাই নয়, সাহিত্যের সার্থকতা সম্বন্ধেই সর্বদা তিনি সন্দেহ পোষণ করতেন। একটিমাত্র জীবনে লেওনার্দোর মতো শুধু সর্বকর্মসমন্বয়ের প্রয়াসই করেননি, সাহিত্য রচনা সম্বন্ধে সরাসরি বলেছেন, "The act of writing always requires a certain "sacrifice of the intellect."

কেন? লেখকের দোষ আছে, সে অক্ষম। পাঠকের দোষ আছে, সে অলস। কিন্তু আসল ভূত শব্দসর্ষের ভিতরে, ভাষারই সাধ্য নেই ভাসা-ভাসা

* *Monsieur Teste* by Paul Valery. Translated by Jackson Mathews. (Peter Owen, London, 18s)

ভাবনার আভাসের চেয়ে নির্দিষ্ট আর কিছু প্রকাশ করবার। নিশ্চেতন না হলে কোন লেখক নিশ্চিন্ত থাকতে পারে ওইটুকু নিয়ে? বুদ্ধি যার ধ্যান, সে কী করে বুদ্ধি বিসর্জন দেবে শিল্পসৃষ্টির মোহে?

ভালেরি তাই দীর্ঘকাল সাহিত্য ছেড়ে গণিত-বিজ্ঞানের সাধনা করেছিলেন, পরে সাহিত্যে ফিরে এসে তাঁর কাব্যে ও গদ্যে গণিতের নির্দিষ্টতা, প্রিসীশন ও দ্ব্যর্থশূন্যতা পুরোপুরি বহাল রাখতে চেয়েছিলেন। তখন তার দেবতা হোলো ক্ল্যারিটি, স্পষ্টতা। নির্দিষ্টভাব অভিব্যক্তির অনুসরণে রচনার সাবলীলতা ব্যাহত হতে পারে, এমন কি স্পষ্টতাও ক্ষুণ্ণ হতে পারে ('ম. টেস্ট'-এর বহু অংশ দুর্বোধ), তবু সাহিত্য শুধুমাত্র ভাববিলাস না হয়ে সংহত চিন্তার বাহন হতে চাইলে বুদ্ধিপ্রধান লেখকদের অন্তত এই সংযম মেনে নিতেই হবে। নইলে সাহিত্যের প্রধান একটা অংশ দীন থাকবে।

বুদ্ধিপ্রধান নয়, বুদ্ধিসর্বস্ব অস্তিত্ব—এই হোলো ভালেরির দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা, এবং ম. টেস্ট চরিত্রটি এই ধারণারই প্রতীক। তাকে জানি তাঁর বন্ধুর বর্ণনায়, তাঁর নিজের বিবরণে কিন্তু তিনি সব চেয়ে জীবন্ত তাঁর স্ত্রীর জবানীতে। মাদাম টেস্ট বলছেন 'হিজ হেড ইজ এ সালূড্ টেম্পার, অ্যাণ্ড আই ডোণ্ট নো হোয়েদার হি হ্যাজ এ হার্ট।' এমন মানুষও কি সম্ভব? ভালেরি নিজে টেস্টকে 'দানব' আখ্যা দিয়েছেন। সম্ভব হলেও এমন জীব যে একান্ত অসম্পূর্ণ ও নিতান্ত অসুন্দর তাতে সন্দেহ নেই। ভালেরি নিজেও তা অস্বীকার করেননি।

জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে, বাঁচা ও ভাবার মধ্যে টেস্ট যে বিরোধটি স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েছেন সেটা কারো কারো কাছে অতিকৃত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সাধনায় একনিষ্ঠ হতে হলে একটিকে গ্রহণ করে অপরটিকে অবহেলা না করে সত্যি বোধহয় উপায় নেই। দুই সতীন নিয়ে ঘর করা নিশ্চয়ই অসম্ভব নয় কিন্তু একই সময়ে দু'জনকে সমান ভালোবাসা কি সম্ভব? না কি তেমন সমন্বয়ে একনিষ্ঠতার পরিচয় আছে?

পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসীর জীবনই হৃদয় ও মস্তিষ্কের দ্বন্দ্বের অচেতন সন্ধির তৃপ্ত সন্তান। তাই যেন থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে এমনও যেন

দু'একজন লোক থাকে যাদের সদাসজাগ নিষ্ঠাবোধ শাস্তিদায়ী সন্ধি প্রত্যাখ্যান করে একটিকে বেছে নিয়ে নিজের জীবন অভিশপ্ত ও অসম্পূর্ণ করবে, কিন্তু সেই চেষ্টার ফলে মানবজাতির জীবনের পরিধি আরেকটু প্রসারিত করে দিয়ে যাবে। ম টেস্ট, ওরফে পল ভালেরি, এই চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর বইয়ের প্রথম বাক্যই তাই, Stupidity is not my strong point. নিতান্ত স্বার্থপর কারণেই ভালেরির এই অক্ষমতার প্রতি আমি সর্বান্তঃকরণে সহানুভূতিশীল।

শেষ করবার আগেও তাই বেশি লোকের কাছ থেকে সহানুভূতি প্রত্যাশা করিনে, কেননা আমেরিকায় সেনেটর ম্যাকার্থি বই পুড়িয়ে বইয়ের যে অবমাননা করেন, আমরা বাঙলা দেশে বই না পড়ে বইয়ের প্রতি সহস্রগুণ বেশি অপমান নিত্য করছি।

'এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভৎর্সনা।'

২৭ জুন, ১৯৫৩

শব্দ ও অর্থ

লেনিন বলতেন, ধনতন্ত্রের ধ্বংস-সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে তার কারেন্সির মূল্যহরণ। মুদ্রাস্ফীতির অর্থ হচ্ছে মূল্যের সঙ্কোচন। টাকা টাকাই রয়ে গেল, কিন্তু তার দাম হয়ে গেল আট আনা; কেননা আগে আট আনায় যা পাওয়া যেতো এখন তা পুরো একটি টাকা দিয়ে কিনতে হয়। জিনিসের দাম যেমন টাকা দিয়ে নির্ণীত হয়, তেমনি টাকারও দাম নির্ধারিত হয় তার ক্রয়-ক্ষমতার মান দিয়ে। অর্থাৎ ক'টা কড়ির বিনিময়ে ক'টা জিনিস পাওয়া গেল, তাই দিয়ে। দুটি মহাযুদ্ধের কল্যাণে মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছে, অতএব বিস্তৃততর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া অর্থনীতিতে আমার স্বেচ্ছাকৌতূহল একান্ত পরিমিত।

কিন্তু শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমি সবিশেষ উৎসাহী। এই সাহিত্যিক অর্থনীতি ও টাকার কথায় আমার মনে সংযোগ সাধন করেছেন সীরিল কনলি। তিনি বলেছেন, লেখকের শব্দসম্ভার হচ্ছে তার কারেন্সি। কিন্তু এটা কাগজী কারেন্সি, অর্থাৎ নোটের কোনো মূল্যই নেই যদি না তার

পশ্চাতে সমপরিমাণ স্বর্ণ বা অন্যান্য বিনিময়যোগ্য ঐশ্বর্য থাকে। লেখকের বেলায় সেই স্বর্ণ হচ্ছে শব্দের অর্থ। টাকার নোটের মূল্যহ্রাস ঘটলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় ঘটে, সাহিত্যেও অর্থহীন শব্দের অতি-প্রচলন ঘটলে অনুরূপ বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্যের শত্রুরা তাই সর্বদা সচেষ্ট থাকে শব্দ থেকে তার অর্থ চুরি করে নিতে। স্বর্ণ দুর্লভ না হয়ে সহজলভ্য ধাতু হলে যেমন স্বর্ণের মান হতে পারতো না তেমনি শব্দেরও সুলভতা তার অর্থহানি ঘটাতে সাহায্য করে। মুদ্রাস্ফীতি যেমন তার মূল্যাপহারী, তেমনি শব্দবাহুল্য তার অর্থাপহারী।

বাক্-কারেন্সিতে এই ইংফ্লেশন আমরা নিয়তই দেখছি। ভাষার এই উদরী রোগ হয় প্রধানত দুটি কারণ: এক কথার অতিব্যবহার; আর দুই শব্দের অপব্যবহার। প্রথমটির অনুষ্ঠাতা সাধারণত লেখক ও সাংবাদিকরা। দ্বিতীয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পলিটিশিয়ানদের অজ্ঞান অথবা সজ্ঞান ষড়যন্ত্র।

অনাচার না করেও যেমন কখনো কখনো কঠিন ব্যাধি হতে পারে তেমনি লেখকদের চিন্তাহীনতা ও রাজনৈতিক নেতাদের ষড়যন্ত্র বাদেও বাক্যোৎসার ঘটা অসম্ভব নয়। শব্দের [illegible] ধুলা জমে শব্দ [illegible] ঘসার মতো ক্ষয়ে যায়। অলডাস হাক্সলের 'আইলেস ইন গ্যাজা' বইতে টোনি বীভস ভাবছে: "সমস্যা হচ্ছে কী করে ভালোবাসা যায়। (আবার ওই 'ভালোবাসা' কথাটাই সন্দেহজনক—বংশপরম্পরা। [illegible]নসুরা কথাটির ব্যবহার করে ওকে মলিন ও তৈলাক্ত করে দিয়েছে। ময়লা কাপড়ের মতো, মলিন শব্দ-রাশিরও ধোবাবাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ওই যে এক রাশ শব্দ পড়ে আছে—প্রেম, পবিত্রতা, সততা, আত্মা। শব্দের জন্যে সত্যি লন্ড্রি থাকা উচিত; কিন্তু তা যতদিন না হচ্ছে ততদিন শব্দ নিয়ে যাদের কাজ, অর্থাৎ লেখকরা, তাদের উচিত ওগুলিকে সযত্নে ব্যবহার করা, যাতে যতদিন সম্ভব শব্দগুলি পরিহার্য অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

রাজনীতিক বক্তাদের অশুচি স্পর্শে শব্দ যে প্রতিদিন অর্থহীন হয়ে পড়ছে তার দৃষ্টান্ত এমনই অগণিত যে তা নিশ্চয়ই আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার

অন্তর্ভুক্ত। 'স্বরাজ' কথাটা আমার ছেলেবেলায় আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ছিল। আর আজ? দুরন্ত শিশুকে শাসন করতে গিয়ে বাবারা বলেন, 'স্বরাজ পেয়েছিস বুঝি?' জনমত, স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, গণতন্ত্র, জন্মভূমি, ইত্যাদি শব্দগুলি কারণে অকারণে এত অসংখ্য সাবানের বাক্সের উপর থেকে এত অসংখ্যবার ঘোষিত হয়েছে যে এদের মূল অর্থ কখন হাওয়ার উবে গেছে। আজ শুধু বাকি আছে ধ্বনিটা, যা শুনলে শ্রোতার প্রাণে বিন্দুমাত্র প্রতিধ্বনি জাগে না, কান শুধু লাঞ্ছিত হয়। এমনি অপমৃত্যু ঘটেছে, মহাত্মা' কথাটির। শুধু যদি যোগ্য ব্যক্তিকে এই আখ্যা দেয়া হোতো তাহলে এর ব্যবহার অল্প কয়েকজনের মধ্যে নিবদ্ধ থাকতো এবং শব্দটির অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকতো—যেমন আছে ইংরেজি 'সেন্ট' কথাটির, কেননা তা যদৃচ্ছ ব্যবহৃত হয়নি। শব্দোৎসারের এই দিকটি ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেছি কেননা পলিটিশানদের অভিসন্ধিই হচ্ছে আমাদের চিন্তা বিভ্রান্ত করে দিয়ে আমাদের উপর তাদের ইচ্ছা আরোপ করা এবং আমাদের চিন্তাশক্তি পঙ্গু করে দিয়ে শান্ত সুবোধ বালকে পরিণত করা।

আরো দুঃখের কারণ ঘটে যখন শক্তিমান লেখকরাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শব্দের এই অর্থহরণের অপকার্যে সাহায্য করেন। শৈলেন রায় বা প্রণব রায় যখন নিজেদের নামের আগে 'কবি' কথাটি স্থাপন করেন তখন তার উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার। না বলে দিলে সত্যি হয়তো ভুল হবার আশঙ্কা ছিল। আর আমরাও যখন বিজ্ঞাপন বেআইনী করিনি তখন সাবান বা শাড়ির মতো কেউ যদি তার রচনার জন্যেও বিজ্ঞাপন দিয়ে বাজার খোঁজে তার জন্যে দোষ দিতে পারিনে। কিন্তু জীবিকার্জনের জন্যে আত্মবিজ্ঞাপনের এই অভিসন্ধি যখন অনুপস্থিত, তখন কথাটির অপব্যবহার আরো অসমর্থনীয় হয়ে পড়ে। আমার মতে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে 'কবি' কথাটির প্রয়োগের পরে 'কবি' কথাটির সুনির্দিষ্ট আর কোনো অর্থ রইল না।*

* অস্কার ওয়াইল্ডও বোধহয় যীশু খৃষ্টকে 'কবি' আখ্যা দিয়েছিলেন। আমি তারও সমান অসমর্থক।

'চলন্তিকা' অভিধানে দেখছি 'কবি' কথাটির অর্থ কাব্যরচয়িতা। অর্থাৎ কবি বলে পরিগণিত হতে হলে কাব্য রচনা করতে হবে। শুধু ভাবলে চলবে না এমন-কি অন্যতর ক্ষেত্রে অপরিসীম সাফল্যও যথেষ্ট নয়। ভগবৎ-সাধনায় সিদ্ধ হলে তিনি সাধক বলে খ্যাত হবেন, ধর্ম স্থাপন করলে তিনি ধর্মগুরু বলে সম্মানিত হবেন, এমন কি স্বয়ং ভগবানের অবতার বলে পুষ্পচন্দনে পূজিত হবেন। কিন্তু কবি বলে ফুলের মালা পেতে হলে তাঁকে কাগজ কলম নিয়ে কাব্য রচনা করতে হবে।

কবির সংজ্ঞা এতে সঙ্কীর্ণ হোলো বুঝি? কিন্তু লজিক নামক শাস্ত্রের সঙ্গে যাঁর সামান্যতম পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে সংজ্ঞার কাজই হচ্ছে ব্যাপক সাধারণ থেকে সংজ্ঞা বিশেষকে বিভিন্ন বলে চিহ্নিত করা, অর্থাৎ কোনো একটি বস্তু বা ব্যক্তিকে তার বৃহৎ পরিবেশ থেকে সঙ্কীর্ণ করে দেখিয়ে বস্তু বা ব্যক্তির স্বকীয় বিশেষত্বটি পরিস্ফুট করা। অক্সফোর্ড অভিধানে 'ডেফিনিশন' কথাটির মানেই দেওয়া আছে: সীমা নির্দেশ করা।

এই তথাকথিত সঙ্কীর্ণতা বিসর্জন দিয়ে শব্দব্যবহারে আমরা উদার হতে গেলে শব্দের উন্নতি বোধ হয় অসম্ভাব্য।

২২ নভেম্বর, ১৯৫২

আকাদমি

কিছুদিন আগে 'অ্যাকাডেমি' কথাটার কোনো ভারতীয় প্রতিশব্দ খুঁজে না পেয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ওই বিদেশী শব্দটারই একটা ভারতীয় বিকৃতির প্রচলন আমাদের মেনে নিতে বলেছিলেন। কথাটা আকাদমি বা অকাদমি কোনো উদ্ভট অসুন্দর শব্দ। তখন ভেবেছিলুম, থাক নামে বিকৃতি। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সুষ্ঠু হলে নাম নিয়ে অভিযোগ করব না। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলে সে নিজেই একদিন কানা নাম ঘুচিয়ে দিয়ে পদ্মলোচন হতে পারবে।

এবারে যখন সাহিত্যের জন্যে আকাদমি সৃষ্টি হতে চলেছে তখন আমাদের ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করবার কথা। সংস্থাটির সংগঠন বা কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু এখনো ঘোষিত হয় নি। আপাতত আনন্দের একটা কারণ এই যে আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে চলেছি যা ইংরেজদের অনুকরণ নয়। বস্তুত, ইংল্যাণ্ডে অ্যাকাডেমি অব লেটারস জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানই নেই।

ম্যাথ্যু আর্নল্ড চেয়েছিলেন তেমন একটি সংস্থা। অর্ধশিক্ষিত ও লঘুরুচি জনগণের সংক্রামণ থেকে সংস্কৃতির শুচিতা ও আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে ওই ছিল তাঁর প্রস্তাব। তাঁর "এসে অন দি লিটরেরি ইনফ্লুয়েন্স অব অ্যাকাডেমিস' তাই ফরাসি অ্যাকাদেমির অবিমিশ্র প্রশংসা। তাঁর ধারণা ছিল যে, একটা সুপ্রীম কোর্ট না থাকলে ন্যায় ব্যবস্থা যেমন তথাকথিত রাজীব বিচার বা নির্জলা অরাজকতায় পর্যবসিত হয়, সাহিত্য-বিচারেও তেমনি একটা চরম আদালত (অ্যাকাদেমি) না থাকলে চতুর্দিকে নৈরাজ্যের প্রশ্রয় আর রুচিহীনতার প্রসার অবশ্যম্ভাবী। ফরাসি সাহিত্যের অবিসম্বাদী উৎকর্ষ আর মুক্তমানসের উৎস, আর্নল্ডের মতে, ওই ফরাসি অ্যাকাডেমি।

ফরাসি অ্যাকাডেমির জন্ম যদিও ১৬২৯ খৃস্টাব্দে, কার্ডিনাল রিশল্যু এই প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁর আশীর্বাদ দেন ছ'বছর পরে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফরাসি ভাষার সংস্কারসাধন। অ্যাকাডেমির নিয়মাবলীর চতুর্বিংশ ধারায় লেখা ছিল: "অ্যাকাদেমির মুখ্য উদ্দেশ্য হবে সবপ্রকার শ্রম ও যত্নের সঙ্গে আমাদের ভাষার (ফরাসির) জন্যে এমন সব নিয়ম বেঁধে দেয়া যাতে ভাষাটি পবিত্র ও মুখর হয়ে শিল্প ও বিজ্ঞানের সেবায় সর্বাঙ্গীণভাবে সমর্থ হবে। তাঁদের কাজ হবে "সাধারণ লোকের মুখে, উকিল-মোক্তারের বক্তৃতায় পরিষদের অজ্ঞতায়, গীর্জার অপব্যবহারে ফরাসি ভাষায় যে অপবিত্রতা প্রবেশ করেছে তার দূরীকরণ।" অ্যাকাডেমির একজন বিখ্যাত সদস্য, রেনাঁ, তার অনেক দিন পরে বলেছেন: *"Ils ont fait un chef-d'oeuvre—la langue francaise."*

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ফরাসি অ্যাকাডেমির বিবেচ্যতালিকায় প্রথম স্থান ছিল ভাষার, সাহিত্যের নয়।

ফরাসি অ্যাকাডেমির ভারতীয় সংস্করণে কী হবে জানিনে; লজ্জার কথা, ভারতের অন্যান্য ভাষারও খবর জানিনে; কিন্তু আমি প্রায় সবপ্রকার সংস্থাবিরোধী হয়েও মনে করি যে অন্তত বাংলা ভাষার জন্যে এমন একটি অ্যাকাডেমির প্রয়োজন আছে যা ব্যাকরণ বানান ও সাধুপ্রয়োগ সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও স্বীকৃত নির্দেশ দেবে এবং সে অনুশাসন সকল বাংলা লেখক সানন্দে মেনে নেবেন। আমার আনুগত্য আমি অগ্রিম জানিয়ে রাখলুম।

মুদ্রার মূল্য যদি প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কাছে ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে যেমন বাণিজ্য অসম্ভব, তেমনি শব্দের বেলায়ও নির্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগপদ্ধতি সর্বজনস্বীকৃত না হলে চিন্তার বিনিময় অসম্ভব। সাহিত্যের কল্যাণের জন্যেই লেখকের স্বাধীনতার এই স্বেচ্ছাসংকোচন প্রয়োজন, তা নইলে লেখক বলবেন এক কথা আর পাঠকবর্গ বুঝবেন অন্য। লেখকদেরই স্বার্থে রচনার শুচিতারক্ষা প্রয়োজন। কোনো অজ্ঞান অপপ্রয়োগ হলে আর সকল লেখকদের অপবাদই তার শাস্তিবিধান হবে, সুষ্ঠু প্রয়োগ হলে আর সবাই তা সানন্দে গ্রহণ করে নেবেন। ইংরেজির স্বাধীনতা বাইরে পাঠাবার নয়। লণ্ডনের পুলিশের হাতে না থাকে লাঠি, না পিস্তল। কলকাতায় তা অচল। বাংলা সাহিত্যেও তাই আমি ইংরেজি দৃষ্টান্তের চেয়ে ফরাসিটা বিধেয় বলে মনে করি।

কিন্তু ফরাসি অ্যাকাডেমিরও সমালোচকের অভাব নেই। পি লাঁফ্রে বলেছেন, অ্যাকাডেমির জন্ম রাজানুগ্রহে তাই সর্বদা সে সরকারের মিত্র। রাজগৃহের দলাদলি ও প্রিয়পোষণ এই প্রতিষ্ঠানের মজ্জাগত। অসাহিত্যিক নানা বিবেচনায় এখানে সাহিত্যিক রায় নিরূপিত হয়। সদস্যরা সাহিত্যের সত্যকার উন্নতিসাধন অবহেলা করে সর্বদা শুধু নিয়োজিত থাকেন পুরস্কারবিতরণে। এতে চাটুকারিতা প্রশ্রয় পায়। এই অ্যাকাডেমির কাজই হচ্ছে প্রতিভার সিংহদের প্রশংসার আফিম খাইয়ে শান্তশিষ্ট

মেষশাবকে পবিণত কবা, বিদ্রোহী স্পৃহাব বিনাশ কবা। এব দৃষ্টিভঙ্গী সর্বদা বক্ষণশীল, নতুন সবকিছুব প্রতি এব সন্দেহী বিরূপতা। ফবাসি প্রতিভাব উপব এই অ্যাকাদেমিব প্রভাব আলোচনা কবলে দেখা যাবে যে ফবাসি ভাষাকে সে দিয়েছে অভূতপূর্ব ঔজ্জ্বল্য পবিচ্ছন্নতা ও প্রয়োগবিস্তৃতি; কিন্তু সেই সঙ্গে বিদায় নিয়েছে ফবাসি ভাষাব পৌরুষ, তাব মৌলিকতা অকৃত্রিমতা, শক্তি আব স্বভাবমাধুবী। অ্যাকাডেমিব নিয়মাবলীব শৃঙ্খলে বাঁধা ফবাসি ভাষা দীন। অ্যাকাদেমিব কাছে সুরুচিব অর্থ সৌন্দর্য নয়, শুদ্ধতা; শুধু একটা বকমেব শালীনতা।

দলাদলি প্রেমপ্রণয় ও অকস্মাৎ নির্বাচন সম্বন্ধে লাঁক্রেব নিন্দা ভাবতীয় আকাদেমি স্মবণ বাখবেন আশা কবি; কিন্তু তাব অন্যান্য অভিযোগগুলি বুঝিনে। সৌন্দর্য আব শুদ্ধতা নিশ্চয়ই পবস্পববিবোধী নয়। ঔজ্জ্বল্য, পবিচ্ছন্নতা ও শালীনতা নিশ্চয়ই নিন্দাব বিষয় নয়। ভাষাব পৌরুষ মানে কি আদিমতা? না, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং প্রাণ। তাহলে যে আকাদেমি ভাষাকে প্রয়োগবিস্তৃতি (ভ্রোকাবিলিটি) দিয়েছে, তাকে শৃঙ্খল আখ্যা দেয়া কেন?

বেশ কথা, নিয়ম তো প্রতিভাব জন্য নয়। তাব প্রয়োজন আব সকলেব জন্য। এই যেমন এখন আমবা যাবা বাংলা লিখি তাদেব জন্যে।

২ মে ১৯৫৩

সিরিল জোড

ডক্টব জোড-এব মৃত্যুতে আমাব মর্মাহত হবাব প্রথম কাবণটা ব্যক্তিগত। একবাব আমাব এই গুরুজনেব একটি বক্তৃতা শোনবাব সুযোগ হয়েছিল।

জোড-এব মৃত্যুতে যে ব্যাপকতব শোক হবে, তাব কাবণ বহুলাংশে সামাজিক। দর্শনেব নানা দুরূহ তত্ত্ব তিনি প্রাঞ্জল ও সর্বজনবোধ্য সহজ

ইংরেজিতে পরিবেষণ করে কত লক্ষ লক্ষ অনুসন্ধিৎসু অপণ্ডিতকে ঋণী করেছেন তার সংখ্যা নেই। দর্শনের সব কথা তাতে বলা হয়নি। দুরূহতা পরিহার করলে দর্শনের অল্পবিস্তর বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। *Pace* পরমপুরুষ, বিশ্বের সব রহস্য সত্যি দুটো গ্রাম্য উপমা দিয়ে ব্যাখ্যাসাধ্য নয়। জোড্ জানতেন সেকথা। তিনি জানতেন যে এমন তত্ত্ব আছে যা আপন স্বভাবেই দুরূহ। তার বিবাদ ছিল তাঁদের সঙ্গে যাঁরা বিষয়ের দুরূহতা ছাড়াও আলস্য বা অক্ষমতার জন্যে প্রকাশে প্রাঞ্জল না হয়ে অনাবশ্যকভাবে দুর্বোধ; যাঁদের ধারণা গুরুতর বিষয় সহজ করলেই বিষয়ের গুরুত্বের লাঘব হয়।

এই মনোবৃত্তির সঙ্গে ভারতবর্ষে আমরা অপরিচিত নই। দক্ষিণ ভারতে শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের ভয়ানক ও দীর্ঘ বিবাদের আজো মীমাংসা হয় নি, প্রিভি কাউন্সিলে যাবার পরেও। বিবাদটা প্রধানতঃ এই নিয়ে যে সে মন্দিরের মন্ত্রপাঠ সংস্কৃতে হবে (যা বেশির ভাগ উপাসক বুঝবে না), না তামিলে হবে (যা সবাই বুঝবে)। বাংলা দেশেও অনুরূপ বিতর্ক অজানা নয়।

দর্শনশাস্ত্রের মন্দিরে জোড্ শুধু বক্তৃতার দ্বারা সহজ ইংরেজিতে মন্ত্র পড়েননি, সে মন্দিরের দরজাও অস্পৃশ্য অব্রাহ্মণদের জন্যে অবারিত করে দিয়েছিলেন। ফলে দর্শনের সেই শ্রীক্ষেত্রে ভীড় বেড়েছে। সে ভীড়ের সবাই যে রথ দেখতে যায়নি, কেউ কেউ গেছে শুধু কলা বেচতে (অর্থাৎ দার্শনিক বুলি কুড়োতে) তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু জোডের উপর ক্ষতির চাইতে লাভ বেশি হয়েছে।

সাধারণ্যের হাটে দর্শনের ক্ষুদ্রবিক্রেতা হয়ে জোড্কে কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি বামুন পণ্ডিতদের হাতে। এ যেন পেশাদার যাদুকর হয়ে ম্যাজিক সম্বন্ধে বই লিখে ব্যবসার সব গোপন তথ্য বিনামূল্যে বিলিয়ে দেয়া। এ যেন কামারের ছেলেদের সলিসিটর হতে আমন্ত্রণ করা, যাকে-তাকে 'বশিষ্ট ক্লাবে সভ্য হবার অধিকার দেয়া। ('It is not done !')। এতে দর্শকের কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ মিললেও, দার্শনিকদের অপবাদ না কুড়িয়ে নিস্তার নেই।

দার্শনিকদের এই হবলিকসের মতো 'হস্ত দ্বারা অস্পৃষ্ট' থাকবার বাসনাটা সত্যি তেমন প্রাচীন নয়। চশমা কপালে তুলে সারা বাড়ি চশমা খোঁজা

সত্যি সব সময় সব দার্শনিকের মজ্জাগত অভ্যাস ছিল না। তাঁরা অনেকে বিচক্ষণ সংসারী ছিলেন, কেউই সমসাময়িক সমস্যার প্রতি পুরোপুরি উদাসীন ছিলেন না। সক্রেটিস প্রয়োজন হলে অস্ত্রধারণ করেছিলেন, অ্যারিস্টটল গৃহশিক্ষক ছিলেন, লক ছিলেন ডাক্তার। তাঁরা সবাই সব রকম মানুষের সঙ্গে সমানভাবে মেলামেশা করে পুরোপুরি সামাজিক জীবন যাপন করেছেন। কেউই নিজেকে নিকট পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিযে স্বেচ্ছানির্বাসনে যাননি।

ঠিক কবে জানিনে, এ অবস্থার বিরাট একটা পরিবর্তন হোলো। দার্শনিক আর বাকি সবাই বিচ্ছিন্ন হযে পড়ল। অথচ দর্শনের বিষয়বস্তুই হচ্ছে মানুষ, তার সমাজ, তাব জীবন, তার জীবনের অর্থ (if any)। তাই দর্শনের সঙ্গে জীবনের বিচ্ছেদ ঘটলে উভযেবই ক্ষতি। জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে দর্শন কিযদংশে পঙ্গু হয়, দর্শনের নেতৃত্ব হারালে জীবন অগোছালো হয়। 'ডেকেডেনস্' বইতে (১৯৪৮) তাই বর্তমান সংকটে দার্শনিকের যে ভূমিকার নির্দেশ জোড দিয়েছিলেন তার অনেকখানি তাঁর নিজের জীবনে তিনি অভ্যাস করেছিলেন।

দর্শনে জোডের মৌলিক দান অপ্রচুর, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইবের জগতে তাঁর প্রভাব এত ব্যাপক ছিল যে এদিক থেকে একমাত্র রাসেল ব্যতীত তুলনীয় কোনো জীবিত দার্শনিকের কথা স্মরণ করতে পারিনে। দৈনন্দিন জীবনে চিরন্তন দর্শনের প্রয়োগের জন্যে এঁদের চেয়ে বেশি চেষ্টা সম্প্রতি কেউ করেননি।

কিন্তু এই দুই দার্শনিকের নিজেদের জীবনে দর্শনের প্রভাব আবিষ্কার করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হতে হয়। প্রচলিত অর্থে রাসেল বা জোড কারো জীবনই সত্যি সংহত বা সুসমঞ্জস নয়। জীবনের সঙ্গিনী-নির্বাচনে দু'জনকেই একাধিকবার ভ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। জোডকে একবার জরিমানা দিতে হয়েছে বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ বা অমনি কোনো অপরাধে। দুজনেরই জীবনে কিঞ্চিৎ শৃঙ্খলার অভাব লক্ষ্য না করে উপায় নেই। দার্শনিকদের জীবনে এটা কিছুটা বিস্ময়কর, যদিও শিল্পীদের জীবনে এমন ঘটনা আদৌ দুর্লভ নয়।

শুধু জীবনে নয়, জোডের দর্শন-চর্চায়ও কিছুটা শিল্পের ছোঁয়াচ লেগেছিল। তাঁর রচনার সরস প্রাঞ্জলতার উৎসও সেখানেই। তাই তাঁর কৌতূহল কতগুলি বিমূর্ত স্থত্রতে কখনো নিবদ্ধ থাকেনি, সহস্র সামান্ত নরনারীব সাধারণ সমস্তার সমাধানে দর্শনের প্রযোজ্যতা প্রমাণ করাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাই তিনি বি বি সি থেকে জনৃকে উপদেশ দিয়েছেন, সে ডাক্তার হবে না উকিল হবে; 'সাণ্ডে ডেসপ্যাচ' কাগজে পেগীকে পরামর্শ দিয়েছেন, তার বর নির্বাচনে কোন কোন কথা স্মরণ রাখা উচিত; ফেবিয়ান সামার স্কুলে সমাজতন্ত্রের নীতিকথা শুনিয়েছেন অস্নাতকদের। উদ্দাম ও বহুমুখীন বাঁচায় সারাজীবন সন্ধান করেছেন বাঁচার অর্থ।

অর্থ কি পেয়েছিলেন? তাঁর শেষ বই 'দি রিকভারি অব্ বিলীফ্'—বিশ্বাসেন পুনঃপ্রাপ্তি। ওটা বিশ্বাসের কোলে ক্লান্ত সন্ধানীর অবসন্ন আত্মসমর্পণ। জিজ্ঞাসার উত্তর নয়. জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি। শ্রান্তির পরে শান্তি। আইনের চোখে শুনেছি মানুষের সর্বশেষ ইচ্ছাই শুধু গ্রহণযোগ্য; দার্শনিকের বেলাব কিন্তু মৃত্যুর আসন্নতায় চিন্তিত সিদ্ধান্তের, যেমন জোডের পুনর্লব্ধ বিশ্বাসের, মূল্য আমি প্রশ্নের অতীত বলে মনে করিনে।

১৮ এপ্রিল, ১৯৫৩

বসু, রাজশেখর ও বুদ্ধদেব

রাজশেখর বসুর সম্বন্ধে আমার বিনীত অভিযোগ ছিল এই যে, প্রবীণ কৌষিক হিসাবে নবীন লেখকদের প্রতি তাঁর কর্তব্য তিনি নিয়মিতভাবে যথোচিত কঠোরতার সঙ্গে সম্পাদন করেন নি। বুদ্ধদেব বসুর বিরুদ্ধে আমার প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে. তিনি তাঁর পূর্বতন প্রতিবাদী বিদ্রোহিতা পরিহার করে উত্তরতিরিশেই সাহিত্যিক বানপ্রস্থে গমন করেছেন। আমরা যারা আরো অনেক পরে লিখতে শুরু করেছি তাদের তাই কৃতজ্ঞ হবার কারণ আছে যে, "দেশ" পত্রিকায় দুজনই সম্প্রতি স্ব স্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

ঔদ্ধত্য না হলে বলি, রাজশেখর বসুর প্রবন্ধটি এমনিতেই একটি আদর্শ রচনা বলে সম্মানিত হওয়া উচিত এবং অনুকরণের অভিসন্ধি নিয়েও এ লেখা একাধিকবার পাঠ করলে কারো (বুদ্ধদেব বসুরও) ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। এমন গদ্যের বর্ণনায় "ঠোঁটকাটা" বা "হালকা" এই দুটি বিশেষণই প্রশংসার্থে ব্যবহৃত হলেও বিশেষ অপপ্রযুক্ত বলে মনে করি। এমন গদ্য প্রথমত গদ্য এবং দ্বিতীয়ত বাঙলা,—আর এই দুই গুণই যে অধিকাংশ আধুনিক বাঙলা রচনায় (যেমন আমার) বিরল তা নিয়ে বাগবিস্তার অনাবশ্যক।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১৮ বৈশাখের "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রসঙ্গত লিখেছিলেন, "আমাদের বর্তমান বাঙ্গালা গদ্যপদ্য অনুচিকীর্ষার বনিয়াদের উপর বিন্যস্ত, খোশখেয়ালের অত্যাচারে সদাপীড়িত, ইহার বাঁধন ছাঁদন নাই।" বিয়াল্লিশ বছর পরেও বর্তমান বাঙলা গদ্যের বৃহদংশ সম্বন্ধে উল্লিখিত মন্তব্যটি আমি অত্যধিক কঠোর বলে মনে করিনে। এই অনুন্নতির মূলে যদি শুধু অক্ষমতা থাকতো, তাহলে তাই নিয়ে বিলাপ করলে ও বিধাতাকে অভিশাপ দিলেই যথেষ্ট হোতো। কিন্তু আমার ধারণা, এর আসল কারণ অযত্ন ও অবহেলা। সচেতন অক্ষমতার সঙ্গে সাধারণত একটু বিনয় থাকে ; অক্ষম ব্যক্তি জানে যে, সে যা করে তার চেয়ে ভালো করা সম্ভব ; কিন্তু অযত্ন ও অবহেলার সঙ্গে অবিনয় ও অনীহা যুক্ত হলে সংশোধনের ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

ফাউলার যেমন অসংখ্য নিয়ম বেঁধে দিয়েও পণ্ডিতী আতিশয্যের নিন্দা করতে দ্বিধা করেননি, রাজশেখর বসুও তেমনি উদারভাবে অনেক কিছু 'মেনে নিতে' বলেছেন। কিন্তু ব্যতিক্রম থাকবে বলে আইন করাই বেআইনী হবে, এমন অব্যবস্থা মানতে আমি 'সীমাহীনরূপে অক্ষম'। What a word! Bobby, shoot him!

অবশ্য বুদ্ধদেব বসু এমন কথা বলেননি। কিন্তু তিনি বলেছেন, "অবশ্য আমি ব্যাকরণ জানি না...।" এই বাক্যটির মধ্যে ভাষাগত উচ্ছৃংখলতার প্রশ্রয় নিহিত আছে। প্রায় যে কোনো লেখকের পক্ষেই 'ব্যাকরণ জানি' এমন উক্তি দুঃসাহসিক হঠকারিতা হোতো। ভুল আমরা কে করিনে? তাহলেও এই

নিঃসঙ্কোচ ঘোষণাটির মধ্যে এমন যেন একটা ইঙ্গিত আছে যে, ব্যাকরণ না জানা কোনো লেখকের পক্ষে আদৌ অগৌরবের নয়, যেন ভাষার ব্যাকরণ শিখতে চেষ্টা করলে সাহিত্যিকতা ক্ষুণ্ণ হোতো, সাহিত্য-সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ততা ব্যাহত হোতো।

এই ধারণাটি আমি অত্যন্ত ব্যাপক ও নিতান্ত ভ্রান্ত বলে মনে করি। একটা ভাষার ব্যাকরণ শিখব না অথচ সে ভাষায় বই (আশি খানা!) লিখব, তাল কাকে বলে জানব না তবু গান গাইব, সোজা একটা লাইন টানতে পারব না, তবু ছবি আঁকব—এ যেন এমন দাবী যে, রাস্তায় লাল আলোর তাৎপর্য জানব না তবু গাডি চালাব, অ্যানাটমি শিখব না কিন্তু সার্জারি করব; ট্রেজারি বিল আর ট্রাম-টিকিটে প্রভেদ জানব না তবু অর্থমন্ত্রী হবো। প্রতিভাবান দু'চার জন ব্যক্তি যে কোনো শিক্ষা ব্যতিরেকে অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি করেছেন, তাঁদের দৃষ্টান্ত আমার অজানা নেই; কিন্তু ভাষার ভার কি সত্যি তাঁদের হাতে ছেড়ে দেয়া সমীচীন? রোগমুক্তির জন্যে স্বপ্নলব্ধ মাদুলী যেমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফল হলেও মূলত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ও অনির্ভরযোগ্য, তেমনি ভাষা-গঠনের জন্যেও বিধিদত্ত প্রেরণার চাইতে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানই আমি শ্রেয় বলে মনে করি।

তবে বাঙলা রচনায় যে নব 'সহজিয়া' তত্ত্বের আন্দোলন শুরু হয়েছে—অর্থাৎ সব কিছু সহজ করে লিখতে হবে—বুদ্ধদেব বসু তার প্রতিবাদ করে সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই শুধু পুনর্ঘোষণা করেননি, পাঠকসমাজকেও বিরাট অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আমার পাঠককে আমি এমন মূর্খ বলে মনে করব কোন অধিকারে যে, মনোসিলেবলের বাড়া আর কিছু লিখলেই তা তাঁর বোধগম্য হবে না? পাঠকদের পক্ষ থেকে এই নীতির প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সি ই মণ্টেগ্যু তাঁর "ওনলি টু ক্লিয়ার" প্রবন্ধে ("এ রাইটার'স নোটস অন হিজ ট্রেড")। আমি নিজে কখনো কোনো একটা শক্ত কথা লিখে তা কেটে দিইনি শুধু এই কথা ভেবে যে, কোনো পাঠক হয়তো তা বুঝবেন না। আমি ধরে নিই যে, তাঁর হাতের কাছে 'চলন্তিকা' আছে। আমি ধরে নিই যে, উপরে

চতুর্থ অনুচ্ছেদে যে ইংরেজি উদ্ধৃতি দিয়েছি, পাঠক জানেন তা এ পি হার্বার্টের 'হোয়াট এ ওয়ার্ড' বই থেকে।

বাঙলায় আমি জনকয় এ পি হার্বার্ট, আইভর ব্রাউন ও এরিক পার্টরিজ চাই। তাঁরা অনবধানী আমাদের অনবরত স্মরণ করিয়ে দেবেন যে, 'আপ্রাণ' কথাটার সত্যি কোনো মানে নেই, যে 'বাধ্যতামূলক' কথাটা কুৎসিত, এবং 'সবিতা' কোনো মেয়ের নাম হওয়া উচিত নয়। তারপর আমি চাই একজন ফাউলার, যিনি অলঙ্কার দেখলেই আতঙ্কিত হবেন না, কিন্তু অনাবশ্যক 'পম্পসিটি'র ভূত হেসে উড়িয়ে দেবেন। আরো চাই, একজন সার আর্নেস্ট গাওয়ার্স, যিনি 'বাঙলার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের' মতো 'গব্‌লডিগুক্‌' ঝেঁটিয়ে বিদায় করবেন। তারপর চাই কয়েকজন বুদ্ধদেব বসু, যাঁরা গুরুবাক্য অমান্য করে নতুন শব্দ ও নতুন গঠন তৈরী করবেন। সেই নতুন উদ্ভাবনগুলি সর্বদাই 'সীমাহীনরূপে অক্ষম'-এর মতো অক্ষম হবে, এমন কথা বিশ্বাস করবার মতো নৈরাশ্যবাদী আমি নই।

৬ জুন, ১৯৫৩

কুপসাহিত্য

ইংরেজি একটা সাপ্তাহিক কাগজে এ ই ডব্লিউ মেসন্‌ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ঔপন্যাসিক গ্রেহাম গ্রীন একান্ত প্রসঙ্গত একটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ উক্তি করেছেন। গ্রীন বলছেন, 'সাহিত্যে পিটার প্যানদের স্থান নেই।'

বাঙলা দেশের আইবুড়ো মেয়েব মতো পাঠকের বয়স দ্রুতবেগে বাড়ে। অথচ লেখক যদি পঁচিশে এসে পরিণতির প্রতি পরাঙ্মুখ হয়ে থাকেন অর্থাৎ আর না বাড়েন, তাহলে পাঠকে আর লেখকে বৈসাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী। সেই অসামঞ্জস্যের অবশ্যম্ভাবী ফল নৈরাশ্য। বৈচিত্র্যহীন, মন-বামন লেখক তারপরেও নিয়মিত লিখে চলেন; কিন্তু পাঠকের অধৈর্য উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে।

এ ব্যাধির বহিঃলক্ষণ বহুবিধ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ রোগের বীজাণু থাকে প্রাথমিক সাফল্যে। সিনেমায় এর দৃষ্টান্ত অসংখ্য। একবার যিনি রহস্যময়ী ছলনাময়ীর ভূমিকায় জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন, বাকি যৌবন তাঁকে ঠিক সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। হলিউডের প্রযোজকদের মতো লেখকদের মধ্যেও পূর্বতন সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাবার লোভ ব্যাপক ও গভীর। প্রায় একই বই তাই দু'নামে, কখনো বা বিশ নামে, প্রকাশিত হয়। চরিত্রগুলির নামে একটু অদল-বদল থাকে, ঘটনা বা স্থানেও হয়তো একটু রকমফের, কিন্তু মূলত বই একই। পার্ল বাক, ফিকি বাউম,—এঁদের নতুন বই তাই আমি আর পড়িনে। জানি যে, ওগুলিতে কী থাকবে। নাম করব না, কিন্তু অনেক বাঙালী লেখক সম্বন্ধেও আমার মত একেবারে অন্যরূপ নয়।

অভিসন্ধির প্রশ্ন স্থগিত থাক। সফল লেখক সজ্ঞানে যদি তাঁর প্রথম সাফল্যের প্রতিলিপি প্রকাশ করতে থাকেন, তবে তিনি অসাধু ব্যবসায়ী, অসৎ শিল্পী। ব্যবসার বিবেচনা বাদেও যে লেখক নতুন থালায় পুরানো খাবার পরিবেশন করেন তাঁর কথাটা আলাদাভাবে বিচার্য। তিনি কেন তাঁর পুরানো সত্তার নকলনবিশী করতে গেলেন? না কি, না করে উপায় ছিল না?

বোধহয় উপায় ছিল না। তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি সংকীর্ণ, নতুন অভিযানের সাহস বা সম্বল পরিমিত। প্রথম বইতে তিনি তাঁর সবকিছু উজাড় করে দিয়েছিলেন—যে গ্রামটি চিনেছিলেন বা যে মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলেন—আর হাতে কিছু ছিল না। পরবর্তী দৈন্যটা মর্মান্তিক। কিন্তু এখানেই তাড়াতাড়ি এই কথাটা বলা প্রয়োজন যে, এমন শিল্পীকে শ্রদ্ধা করতে হয়, কেননা, সার্থক শিল্পসৃষ্টির প্রথম সর্তই এই যে শিল্পী তাতে নিজেকে দেবেন। অন্নদাশঙ্কর বোধ হয় আর্টের সংজ্ঞা করেছিলেন, নিজকে দেবার ছল। ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক তারও আগে আরো স্পষ্ট করে বলেছিলেন, 'টু রাইট ইজ টু হ্যাণ্ড ওয়ানসেলফ ওভার।' লেখা মানে নিজকে সঁপে দেয়া। এই অকুণ্ঠ দান করতে অস্বীকার করলে সাহিত্যিক হওয়া যায়, লেখক নয়।

এই দেবার পরে লেখক যখন শূন্যহস্ত হলেন তখন তিনি হাতযশ বিকিয়ে আরো কিছুদিন লিখে যেতে পারেন, সে হাতসাফাইয়ের কথা একটু আগে বলেছি। লেখকের সামনে দ্বিতীয় পথ হাত গুটিয়ে বসে থাকা। ই এম ফর্স্টার যেমন ১৯৪৩-এর পরে আর উপন্যাস লেখেননি।

তৃতীয় পথ, জীবনের পথ, হচ্ছে হাত বাড়িয়ে নিত্য নতুন রত্ন সংগ্রহ করা।

'রত্ন' কথাটাও থাক। কে জানে হাত বাড়ালে কী মিলবে? যা দরকার তা হচ্ছে অবিশ্রাম সন্ধান। প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তে লেখক তার বুদ্ধি সজাগ রাখবে, বোধ নিবিড় করে রাখবে; সব কিছুর কাছে এসে হাত দিয়ে ছোঁবে, আবার পরম অনাসক্তির সঙ্গে দূরে চলে গিয়ে অন্য জগৎ আবিষ্কার করবে। লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিণতি সর্বদা অব্যাহত থাকবে, নিত্য নূতন জগতের সংস্পর্শে এসে নিজেকে সে সঞ্জীবিত করবে। কোনো ঘাটে বাঁধা পড়বে না দু'দণ্ডের বেশি। অর্থাৎ লেখকের জীবনে কমা থাকবে, সেমিকোলন থাকবে, ড্যাশ থাকবে, হাইফেন থাকবে, এক্সক্লেমেশন থাকবে, সর্বোপরি ইণ্টারোগেশন থাকবে। থাকবে না শুধু ফুল-স্টপ বা দাঁড়ি।

বলা বাহুল্য এই আদর্শ ব্যবস্থা অনুযায়ী আগাগোড়া জীবনযাপন করা রক্ত-মাংসে গড়া কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। অসংখ্য স্খলন, অগণিত ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী। রবীন্দ্রনাথও—যিনি বোধহয় বিশ্বের সকল শিল্পীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উৎসর্গীকৃত শিল্পীর মতো বেঁচেছেন—শেষ জীবনে বিলাপ করেছেন যে তিনি জীবনকে দেখেছিলেন সংকীর্ণ জানালার ভিতর দিয়ে। বিলাপটা মিথ্যা বিনয় ছিল না। অভিজ্ঞতার পর্যাপ্ততার দম্ভ একমাত্র সেই লেখকই করতে পারে যে অভিজ্ঞতার অসীমতা সম্বন্ধে অচেতন।

কিন্তু হাতের বাইরে যা তা পাব না বলে যা নাগালের মধ্যে তাকে কেন হাত বাড়িয়ে নেব না? অনবরত কেন জীবনের সীমানা বাড়িয়ে চলব না, তৈমুর বা হিটলার বা ইংরেজরা একদিন যেমন তাদের রাজত্বের সীমানা বাড়িয়েছিলেন? কেন অভিজ্ঞতার পরিধি নিবদ্ধ থাকবে যে পরিসরে জন্মগ্রহণ করেছি শুধু সেইটুকুর মধ্যে? কেন শুধু নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের হাসিকান্নার

ছুটো গল্প লিখে তৃপ্ত হবে বাঙালী লেখক? কেন বাইরের চাঁদে বান ডাকবে না বাঙালী লেখকের মনের নদীতে?

অথচ মর্মান্তিক সত্যটা হচ্ছে এই যে, বাঙালী লেখকের দৃষ্টির পরিধি কেবলই ছোট হয়ে আসছে। ভ্রমণের সামর্থ্য নেই, ব্যাপক শিক্ষাবিমুখতার জন্তে বিশ্বের অন্তান্ত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় নেই, জীবিকার অতীত কোনো সমস্তার আলোচনা নেই। আধুনিক বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল বাইরের কাছে হাত পেতে। আজ আবার নতুন কিছু লিখতে হলে, বাঙলা সাহিত্যে আবার প্রাণসঞ্চার করতে হলে, বাঙালী লেখককে আবার বাইরের দিকে হাত বাড়াতে হবে। সত্যি জীবনে অফিস ছাড়াও আরো যাবার জায়গা আছে, বাঙালী ছাড়া সংসারে আরো জীব আছে, র‍্যাশনের প্রশ্ন ছাড়া আরো সমস্তা আছে।

মার্চ, ১৯৫২

'চাকরি চাই'

ভারতে অবস্থিত বিদেশী বণিকদের দোকানের কয়েকটা চাকরি নিয়ে বর্তমানে যে আলোচনা চলেছে তার মধ্যে কোনো পক্ষেরই গৌরবের বিশেষ কিছু খুঁজে পাইনে। বরং ইংরেজ ও ভারতীয় চরিত্রের সেই দিকগুলিই সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে উঠছে যেগুলির ১৯৪৭-এর ১৫ই অগস্ত্য-যাত্রা হওয়া উচিত ছিল। এক পক্ষের হুঙ্কারমিশ্রিত আকুতি, আর অপর পক্ষের কপট বিনয়ের আবরণে অবিশ্বাস্য ঔদ্ধত্য সমগ্র দৃশ্যটিকে একাধারে করুণ ও হাস্তকর করে তুলেছে।

প্রথমেই পক্ষদ্বয়ের সঠিক সংজ্ঞা-নির্দেশ প্রয়োজন। বিবাদটা ভারত বনাম বৃটেন নয়। একপক্ষ এদেশে ব্যবসারত বিদেশী বণিক, অপর পক্ষ উচ্চ-মধ্যবিত্তবংশোদ্ভূত ক্ষুদে ক্ষুদে স্বদেশী সাহেবরা। বৃহৎ গোষ্ঠীর সংখ্যা-লঘিষ্ঠ অংশ হলেও দু'পক্ষই বর্তমানে শক্তিশালী, কেননা এক পক্ষের হাতে

টাকার থলি আর অপরের হাতে এদেশের শাসনভার। বিবাদের ফলাফল সম্বন্ধে জাতি হিসাবে ইংরেজরা তাই যেমন উদাসীন, ভারতীয় জনগণও তেমনি সমান নির্লিপ্ত। ইংরেজ কর্মচারীরা এদেশে না এলে স্বদেশে অনাহারে মরতেন এটা যেমন সত্য নয়, তেমনি নেতাজী সুভাষ রোডের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অফিসে আরো দু'চারজন ভারতীয় কোনো মতে স্থান করে নিলে যে ভারতের সমস্তার সমাধান হবে, এমন মনে করাও মূঢ়তা। আসলে বিবাদটি ক্ষুদ্র একটি শ্রেণীর সঙ্গে ক্ষুদ্রতর একটি শ্রেণীর মান-অভিমান। ওখানে ওর ছেলের আর এখানে এর ভাইপোর সংস্থান হয়ে গেলে বর্তমান উত্তেজনা কর্পূরের মতো উবে যাবে।

তবু তাই নিয়ে বাক্য-বর্ষণের অন্ত নেই। ইংরেজরা বলছে, আহা, আমরা ভারতীয়করণ চাই বৈকি, তবে এফিশিয়েন্সির কথা ভুললে তো চলবে না। যতদূর দেখা যাচ্ছে, ভারত সরকার এই যুক্তিটা মোটের উপর মেনে নিয়েছেন। অথচ এর মধ্যে সমগ্র ভারতীয় জাতির প্রতি যে বৃহৎ অপমান নিহিত আছে, সেকথাটা কই কেউ তো একবারও দেখিয়ে দিলেন না! দক্ষতার প্রশ্ন আজ কেন উঠল? এদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম শিল্প হচ্ছে রেলওয়েগুলি। সেগুলি সেদিন পর্যন্ত ইংরেজদের হাতে ছিল। পরে যখন সেগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হোলো, একে একে ইংরেজরা বিদায় নিলেন—তখন তাদের সঙ্গে দক্ষতাও বিদায় নেয়নি? দেশের সবচেয়ে বড়ো শিল্পের বেলায় যদি স্বদেশের দক্ষতার অভাব না ঘটে থাকে, কিম্বা ঘটলেও অন্যান্য কারণে ভারতীয়করণ সমীচীন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, তবে আজ কেন চা আর পাট বিক্রির জন্যে বিদেশী না হলে সব ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে যাবার রব উঠল? বিদেশী-পরিচালিত এমন কোন শিল্প আছে এদেশে যা রেলওয়েগুলির চেয়ে বড়ো, যেখানে দক্ষতার প্রয়োজন আরো বেশি?

আর দক্ষতার কথাই যদি বলো, সেনা বাহিনীর বেলায় কী হোলো? আরো বড়ো কথা, গোটা সরকারের বেলায় কেন যোগ্যতার প্রশ্ন উঠল না? আবেগ-মুক্ত বিচারে দিল্লীর মন্ত্রী আর সেক্রেটারিরা ক'জন তাঁদের পূর্বতন কর্মীদের চেয়ে দক্ষ? বিদেশীর হাত থেকে তাঁরা যখন গোটা দেশের শাসনভার নিলেন, তখন

দক্ষতার প্রশ্ন ওঠেনি। সে প্রশ্ন যখন উঠেছে দোকানদারির সহকারীদের বেলায়, তখন তাঁরাই মেনে নিলেন যে দক্ষতার প্রশ্ন অবান্তর নয়, যে ভারতে খাদ্যের মতো দক্ষতারও বিরাট ঘাটতি। বাইরে থেকে আমদানী না হলে চলবে না।

এখানেই যোগ করা দরকার যে, যে-কটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি ভারতীয় মালিকদের হস্তগত হয়েছে সেখানেও ইংরেজ কর্মচারীর সংখ্যা খুব কমেনি। বেতনের হার ইত্যাদি নানা ব্যবস্থা পূর্বাপেক্ষা খারাপ হয়েছে।

আর বিদেশী দপ্তরে ভারতীয় অফিসারদের সংখ্যাল্পতা নিয়ে যাঁরা বিলাপ করছেন তাঁদের অবস্থা আরো করুণ। যেদেশে একটা চাকরির জন্যে এক লক্ষ প্রার্থী, সেখানে কাজ চাওয়া প্রায় ভিক্ষা চাওয়ার সামিল। সেখানে প্রার্থীর কোনো কিছু দাবী করবার ক্ষমতা থাকে না—দাতার আকাঁড়া চাল নিয়েই তুষ্ট থাকতে হয়। এই কান্নার সঙ্গে তাই যাঁরা জাতীয়তার মিশ্রণ ঘটাতে চান, তাঁরা আসলে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করছেন না, পুরো দেশকে নিজেদের অপমানের ভাগী করছেন মাত্র।

আমি এই প্রশ্নটিকে জাতীয়তা থেকে বিমুক্ত করতে চাই আরও একটা গুরুতর কারণে। ইংরেজ আমলে আই সি এস এবং সেনাবাহিনীতে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ছেলেদের উজ্জ্বল একটা ভবিষ্যৎ ছিল। আজ আই এ এস-এর সেই কৌলীন্যও নেই, বেতনও নেই। সেনা বাহিনীরও সেই অবস্থা। এই শ্রেণীর ছেলেরা আজ ভারতীয় গণতন্ত্রের বন্যায় বিপন্ন হয়েছে। পররাষ্ট্র দপ্তর ছাড়া আর কোনো সরকারী চাকরিতে এদের রুচি নেই। এরা বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, ভারতীয় মধ্যবিত্ত বা দীন জনগণের সঙ্গে এদের কিছুমাত্র সাদৃশ্য বা সৌহার্দ্য কোনো কালে ছিল না, আজো নেই। সহানুভূতিও নেই। এরা তাই মুখ চেয়ে আছে সাহেবী অফিসের দিকে এবং বর্তমান আন্দোলনটা প্রায় পুরোপুরি এই শ্রেণীর সৃষ্টি। আন্দোলনের সহায়তার জন্যে এদের মুখে জাতীয়তার নাম। আজ এরা স্বাধীনতার নামে বিদেশী অফিসে চাকরি চাইছে, গতকাল যেমন চাইত পরাধীনতার নামে বিদেশী সরকারে। ঈশ্বর করুন, এদের আন্দোলন যাতে সফল হয়। বেকার-প্লাবিত দেশে আরো ৬ জনের চাকরি হলে সেটাই লাভ।

কিন্তু এতে ভারতীয়করণ হবে না। কয়েকজন ভারতীয় শুধু অ-ভারতীয় হবে—একদা যেমন ভারতমাতা তাঁর সমস্ত ফার্স্টবয়দের আই সি এস আর আই পি করে নিঃসর্তে দান করে দিতেন বিদেশী সরকারের হাতে। তখন তবু পরীক্ষার নিয়ম ছিল, তাই মধ্যবিত্ত মেধাবী ছেলেরাও সুযোগ পেত। আজকের আন্দোলন সফল হলে বিশেষ একটি শ্রেণী ছাড়া আর কোনো ভারতীয় সমাজ উপকৃত হবে না। বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই জন্যে যে যে-ক্ষমতা দেশের কাজে নিয়োজিত হতে পারতো তা এখন শুধু বিদেশীর ব্যবসায়ের সহায়ক হবে।

না। ওদের জন্যে চেঁচিয়ে আমি অন্তত আমার গলা ভাঙব না।

২১ মার্চ, ১৯৫৩

রঞ্জন ও 'আমি'

যাদবপুর, জঙ্গীপুর ও অন্যান্য দুয়েকটা জায়গা থেকে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে যোগদান করবার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলুম। যে সহৃদয় অনুরাগীরা আমার প্রতি এই অনার্জিত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তবু যে তাঁদের সেই সস্নেহ আমন্ত্রণ সবিনয়ে কিন্তু সজোরে প্রত্যাখ্যান করেছি তার কারণগুলি যতটা ব্যক্তিগত ঠিক ততটাই নীতিগত। তাই সেগুলি প্রকাশ্যে আলোচ্য বলে মনে করি।

একদল দার্শনিক আছেন যাঁরা বলেন, "I am a soul, I have a body". আমার অস্তিত্ব তার চেয়েও অসম্পূর্ণ ও অনির্দেশ্য। আমি বেনামী লেখক। তাই আমার শুধু একটা নাম আছে, তার বাইরে আর কোনো সত্তা নেই যার জোরে সাহিত্যের রাজ্যে আমি প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারি। সাহিত্যসভায় সশরীরে আতিথ্য গ্রহণ করতে আমার সঙ্কোচ এই জন্যে যে 'রঞ্জন' হিসাবে আমার শারীরিক কোনো অস্তিত্ব নেই। আমি নিরাকার। পাঠকের কাছে আমি 'নিত্য গাওয়া গান, মূর্তিহীন।' তার বেশি নই।

কিন্তু সত্যি তো তা নয়। আমি আসলে জীবন্ত একটা মানুষ। অফিস করি, বাজারে যাই,—কখনো কখনো লিখি। প্রথম দুটো কর্মের আর তৃতীয়টির মধ্যে যে ড্যাশ চিহ্ন দিয়েছি তার কারণ দুটোকে আমি আলাদা করে দেখতে ও দেখাতে চাই। অফিস করি ও বাজারে যাই স্বনামে, বেনামীতে এগুলি চেষ্টা করলে জেলে যেতে হোতো। লিখি বেনামীতে, কেননা—কিন্তু সে কাহিনী দীর্ঘ, কারণ তার নানাবিধ।

এর ফলে দুটো সত্তার সৃষ্টি হোলো। একজনের নাম অমুকচন্দ্র অমুক, অমুক অফিসে অমুক কাজ করে সে। দ্বিতীয় জনের নাম 'রঞ্জন'; সে প্রবন্ধ লেখে, গল্প লেখে, উপন্যাস লেখে, আরো কত কী।

আজ সাহস সঞ্চয় করে একথা কবুল করতেই হবে যে 'রঞ্জন' নামের অন্তরালে এই যে আত্মগোপনের আশ্রয় নিয়েছি তার প্রধান কারণ ভীরুতা। অনামী পাঠক আর বেনামী লেখকের সম্বন্ধ কখনোই সম্মুখসমরে পরিণত হতে পারে না, দুয়ের মধ্যে অনচ্ছ পেপার কার্টেন। এই যবনিকার পশ্চাতে অবস্থান করবার সুবিধা এই যে আমাকে যদি কেউ এসে বলে যে 'রঞ্জন' লিখতে জানে না, আমি তৎক্ষণাৎ সহাস্যে সম্মতি জানাতে পারি; তা নইলে জিজ্ঞাসা করতে পারি, 'রঞ্জন? সে আবার কে? নেভার হার্ড অব্ হিম!'

এমন সম্ভাবনা যখন অনুপস্থিত, যখন স্পষ্টতই জানি যে নিমন্ত্রিত হয়ে কোনো সভায় সভাপতিত্ব করতে গেলে সেখানে আমার প্রশংসা বৈ নিন্দা হবে না, তখন ছদ্মনামটা ঘুচিয়ে দিয়ে গলা বাড়িয়ে মালা পরতে আমার বাধে। একবার যখন পাঠকের রক্তচক্ষুর ভয়ে ছদ্মনামের বর্ম পরিধান করেছি তখন নিরাপদ সভাস্থলে লোকচক্ষুর সামনে সেই আবরণ উন্মোচন করতে যাওয়া যেন গাছেরও খাওয়া তলারও কুড়ানো। ওটা অসাধুতা।

যে লেখক ছদ্মনামে লেখে, সে আসলে জেনে বা না জেনে বেচারী ফ্রাঙ্কেনস্টিনের বিপজ্জনক ক্রীড়ায় মত্ত হয়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে এক দানবের আবির্ভাব হয়, সে এসে বলে, 'তুমি অমুকচন্দ্র নও, তুমি রঞ্জন।' এ-দানব কখনো আমি নিজে, তখন আমি সাধারণ জীবন যাপন না করে দায়িত্বহীন উচ্ছৃংলতায় আর্টিস্টের মতো হতে চাই। কখনো এ দানব

সাহিত্যসভার আয়োজকরা, তখন তাঁরা দাবী করেন আমার সশরীর উপস্থিতি।

রাজী হইনে, কেননা, সভায় গিয়ে বলব কী? যদি পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি করি, তাতে পরিশ্রম কম। কিন্তু কোন শ্রোতা তাতে তৃপ্ত হবেন? আর যদি নতুন কথা বলতে যাই, তবে তার আগে তার জন্যে প্রস্তুতি চাই। অর্থাৎ পরিশ্রম চাই। অথচ এ কাজে আজো আমাদের দেশে পারিশ্রমিকের রীতি প্রচলিত হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া শুধুমাত্র মালার লোভে কতদিন লেখকরা সভায় গিয়ে বক্তৃতা করবেন, অর্থাৎ এমন বক্তৃতা যা একাধারে বক্তব্য এবং শ্রাব্য?

প্রথমত, লেখকের মনে যদি কোনো নতুন কথার উদয় হয় (ঈশ্বর জানেন, এমন ঘটনা কী মর্মান্তিক রকম বিরল) তবে তার প্রথম ইচ্ছা হবে সেকথা লিখতে, সভায় গিয়ে বলতে নয়। দ্বিতীয়ত, লেখা এবং বক্তৃতা করা দুটো আলাদা আর্ট, দুটোর জন্যেই সাধনা চাই এবং আলাদা রকমের সাধনা। এই প্রভেদের পর্যাপ্ত স্বীকৃতি নেই বলেই অক্ষম বক্তা হলেও সফল লেখককে বক্তৃতা করতে ডাকা হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফল বক্তাকে লিখতে। ফলে পাঠক এবং শ্রোতা উভয়কেই বঞ্চিত হতে হয়। তাই সুবক্তা না হলে লেখকদেব উচিত বক্তৃতা করতে অস্বীকার করা।

আমি যে অস্বীকার করেছি তার অন্য একটা কারণ আছে। বক্তৃতার, অর্থাৎ পাঠকের সঙ্গে সশরীরে সাক্ষাতের, আমন্ত্রণ এলেই আমার অনেক দিন আগে পড়া রোমানফের একটা গল্প মনে পড়ে। সেই যেটাতে কুৎসিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কুরূপা এক রমণীর প্রেম হয়েছিল।

কেউ কাউকে দেখেনি, শুধু প্রেমপত্রের বিনিময় হয়েছে মাসের পর মাস। কিন্তু, 'চিঠিতে কি মানে মন বিনা দরশনে?' একজন আরেকজনকে দেখতে চাইল। প্রেমিক লিখল, 'ক্ষমা করো, তুমি জানো না আমি দেখতে কী ভয়ানক রকম কুৎসিত। দেখা মাত্র তুমি তোমার মুখ ফিরিয়ে নেবে। না, দেখা আমি দেব না, কিন্তু তোমায় দেখতে চাই।' প্রেমিকা লিখল, 'আমি তোমার রূপের·তো প্রেমে পড়িনি, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি;

আর রূপের কথাই যদি বলো, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না আমি কী ভয়ানক রকম কুরূপা। তুমি দেখে শিউরে উঠবে। আমি তোমায় দেখা দেব না, কিন্তু তোমাকে দেখতে চাই।'

প্রেমে পড়লে কে কবে কার বারণ মানে? তাই নির্ধারিত স্থান ও কালে দুজন দেখতে গিয়েছিল দুজনকে। দূর থেকে দুজনই দুজনকে দেখে আর দেখা করেনি। বাড়ি ফিরে এসে আবার প্রেমপত্র রচনা করেছে। চিঠিই ভালো।

আমিও বলি, লেখাই ভালো। কাজ কী দেখায়? দেখা হলে, হয়তো, আমি পাঠককে নিরাশ করব। হয়তো পাঠকও আমাকে।

২৩ মে, ১৯৫৩

প্রমথ চৌধুরী—২

আমি বোধ হয় অনিপুণ কারিগর। তাই বুঝি হাতিয়ারের সঙ্গে আমার বিবাদ আর ঘুচল না। এবারে অজুহাত জুগিয়েছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহে তাঁর ভূমিকাটিতে তিনি যত বলেছেন তার অনেক বেশি বলেননি। কুশলী অধিবক্তার মতো রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথ নামক দু'টি প্রতিবেশীকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করে প্রমথ-প্রসঙ্গ শেষ করেছেন। জুরীকে প্রথম প্রসঙ্গটি স্মরণ পর্যন্ত করাননি। সে প্রশ্নটি হচ্ছে বাঙলা গদ্যের—যা প্রমথ চৌধুরীর, আমার ও অন্যান্য সকল প্রাবন্ধিকের হাতিয়ার। কাব্যজিজ্ঞাসু গদ্য-জিজ্ঞাসু হলে কবুল করতে বাধ্য হতেন যে প্রমথ চৌধুরীর পরেও হাতিয়ারটি অনেকাংশে অকেজো।

হাতিয়ারটির প্রধান ত্রুটি সে হাতী-ভার—অতুলচন্দ্র যাকে বলেছেন 'পদক্ষেপে মহার্ঘ শালীনতা'। (মহার্ঘ কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা আধুনিক ইংরেজি রচনা সম্বন্ধে precious বলার চেয়ে সস্তা বলাও নাকি সদয়)। বাঙলা গদ্যের দ্বিতীয় দোষ এই যে, প্রায়শই তা গদগদ। কবির করুণায় এতে বাগবৈভব আছে, অংশত তাঁরই কল্যাণে এতে বাকসংক্ষেপ নেই। তৃতীয় দোষ হচ্ছে এই যে, এর শব্দভাণ্ডার আমাদের আজকের অন্নভাণ্ডারেরই

মতো অকিঞ্চন। প্রতি গ্রাসে বিদেশী শব্দের কাঁকর, যা দাঁতে লাগে; আর তা নইলে গলানো ভাত, যা যে-মনের দাঁত উঠেছে তার অভক্ষ্য।

তাই রামপ্রসাদ যেমন মা-কালীকে গাল দিতেন, তেমনি কতবার যে বাঙলা লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর উদ্দেশে অভিমানক্ষুব্ধ অভিশাপ উচ্চারণ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। এমন উদ্ধত উক্তি ব্যাখ্যা না করলে মহাপাতক হবে।

রবীন্দ্রনাথ যে বাঙলা গদ্যে অসাধ্য সাধন করেছেন সে ঘটনা (লীলা বললেই ঠিক হয়) আমার তা মোটেই অজানা নেই। কিন্তু এটা আমার উক্তির খণ্ডন নয়, বরং আমার যুক্তির সমর্থন। তিনি তাঁর অভাবনীয় প্রতিভার পাখায় চড়ে বাঙলা ভাষার যত জলাভূমি (আবেগবন্যা), যত খানাডোবা (ব্যাকরণ-দৌর্বল্য), যত মরুভূমি (নবশব্দশূন্যতা), আর যত উঁচু টিবি (অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ) তার সব কিছুর উপর দিয়ে যদৃচ্ছ অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হয়েছেন। হতভাগ্য, নিষ্পক্ষ অনুসারীরা অনুরূপ অতিক্রমণের চেষ্টায় পা ভেঙেছে, নয়তো খালের জলে তথা চোখের জলে ডুবেছে। অতুলচন্দ্র এদের সবাইকে সরাসরি পাগল বলে অভিহিত করেছেন। আসলে ওরা—অর্থাৎ আমরা সবাই, পাগল নই। শুধু পঙ্গু। ঠিক পঙ্গুও নই, পক্ষহীন।

আমার অভিযোগটা কিন্তু খঞ্জ নয় তাই বলে। গল্পে-শোনা সন্ন্যাসীর মতো রবীন্দ্রনাথ বাঙলা গদ্যের নদী—নদী নয়, খাল—পায়ে হেঁটে পার হয়েছেন, সেতুতে তাঁর প্রয়োজনই ছিল না। কখনো বা তিনি নদী-পরিক্রমা করেছেন সোনার তরীতে। কাঠের একটা মজবুত নৌকা তৈরি করে যাননি যাতে আমরা সবাই পারাপার করতে পারতেম। ওটা কবির কাজই নয়। পাখির দায় কী পথ কাটবার? 'কমেট' কেন রেল-লাইন পাতবে?

অথচ আধুনিক বাঙলা গদ্য নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের গদ্য। কিন্তু ফোর্ডের তৈরি গাড়ি যেমন শুধু মিস্টার ফোর্ডের নিজের চালাতে পারাই যথেষ্ট নয়, তেমনি রবীন্দ্র-গদ্যের বিচারও শুধু রবীন্দ্ররচনাবলী দিয়ে হবে না।

কবির নসিরামদের লেখা দেখলেই বোঝা যায় যে বাংলা গদ্য গতিতে শ্লথ, বাচনে বাচাল ও শব্দৈশ্বর্যে নিঃস্বপ্রায়। কবির যাদুবলে যে ছিল নৃত্যপটীয়সী ও গীতশ্রী—হঠাৎ দেখা গেল হফ্‌ম্যানের গল্পের পুতুলের মতো আবার সে কাঠের টুকরো!

সাহিত্যসৃষ্টি মালীর কাজ, ভাষাগঠন কাঠুরের। 'তেল-নুন-লকড়ি'র লেখক প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল এই কাঠুরের অত্যাবশ্যক কাজটি শক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করে পরবর্তী সকল বাংলা গদ্যশিল্পীদের ঋণী করেছেন। বরাঙ্গনাদের জীনিয়স' যে কাজ প্রেরণা দিয়ে শুরু করেছিল, প্রমথ চৌধুরীর ট্যালেন্ট' তা সকল চেষ্টা দিয়ে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে। বাংলা গদ্য কাব্যের কমনীয়তা পরিহার করে গদ্যের যোগ্য স্বচ্ছতা পেতে চেষ্টা করছে। স্বচ্ছন্দতার প্রতি অত্যধিক মনোযোগ না দিয়ে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হতে চাইছে। মসলিনি নবাবী ছেড়ে মিলের কাপড়ের ঠাসবুনন মজবুতি খুঁজছে। তাই আবার এখন আধুনিক বাংলায় ভাবের দিক ছাড়াও ভাবনার কথা লিখতে চেষ্টা করা সম্ভব।

সাহিত্য শুধু সাহিত্যিকের, ভাষাটা সকলের। বাংলা সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য কিন্তু বাংলা ভাষার দৈন্য প্রায় সমান বিপুল। বীরবল প্রথমটি যত বাড়িয়েছেন, দ্বিতীয়টি তার চেয়ে বেশি কমিয়েছেন এমন কথা বলতে পারলে খুশি হতেন। তার একমাত্র সার্থক একলব্য অন্নদাশঙ্কর যাই বলুন না কেন বীরবলের রচনা 'অক্লেশ' নয়; প্রতিটি বাক্য যেমন রসসিক্ত ঠিক ততটা স্বেদসিক্ত। তবু তার গদ্য গদগদ নয়, ঢিলে নয়। তাঁর শ্লেষে আর কৌতুকে তিনি বাংলা ভাষার পণ্ডিতী মহার্ঘতা বিধ্বস্ত করেছেন; শাবালো শানালো বাক্য লিখে তিনি বাংলা গদ্যের দেহ থেকে উচ্ছ্বসিত অতিভাষিতার ভূত ছাড়িয়েছেন; এক কথার জায়গায় পাঁচ কথা না লিখে বাক্যে মিতব্যয়ী ও সংযমী হবার শিক্ষা দিয়েছেন; আরো বড়ো লাভ, পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যে ঔজ্জ্বল্যের বিরোধ নেই তা হাতে কলমে দেখিয়েছেন।

কিন্তু এ লাভগুলিও বেশির ভাগ সাহিত্যের, অল্পই ভাষার। বীরবলের পরের কয়েকজন লেখকদের গদ্য বিশ্লেষণ করলেই এ ভাষার দোষগুণ ধরা পড়বে। যাত্রার ভঙ্গি থেকে ইয়ারের ভঙ্গি যে আরো পরে অনেক ক্ষেত্রে নির্জলা ইয়ার্কিতে পরিণত হয়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এরও কারণ এই যে সাহিত্যের উন্নতি হয়েছে, ভাষা দীন রয়ে গেছে। বীরবল নতুন শব্দ তৈরি করার শ্রম এড়িয়ে দরকারে-অদরকারে ইংরেজি কথা ব্যবহার করেছেন: এ বীজের বিষবৃক্ষ কালপেঁচার লেখা। সংক্ষিপ্ত হতে গিয়ে দুর্বোধ হতে দ্বিধা করেননি: পরের অবনতির দৃষ্টান্ত ধূর্জটিপ্রসাদ ও সুধীন্দ্র দত্ত। মাতোয়ারা হয়ে 'পান্' করেছেন: আজকের প্রতিহিংসা শিবরাম আর বিরূপাক্ষ।

অথচ প্রমথ চৌধুরী চেষ্টা করলে এমন একটা গদ্যের ভিত্তিস্থাপন করে যেতে পারতেন যা দক্ষ ব্যক্তি মাত্রই সহজে আয়ত্ত করতে পারতো, যা প্রতিভা অনুযায়ী মনোহারী ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহারিক হোতো, যা একাধারে গৃহিণী ও প্রেয়সী হোতো। অর্থাৎ যাতে চেষ্টালভ্য দক্ষতার সঙ্গে সব কিছু সম্বন্ধে বহুবোধ্য রচনা লেখা সম্ভব হোতো।

এমন একটা আধুনিক বাঙলা গদ্যের জন্ম একদিন হতেই হবে। এবং তা হবে দুই উপায়ে। এক, যদি আমরা চেষ্টা করি প্রমথ চৌধুরীর মতো লিখতে। দুই, যদি আমরা চেষ্টা করি প্রমথ চৌধুরীর মতো না লিখতে। এই দুই কাজই যে অত্যন্ত দুরূহ, বর্তমান প্রবন্ধই তার মর্মান্তিক নিদর্শন।

২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

বাঙলা, না……?

মাসাধিককাল পূর্বে অন্য প্রসঙ্গে লিখেছিলেম: "ইংরেজ চলে গেছে, ইংরেজি আমরা ভুলতে বসেছি; অবিলম্বে আমরা যত্নবান না হলে হঠাৎ দেখব আমাদের এমন একটি ভাষা নেই, যাতে উচ্চস্তরের চিন্তা ও তার সুনির্দিষ্ট প্রকাশ সম্ভব।"

সম্প্রতি ভাষা প্রসঙ্গে আরো দু'জন বাঙালী মত প্রকাশ করেছেন। ভিন্ন মত।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সবাইকে ইংরেজি-বৈরিতা পরিহার করতে বলেছেন, অসংকোচে ঐক্যবিধায়ক হিন্দি শিখতে বলেছেন এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলির সমান্তরাল সাধনা করতে বলেছেন।

দ্বিতীয় বাঙালী 'অজ্ঞাত ভারতীয়' নীরদ চৌধুরী। পক্ষকাল পূর্বে স্টেটসম্যান সাময়িকীতে তিনি নিজে কেন ইংরেজি বরণ করেছেন, তার বিবরণ দিয়েছেন। যুক্তিনিষ্ঠ, অত্যন্ত সুলিখিত এই প্রবন্ধটিতে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। আর করেছেন কয়েকটি অসম্ভব সমাধানের পরস্পরবিরোধী ইঙ্গিত। চৌধুরী মশাই বার বার বলেছেন যে, তাঁর সিদ্ধান্ত একান্তই ব্যক্তিগত; কিন্তু বিষয়টি ব্যক্তিগত নয়, নইলে তিনি তা নিয়ে কাগজে প্রবন্ধ লিখতেন না। যাই হোক তিনি বলছেন, "বাংলা সম্বন্ধে আমার ছিল একটা আদর্শ, হিন্দি সম্বন্ধে একটা মতবাদ।" (মতটা স্বরাজোত্তর ভারতে হিন্দির প্রভাব সম্বন্ধে।) তবু তিনি ইংরেজি বেছে নিয়েছেন, কেননা বাঙলা ভাষা ঐতিহাসিক রচনা বা আলোচনা-সাহিত্যের বাহন হিসাবে অচল। কেননা, ইংরেজি ও বাঙলা-রূপী দু'নৌকায় পা দেবার মূঢ়তা তিনি বুঝেছিলেন। কেননা, বুদ্ধিজাত চিন্তার জন্যে ইংরেজি আর বোধপ্রসূত আবেগের জন্যে বাঙলার ব্যবহারের ফলে আমাদের মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে মুখ দেখাদেখি নেই, সেজন্যেই আমাদের চিন্তা অমৌলিক এবং প্রকাশ দুর্বল; এ অবস্থায় বিভক্ত ব্যক্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী; ওটা জাতির জীবনে অভিশাপ। কেননা, অনেকগুলি জিনিস আছে (শুধু যুদ্ধবিদ্যা বা ইতিহাসই নয়, দুর্গা-দর্শনে মনের ভাব পর্যন্ত) বাঙলাতে যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কেননা, কয়েকটা রচনারীতি এবং ছন্দ আছে যা যে কোনো ভারতীয় ভাষায় অনধিগম্য। কেননা, ইংরেজি ভাষা ত্যাগ করলে শুধু একটা ভাষাই যাবে না, সে সঙ্গে বিসর্জন দেওয়া হবে পাশ্চাত্য চিন্তা ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী। কেননা, ইংরেজির ব্যবহার বিশ্বব্যাপী এবং পৃথিবীর সঙ্গে পা ফেলে চলতে হলে ওটা চাই। অতএব, নীরদ চৌধুরীর মতে,

আর সব ভাষা ছেড়ে দিয়ে সর্বান্তঃকরণে ও সর্বমস্তিষ্কে ইংরেজি গ্রহণ না করার অর্থ মূকতা বরণ করা।

শ্যামাপ্রসাদের সমাধান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। তিনি বলেছেন একসঙ্গে কালীঘাটে বাতাসা, মসজিদে সিন্নি ও গীর্জায় মোমবাতি দিতে। ওটার নাম সিনথেসিস' হতে পারে, অর্থাৎ গোঁজামিল; সমাধান নয়। দ্বিভাষিত্বই দুরূহ, তিনটে ভাষা শিখতে গেলে হয়তো একটাও হয়ে উঠবে না। আমার বাঙলাপ্রীতি এত বেশি যে, আমি কিয়দংশে হিন্দি-বিরোধী। বিরোধটি মূলগত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত 'নিবন্ধ-কুসুমাকর' বইতে লেখা আছে: 'অভি উস্ দিন রাষ্ট্রভাষাকে সমর্থক এক বিদ্বাননে কহা থা কি যদ্যপি রাষ্ট্রসংগঠনকে লিয়ে হমেঁ এক হী ভাষাকী আবশ্যকতা হৈ ঔর হম্ হোনী ভী চাহিয়ে লেকিন তো ভী বিভিন্ন প্রান্তিক ভাষায়োঁকে দ্বারা সাহিত্যকী বৃদ্ধি রুকনী নহীঁ চাহিয়ে।...বহুপরিস্থিতি ভী অধিক বাঞ্ছনীয় ন হোগী, ক্যোঁকি ইসমেঁ রাষ্ট্রভাষাকা মূল্য হী কম হো জাতা হৈ।' অতএব, হিন্দিবরণ মানে বাঙলার মরণ। ইংরেজি সাহিত্য কালক্ষয় না করে শুধু ইংরেজি ভাষা শিখব, ক্রমে বাঙলা মৃতভাষায় পরিণত হবে এবং শুধু হিন্দি নিয়ে ভাবব ও বলব — এমন দুর্ভাগ্য শিবসি মা লিখ, মা লিখ।

নীরদ চৌধুরীর সমালোচনা আমি একটাও পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারিনে, তবু তার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমার প্রবল আপত্তি। একটা কারণ বোধহয় এই যে আমার মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে বিচ্ছেদটা সম্পূর্ণ নয়। বিচ্ছেদটাকে দ্বিভাষিত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বলে মানতেও আমার দ্বিধা। আমিও, আগেকার নীরদ চৌধুরীর মতো, ইংরেজির কল্যাণে জীবিকার্জন করি এবং বাঙলায় সাহিত্যপ্রয়াস করি। এরকম দু'নৌকায় পা দেয়া সহজও নয়, সুফলাও নয়। কিন্তু উপায় কী? পুরোপুরি বাঙলা নৌকায় পা দেয়া মানে হুগলীর ঘাটে বাঁধা থাকা, নৌকাতেও ছিদ্রের গুণতি নেই। অপর পক্ষে ইংরেজি-জাহাজে 'কোনো মতে স্থান করি লওয়ার' অর্থ অসুবিধা নিয়ে শুরু করা, শিক্ষিত বিদ্যার পরিমিতি মেনে নেয়া, আপন জন থেকে আরো বেশি বিচ্ছিন্ন হওয়া। এগুলিই কি সৃজনী প্রচেষ্টার অনুকূল? মাইকেলী বিলাপে

শুধু পরভাষায় আত্মপ্রকাশের অসাধ্যতার স্বীকৃতি ছিল না, এশিয়াটিকদের ইংরেজি রচনার প্রতি ইংরেজদের স্বাভাবিক অবজ্ঞা বা ওদাসীন্যেরও ইঙ্গিত ছিল। সেই অবজ্ঞা জয় করতে নীরদ চৌধুরীর মতামত কতটা সাহায্য করেছে, আর কতটা তার রচনাসৌষ্ঠব বা যোগ্য পুরস্কার তাই বা কে বলবে?

আমি অচিরে ইংরেজি ছাড়ব না। ইংরেজিতে পড়ব; ইংরেজি থেকে নতুন নতুন শিক্ষা আহরণ করব, শুধু জ্ঞানের নানা বিষয়ে নয়, সাহিত্যের মাধ্যমে চিন্তারীতিতে ও রচনারীতিতে; আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত থাকব। ব্যবসার প্রয়োজনে ছাড়া ইংরেজিকে কিন্তু কিছু দেব না। শুধু নেব। ইংরেজ যেমন আমাদের দেশের পাট আর চামড়া কিনে জামা আর জুতো করে দেয় এবং সেগুলিকে যেমন বিলাতী বলি তেমনি আমার ইংরেজি-জানা লেখা, এমনকি ভাবা, জিনিসের বাংলা লেখা পুরো স্বদেশী বলে পরিচিত হতে পারবে। অনুবাদের ত্রুটি বর্তমানে মার্জনীয়, পরে শোচনীয়।

বাংলা গদ্যের নানা দৈন্য সম্বন্ধে আমি সচেতন; কিন্তু পরভাষার কাছে আত্মসমর্পণ করা আমি শুধু অপমানকর বলে মনে করি নে, অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর বলে জ্ঞান করি। শুধুমাত্র অশিক্ষিতপটুত্বশালী লেখকদের হাতে বাংলা গদ্যকে ছেড়ে না দিয়ে শিক্ষিত ও আলস্যবিমুখ কয়েকজন লেখক ব্রতী হলে এমন একটি বাংলা ভাষার ক্রমোদ্ভব সম্ভব যা অন্যান্য অগ্রগণ্য ভাষার সমকক্ষ হবে; শুধু সাহিত্যগুণে নয় জ্ঞানগুণে। হিন্দি শিখলে তা হবে না ইংরেজি ভুললে তা হবে না। বলা বাহুল্য, বাঙলা না লিখলেও তা হবে না।

২০ ডিসেম্বর, ১৯৫২

দুই ঐতিহাসিক

ইতিহাসের শিক্ষক অগণ্য। অতি দুর্লভ ইতিহাসের ছাত্র। অধ্যাপক সুশোভন সরকার সেই দুর্লভদের একজন। তদুপরি তিনি ভাবুক ও সমাজ-সচেতন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিদ্যার বাজারে যিনি মজদুরি পরিভাষায় যাকে

মজুতদার বলে, তা-ই। কেননা ক্লাসরুমের বাইরে তাঁর বিদ্যা তাঁর মনের গভীরে গচ্ছিত গুপ্তধন। স্বনামে ও বেনামে সুশোভন-রচনাবলী মর্মান্তিকরূপে অকিঞ্চিৎকর। ধনীতে এমন কার্পণ্য অক্ষমনীয়। আমাদের সঞ্চয়ী সমাজেও বিদ্যার মূলধনের এমন ব্রীড়া যেমন বিস্ময়জনক তেমনি নৈরাশ্যজনক।

সম্প্রতি তিনি 'পরিচয়' মাসিকপত্রে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯) অপর এক ঐতিহাসিকের 'অসামান্য' গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করে দীর্ঘ নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করেছেন। অনভ্যাসের অবশ্যম্ভাবী জড়িমা থেকে রচনাটি পুরোপুরি মুক্ত নয়, কিন্তু বুদ্ধির প্রাখর্যে উজ্জ্বল। গভীর মতানৈক্য সত্ত্বেও রসগ্রাহিতায় অনুদারতার চিহ্ন মাত্র নেই।

সুশোভন সরকার ও নীরদ চৌধুরীতে মতের মিল হবে, এটা আশা করিনি এক মুহূর্তের জন্যেও। একজনের দৃষ্টি পূর্বাচলে, অপরের অস্তাচলে। একজন নব অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় অধীর, আরেকজন সংস্কৃতি-সায়াহ্নের ধূসরতায় অস্থির। মেরু দুটির প্রতিবেশিতা এর চেয়ে নিকট।

বিশ্বাসের বৈসাদৃশ্য কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। তাই সুশোভন সরকারের প্রবন্ধে অকুণ্ঠ প্রশংসা আছে নীরদ চৌধুরীর 'ভাষার দীপ্তির,' 'চিন্তার স্বকীয়তার', 'বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের' এবং 'আত্মপ্রকাশে লক্ষ্যসিদ্ধির'। আমি এই উদার প্রশংসার পরিপূর্ণ সমর্থক। সুশোভন সরকারের পরবর্তী সমালোচনায় আমার সমর্থন কিন্তু আংশিক।

'নীরদবাবুর মতবাদ আংশিক।' নিশ্চয়ই। কিন্তু, pray, কোন মতবাদ আংশিক নয়? কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করা মানেই কি সমস্ত বিরোধী মতগুলিকে বাদ দেওয়া নয়? বিশ্বের সমগ্রতা এত লক্ষ ব্যতিক্রমে আকীর্ণ যে, কোনো সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করতে গেলে উপায় নেই সহস্র নিপাতন উপেক্ষা না করে। মতবাদ যদি হয় ঘোঁযাটে বিশ্বপ্রেম, তাহলে রাম আর রহিমের বিরোধের ঘটনা মিলনের বাসনা দ্বারা প্রথমে আবৃত এবং পরে অস্বীকৃত হয়। কিন্তু এর চাইতে একটু কম অথবা ও একটু বেশি পরিষ্কার কোনো মতে পৌঁছোতে হলে পথপার্শ্বের বিভ্রান্তিকর ব্যতিক্রমগুলি পায়ে না দললে পথের শেষ হয় না। অর্থনীতিক অভিসন্ধির প্রতি একদেশদর্শিতা

অবলম্বন না করলে মানবেতিহাসের অনেকগুলি অধ্যায় অব্যাখ্যাত থাকে এবং ইতিহাসের নব ব্যাখ্যান অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ইতিহাস যদি নানা ফুলের ঝুড়ি না হয়ে সুগ্রথিত একটি মালা হতে চায়, তাহলে চয়ন এবং প্রত্যাখ্যান অপরিহার্য। অবশ্য প্রত্যাখ্যাত বস্তুর গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে মতভেদ অসম্ভব নয়। নীরদ চৌধুরী যে সম্পূর্ণরূপে বহিঃপ্রভাবশূন্য একান্ত ভারতীয় বৌদ্ধ সভ্যতা সম্বন্ধে একেবারে নীরব এটা সত্যি বিস্ময়কর এবং বোধ হয় গুরুতর অনুল্লেখ। কিন্তু ভারতের চিত্র এতে অসম্পূর্ণ হলেও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের আলোচনায় বৌদ্ধধর্মকে জীবন্ত শক্তি বলে গণ্য না করার পক্ষেও বোধহয় যুক্তি আছে।

সাম্রাজ্যতন্ত্রের পক্ষপুটে যে প্রাণস্পন্দন তাকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সমান [illegible] তোলা দুরাশা [illegible]।' ঠিক তাই এবং নীরদ চৌধুরী সে চেষ্টা করেননি। তাঁর আত্মজীবনীর ১৮০ পৃষ্ঠার রেনেসাঁস নামটি পর্যন্ত অপব্যবহার করেননি। অবশ্য তবে [illegible] এই নব [illegible] বঙ্গ-রেনেসাঁস অতিরঞ্জিত হয়নি। হয়েছে। যেমন হয়েছিল সুশোভন সরকারের 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' গ্রন্থে।

কিন্তু এহ বাহ্য। চৌধুরীর বিরুদ্ধে একালের আসল অভিযোগ তিনটি। এক, তিনি নানা বড়াই সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচেননি; দুই, তিনি জনগণের সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল নন; এবং তিন তিনি ইতিহাসের ছক আকতে গিয়ে কোনো কোনো তথ্য বেমালুম উপেক্ষা করেছেন।

স্থানে স্থানে বস্তুনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও চৌধুরী যে আত্মজীবনীর আকারে তার ঐতিহাসিক বক্তব্য বিবৃত করেছেন, এইটেই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে, ইতিহাস তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না? তা ছাড়া ভূমিকায় পার্সন্যাল ইকুয়েশনের উল্লেখও কি তার পরোক্ষ স্বীকৃতি নয়? ঐতিহাসিকের [illegible] অসংখ্য বস্তুনিধি। সকলের প্রতি সমান নিষ্ঠা অসম্ভব। একান্ত বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস আজ তাই আমরা আশাই করি না। ঐতিহাসিকদের কাছে [illegible] দাবী 'সাবেকী'। তবে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি বিকৃতি ঘটায় অতিস্ফীত দেশাত্মবোধ; নীরদ চৌধুরী অন্তত ও ফাঁদে পা দেননি।

ইতিহাসের মঞ্চে নায়কের ভূমিকায় জনগণের আবির্ভাব অধুনাতন। সে সত্যি নায়ক না নাত, তা নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। 'পিপ্‌ল'—যাকে সনাক্ত করা শক্ত—তাকে ইতিহাসের ফার্স্ট ক্লাস-এর আসনে বসাবার আধুনিক রেওয়াজটা আর যাই হোক সর্বজনসম্মত নয়। বিজ্ঞানসম্মত কিনা তাও সন্দেহসাপেক্ষ। নীরদ চৌধুরীকে এ অভিযোগে সোপর্দ করলে কাঠগড়ায় তাঁর সম্মানিত সঙ্গীর অভাব হবে না।

এক সময়ে ইতিহাসের লক্ষ্য ছিল পরম করুণাময়ের মাহাত্ম্য প্রমাণ করা। প্রমাণ নয় ঠিক, কীর্তন করা। ইতিহাস 'বদনের পর্যায়ে উন্নীত হলো গণেশ বিদায় নিলেন। আজ জনগণেশকে সে আসনে আবার বসাতে গেলে ইতিহাস অবমানিত হবে, মাঝে যেমন স্বদেশপ্রেমের কল্যাণে হয়েছিল।

'প্যাটার্নের মাহাত্ম্যই এই যে . . যে তথ্য তাকে খণ্ডে না, তাকে অগ্রাহ্য করাই যথেষ্ট।' এ কী কথা শুনি আজ মার্কসিস্টের মুখে? এ অভিযোগ ফিশার পাললে বোঝা যেত; ইতিহাস তার চোখে অসম্বন্ধ তরঙ্গরাশির সমুদ্র অভাবিতের লীলাভূমি। কিন্তু ইতিহাসের মার্কসীয় ব্যাখ্যা যে 'বদলায় এবং কঠোর একটি ব্যাপার (পরিচয় বৈশাখ ১৩৬২)। বস্তুত শোভন সরকার ও নীরদ চৌধুরী উভয়েই প্যাটার্নের পূজারী, তবু মন্দির মসজিদ যদিও আলাদা। অন্তত এদিক দিয়ে কে কাকে দূষবেন। প্যাটার্নের অস্তিত্ব মেনে নিলে উপায় নেই অনেক তথ্য বাদ না দিয়ে। এক পৃষ্ঠার প্রোক্রাস্টীয় শয্যায় শুয়ে আমার যেমন উপায় নেই আরেকটু বিশদ হবার।

২৬ জুলাই ১৯৫২

মোহিতলাল মজুমদার

আমার পক্ষে মোহিতলাল মজুমদারের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন প্রায় 'ড্যাফোডিল-পুষ্পে যেন মনসার পূজা'। আমি যে রকমের বাংলা লিখতে চেষ্টা করি তা তাঁর হিংস্র ঘৃণার সামগ্রী ছিল। তিনি যে ভাবধারায় পুষ্ট হয়েছিলেন, আমার বয়ঃপ্রাপ্তির বহুপূর্বে তা শীর্ণ নদী থেকে পঙ্কিল নালায় পরিণত

হয়েছিল। হিন্দু ঐতিহ্যের জন্যে তিনি প্রায় ঐকান্তিক উন্মাদনার সঙ্গে আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন, আমার কৌতূহল তাতে শান্ত ঐতিহাসিক, উৎসাহ পরোক্ষ। অনুরূপ অনৈক্যের তালিকা আরো অনেক দীর্ঘ করা যেতে পারে।

মোহিতলালের প্রতি শ্রদ্ধা কিন্তু সেজন্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পক্ষকাল পরে যে তাঁর সম্বন্ধে লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি তার কারণ এও নয় যে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাই বিধেয়। এমন আধুনিকতার প্রতি তাঁর গভীর বিদ্বেষ ছিল আমারও আছে। তাছাড়া [illegible] আইস্থাকসের সঙ্গে আমি একমত যে সাহিত্যালোচনার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সমকালীন লেখকদের মৃত, স্থিত লেখক হিসাবে বিচার করা, আর মৃত লেখকদের ইতস্তত সঞ্চরমাণ সমকালীন জ্ঞান করা। জনৈক সমালোচক বলেন, আমার চক্ষে মৃত ও জীবিতে কোনো ভেদাভেদ নেই।

এই হিসাবেই—বাংলা সাহিত্যে মোহিতলালের স্থান আপন ভূমিকাতে গুরুত্বপূর্ণ। [illegible] মন্দিরে তিনি পার্টি-লাইন অনুসরণের উপাসক ছিলেন না। বাঙালী জাতি, বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি একাগ্র নিষ্ঠা তাঁর সত্তার সঙ্গে এমনই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়েছিল এবং সেই নিষ্ঠার ভিত্তি এমনই দৃঢ় ছিল যে অস্পষ্ট বিশ্বজনীনতায় তাঁর দৃষ্টি কখনও আচ্ছন্ন হয়নি, নব সর্বভারতীয়তায় তাঁর বাঙালিত্ব কখনও শিথিল হয়নি। আজকের দিনে এমন মনোভাব অনুদার, এমন কি সঙ্কীর্ণ, বলে উপহসিত; বর্তমানের লেখক-পাঠকদের আদর্শবাদিতা যদি একদিন আমাদের ইতিহাস ও জাতীয়চরিত্রের বিরোধিতার কাছে পরাজিত হয়ে মনের ও দেশের মাটিতে মূল খুঁজে না পায়, সেদিন আমরা উপহাসের বস্তু হবো, মোহিতলাল নয়। ইতিহাসের রায় এখনও ঘোষিত হতে বাকি।

আধুনিকতার ধর্মই তার তারুণ্যের উন্মাদনায় প্রাচীনকে অস্বীকার করা। কিন্তু প্রাচীন যদি সে আঘাত নিঃশব্দে সহ্য করে বিনা প্রতিবাদে বিদায় নেয় তাহলে তার ফলে উভয় পক্ষেরই অমঙ্গল। আধুনিক তার অনায়াসলব্ধ জয়ে প্রমত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হয় এবং বিরোধিতার অভাবে ক্রমে নির্বীর্য হয়ে

পড়ে। সাধনায় আর মন থাকে না, আয়াসকে মনে হয় অনাবশ্যক বলে, নিষ্ঠাকে গোঁড়ামির বাড়াবাড়ি বলে।

শিল্পবিপ্লবের পরে ওই রকমের অরাজকতার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল ইংরেজি সাহিত্যে, আর তখনই আবির্ভাব হয়েছিল ম্যাথ্যু আর্নল্ডের। তিনি আবার সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, সাহিত্য সমাজস্বাধীন একটা বিলাস নয়, যে অতীতের ঐতিহ্য থেকে বেপরোয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সাহিত্য হালভাঙা পালছেঁড়া তরীর মতো শুধু নিরুদ্দেশে ভেসে চলে। রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা সাহিত্যে মোহিতলাল, ম্যাথ্যু আর্নল্ডের মতো, ঠিক এমনি কয়েকটা অনস্বীকার্য কিন্তু অপ্রিয় কথা বারবার বজ্রকণ্ঠে তরুণ সাহিত্যিকদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের প্রতি যে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, সে ঋণ গতকালের লেখকরা স্বীকার না করলেও আগামীকালের ঐতিহাসিক উপেক্ষা করবেন না। বস্তুত, লেখকের উপর সমালোচকের প্রভাব সর্বদাই পরোক্ষ, যেমন ছাত্রের উপর শিক্ষকের। তাই বলে গৌণ নয় আদৌ।

শিক্ষকের কথায় মনে পড়ল। মোহিতলালের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ ছিল এই যে, সাহিত্যকে তিনি পাঠশালায় পরিণত করেছিলেন। হবে। তার চেয়েও সত্য কথা হচ্ছে এই যে পাঠশালায় তিনি সাহিত্য প্রবর্তিত করেছিলেন। কিন্তু যে নাইটএর‍্যাণ্টরা পাঠশালার কয়েদখানা থেকে শৃঙ্খলিতা বাণীদেবীকে মুক্তি দিয়ে ড্রয়িং রুমে এনেছিলেন সেই ডিলেটাণ্টির অধিকাংশই বান্ধবীকে প্রত্যাখ্যান করে সাহিত্যচর্চা পরিহার করেছেন। 'সংরক্ষণশীল', 'নির্যাতক', 'বেত্রহস্ত' মোহিতলাল কিন্তু একদিনের জন্যেও সাহিত্যসেবা থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে হাইকোর্টে, দামোদরে বা সরকারী প্রচার বিভাগে আত্মোন্নয়নের চেষ্টা করেননি। এমন উপাসকেরই মাঝে মাঝে শাসক হবার অধিকার আছে।

তাঁর শাসনের সাহসিকতার কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ এঁদের কারো সম্বন্ধেই তাঁর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না কিন্তু যে স্তুতিবাদ চিন্তাবিমুখতার প্রশ্রয় দেয় তার জন্যে তাঁর অবজ্ঞা ছিল অপরিসীম। যে মহাপুরুষকে আমরা ভক্তির আতিশয্যে বিতর্কের অতীত

করে তুলি, কিছুদিন বাদে তাঁকে স্মৃতি থেকে নির্বাসন দিই। তখন বাকি থাকে শুধু দেয়ালে ছবি, আর রাস্তার মোড়ে পক্ষিপুরীষাবৃত প্রস্তরমূর্তি। মোহিতলাল একাধিক বাঙালী মনীষীকে এই দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করেছেন।

মোহিতলালের কাব্যের স্বকীয়তা ও তাঁর গদ্যের বলিষ্ঠতার সাহিত্যিক বিচার যোগ্যতর সমালোচকরা করবেন। তাঁর নিজের সমালোচনা নির্ভীক ছিল, তাঁর ভয় করবার কারণ নেই পরের সমালোচনার। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার দীন সমালোচনাসাহিত্য দীনতর হোলো, অতীত সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের যোগসূত্র ছিন্ন হোলো, সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হোলো। এর প্রত্যেকটি বৃহৎ ক্ষতি। এগুলির চাইতেও বৃহত্তর ক্ষতি হোলো এই যে অপ্রিয়ভাষী নির্ভীক সমালোচকের সংখ্যা এক থেকে শূন্যে এসে দাঁড়ালো।

দুঃখের সঙ্গে স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনের অন্যান্য সকল শাখায় যে চিত্তদৌর্বল্য প্রসার লাভ করেছে, সাহিত্যও সে সংক্রমণ থেকে মুক্ত নেই। ইনি উনি, আমি—আমরা সবাই কম-বেশি অপরাধী এ অপরাধে। সবাই যেন অপ্রিয় কথা বলতে ভয় পাই। শুধু ভয় নয়, শুধু দৃঢ় বিশ্বাসের অভাব নয়, কী একটা রকমের মানসিক আলস্য যেন আমাদের সবাইকে পেয়ে বসেছে। দুটো ভালো কথা বললে যদি শান্তি বজায় থাকে, কাজ কী ঝামেলায় সত্য কথা বলে? অমুকের বইয়ের যদি আমি সপ্রশংস আলোচনা লিখি, তাহোলে আমার নিজের পরের বইয়ের ইনস্যুরেন্স হোলো—তাঁর সাধ্য কী তিনি আমার বইয়ের নিন্দা করবেন! এই রকমের একটা মনোভাব আজকের সাহিত্যিকদের মধ্যে দুর্লভ নয়। তাই প্রকাশ্যে আজ সব লেখক আর-সব লেখকের অনুরাগী। আড়ালে? কান পাতা দায়।

রাজনীতির মতো সাহিত্যের গণতন্ত্রেও একটা বিরোধী দল চাই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে লীডার অব দি অপোজিশন ছিলেন মোহিতলাল। এমন বিকল্প নেতার মৃত্যু শুধু বিরোধী দলের ক্ষতি নয়, গোটা সাহিত্যের ক্ষতি।

৯ আগস্ট, ১৯৫২

বিবাহ ও বিচ্ছেদ

এক দুই হতে চাইল। বিয়ে হোলো। তারপর দুই এক হতে চাইল। প্রাণপণ চেষ্টা করল। কিন্তু হোলো না। মিলন ব্যর্থ হোলো।

তারপর? তাই নিয়েই তীব্র মতভেদ।

আমি দু'রকমের লোকদের বুঝতে পারি। এক, যাঁরা বিবাহ-বিচ্ছেদের বিরোধী; আর দুই, যাঁরা বিবাহ-বিচ্ছেদের সমর্থক। তর্কশাস্ত্রের একান্ত প্রাথমিক সূত্রগুলির সঙ্গে যাঁদের সামান্যতম পরিচয় আছে তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না যে আমার সহনশীলতা সীমাহীন। কেননা, বলা বাহুল্য, উল্লিখিত দু'টি বিরুদ্ধ মতের যোগফল গোটা বিশ্ব। এর বাইরে কোনো তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব স্পষ্টতই অসম্ভব।

আমি নিরপেক্ষ বিচারক নই। নির্ভীক, নিঃসঙ্কোচ উকীল। একটু পরেই তার পরিচয় মিলবে। কিন্তু দু'পক্ষকেই বলতে দেয়া যাক তাঁদের বক্তব্য। দু'পক্ষেরই উক্তিতে যে স্পষ্টবাদিতার আভাস পাওয়া যাবে তাতে মনে হবে যুক্তিগুলি বোধহয় বাড়িয়ে বলা। সেটা ঠিক নয়। শুধু স্পষ্ট করে বলা, নির্ভয়ে বলা।

প্রথম পক্ষ বলেন: বিবাহকে আমরা মানুষের আর পাঁচটা চুক্তির সঙ্গে তুলনীয় বলে মানিনে, যা ভঙ্গ করতে এক বা উভয় পক্ষের সম্মতিই যথেষ্ট। আমাদের বিবাহ তো এক জোড়া নরনারীর মিলন শুধু নয়, এ হচ্ছে ঈশ্বরের পায়ে দু'টি আত্মার সম্মিলিত উৎসর্জন। এ উদ্বাহে উচ্ছেদ থাকতে পারে, বিচ্ছেদ নেই। ভগবান যাদের এক করেছেন, তাদের বিচ্ছিন্ন করবে কোন দুর্বিনীত নরাধম? Marriages are made in heaven, তারপর সেই বিবাহিত জীবন যদি নরকে পরিণত হয়, তার জন্যে অভিযোগ করবার অধিকার নেই। সে অভিশাপ মেনে নিতে হবে। মা কি শিশুকে বেছে নেয়? না মেনে নেয়? বিধাতা কি দোকান সাজিয়ে বসেছেন যে, যে যার পছন্দ মতো সাথী বেছে নেবে, আবার কিছুদিন বাদে অপছন্দ হলে বদলে নেবে? সে যে ঘোর অনাচার। সে যে মানুষের অপমান। সে যে অনিত্য

কামনার পায়ে আত্মসমর্পণ। সতী-সাবিত্রীর দেশে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা উচ্চারণ করাও পাপ। আর দেখো না য়ুরোপ আমেরিকার দিকে। ছি, ছি। আর্টি শ স্ত্রী বদলাচ্ছেন তোমরা যেমন সিগারেট বদলাও, আভা গার্ডনারের তো যতগুলি টুপি ততগুলি স্বামী। সকালে একটা, বিকেলে একটা। একেই কি বলে সভ্যতা? আমাদের ঐতিহ্য. আমাদের ধর্ম, আমাদের বিশ্বাস—সব কিছু এ সব সমাজধ্বংসী, অধার্মিক অন্যায়ের বিরোধী। শত সহস্র বৎসর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে সমাজব্যবস্থা আমাদের জীবন পুষ্ট করেছে তার বদল আমাদের সম্মতি নিয়ে হবে না, হলে তা হবে আমাদের মৃতদেহের উপর দিয়ে।

স্পষ্ট, বলিষ্ঠ, ভক্তিনিষ্ঠ মতবাদ।

দ্বিতীয় পক্ষ বলেন: ঈশ্বরের ভাবনা তিনি নিজে ভাববেন। তাঁর বোঝা বইবার ঔদ্ধত্য আমাদের নেই। তাঁকে তাই বাইরে রাখা যাক আমাদের ঘরোয়া তর্ক থেকে। মিছে কথা বলব না, আমাদের বিয়ে স্বর্গে হয়নি। হয়েছিল পাড়ার মেয়ে-ইস্কুলের ছাদে। বিধাতা দোকান সাজিয়ে বসেছেন কিনা জানিনে, তবে বেছে নিতে আমাদের অভিভাবকরা বিচক্ষণতার অভাব দেখাননি। লটারি করে বিয়ে হয়নি; একাধিক পাত্রাকে যাচাই করা হয়েছে সর্বদা কঠোর, কখনো কুৎসিত, পরীক্ষায়। এমন বিবাহকে পরে লটারি বলে মানব কেমন করে? আমরা বলি, মানুষ যা করেছে তা মানুষেরই বদলাবার অধিকার আছে। অভিশাপকে অভিশাপ বলে মেনে নেয়া ক্লীবতার নামান্তর, তার প্রতিকার সন্ধান করে মানুষ মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। ধর্ম? ক্ষমা করবেন, কিন্তু একে আমরা কিঞ্চিৎ সন্দেহের চোখে দেখি। এরই নামে তো এই সেদিন সতীদাহ নিবারণ বন্ধ করবার চেষ্টা হয়েছিল, বিধবা বিবাহ প্রতিরোধ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল ও দু'টো আইন পাশ হলে আর হিন্দুধর্মের কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। কই, তা তো হয়নি। তা ছাড়া, আবার সত্য বলি, আমরা বিয়ে করেছি সুখের সন্ধানে, পুণ্যার্জনের জন্যে নয়। য়ুরোপ আমেরিকার দৃষ্টান্ত? ক্যাথলিকরা পুনর্বিবাহে সম্মতি দেয় না বটে, কিন্তু সুইডেনের মতো

সভ্য দেশে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ পর্যন্ত দর্শাতে হয় না, দু'পক্ষ রাজি হলেই হোলো—যেমন দু'পক্ষ রাজি হলেই বিয়ে হয়। সাবিত্রীকে সত্যবান থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে তো আমরা আইন চাইছিনে, থাকুন তাঁরা তাঁদের অনীর্ষিত স্বর্গে। আইন চাই রাম আর শ্যামার জন্যে, সুখের ঘর যাদের গরল ভেল।

স্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও যুক্তিনিষ্ঠ মতবাদ।

আগেই বলেছি, আমি এই দু'দলকেই বুঝি। তবে আমার বিবাদ কার সঙ্গে? দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায় সকলের সঙ্গে। বিশেষ করে আমাদের আইন-কর্তাদের সঙ্গে। কেননা তাঁদের অধিকাংশই কী এক অবোধ্য আশঙ্কায় যেন সন্ত্রস্ত। কারো মতপ্রকাশেই দ্বিধা, কারো বা প্রকাশিত মত অনুযায়ী কাজ করতে অনুদ্যম।

শ্রীনেহরু একাধিকবার বিবাহ বিচ্ছেদের পক্ষে বক্তৃতা করেছেন। এমনকি বলেছেন যে, তাঁর নেতৃত্বে দেশবাসীর আস্থা-অনাস্থাও এ দিয়ে নির্ধারিত হবে। কাজের বেলায় তিনি লজ্জাকর দ্বিধার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিশ্রুত প্রস্তাবটি খণ্ডিত করে আবার আপন খণ্ডিত মন করুণভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন।

অপর পক্ষে আইনসচিব শ্রীবিশ্বাস দেশের মনে সন্দেহের অবকাশ রাখেননি যে, বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তনে তাঁর গভীর অনীহা। তবু তাঁর দিক থেকে প্রকাশ্য বিরোধিতা নেই, আছে নানা অর্ধকর্ম ও অপযুক্তির অন্তরালে আত্মগোপনের প্রয়াস। যথা, বিধবা বিবাহ তো আইনসিদ্ধ হয়েছে, ক'জন তার সুযোগ নিয়েছে? কেন যে নেয়নি তা বিশ্বাস মশায়ের অজানা নয়। সে ইতিহাস খোলা বই।

রাষ্ট্রসভায় বিতর্কের সময় শ্রীবিশ্বাস একটি বিস্ময়কর চুক্তিপত্র পাঠ করেছিলেন। বর্তমান ব্যবস্থার অপর্যাপ্তা তাতে আরেকবার স্পষ্ট হয়েছে। একটি সংবাদপত্র তার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বিজ্ঞ সুরে বলেছেন, ব্যতিক্রমের জন্যে আইন হয় না। উক্তিটি প্রশ্নভিক্ষার (নিয়ম না থাকলে ব্যতিক্রমের প্রশ্ন অবান্তর) একটি নির্লজ্জ নিদর্শন। বহুর জন্যে আইন

অনাবশ্যক, বহু তার সংখ্যার জোরে স্বপ্রতিষ্ঠ। আইনের প্রয়োজন সংখ্যালঘিষ্ঠের জন্য। আইনের এই গোড়ার কথাটি সম্পাদকীয় লেখকের না জানা থাকলে লজ্জার কথা। দুঃখের কথা এই যে, তা আইনসচিব তথা লঘিষ্ঠমন্ত্রীরও অজ্ঞাত।

না কি অজ্ঞতা নয়, অন্য কিছু?

নিবন্ধ-সূচনার নষ্টনীড়ে অসুখী দম্পতীর অভিশাপ অক্ষয় হোক। তাদের ভাঙা মন বহন করুক পূর্বজন্মের দুর্ভাগ্য।

কিন্তু সরকারের ভাঙা মনে জোড়া লাগবে কবে?

২৩ আগস্ট, ১৯৭২

সার্থক বনাম সফল

আমার রাজনৈতিক চেতনা এত ক্ষীণ (কিংবা সাহিত্যিক বোধ এত প্রখর), যে মতৈক্য হলেও আমি কোনো লেখকের রচনার অক্ষমতা ক্ষমা করতে পারিনে। তেমনি ভিন্নমতাবলম্বী হলেও সার্থক লেখকের লেখা উপেক্ষা করতে আমি অক্ষম। এই নীতিতে দৃঢ় থাকার সুবিধা এই যে, রাতারাতি আমার জিদ্, অরওয়েল বা মালরোর সাহিত্যিক গুরুত্ব সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করতে হয় না। অসুবিধা এই যে প্রায়শই অপ্রিয়ভাষণ করতে হয়। রাজনৈতিক কুয়াশা সাহিত্যিক দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু রাজনীতির রাহুর সাহিত্যের পূর্ণগ্রাসের একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রাডিয়ার্ড কিপলিং। প্রধানত একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উদ্ধৃতির কল্যাণে এই অসামান্য গল্পলেখক ও কবি ভারতে ঘৃণিত এবং বাইরেও অনাদৃত। দেশীয় ঘৃণা এত প্রবল যে কোনো ভারতীয় কিপলিঙের প্রশংসা করলে তা প্রায় দেশদ্রোহিতা বলে পরিগণিত হয়।

এগারো বছর আগে টি এস এলিয়ট এবং মাস দেড়েক আগে সমরসেট ম'ম যথাক্রমে কিপলিঙের পদ্য ও গদ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে তবু অন্তত

একজনের আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। যদিও আমার এক শিক্ষকের প্রেরণায় আমি কৈশোরেই কিপলিঙের রাজ্যে প্রবেশের আনন্দ ও অধিকার লাভ করেছিলেম এবং কোনো কারণেই সে অনুরাগ ক্ষুণ্ণ হতে দিইনি। সমগ্রভাবে কিপলিঙের রচনা পাঠ করলে তাঁর বহুঘোষিত ভারতীয়বিদ্বেষের সাক্ষ্য তার সত্যকার অকিঞ্চিৎকরতায় পর্যবসিত হয় এবং তাঁর কালের রাজনীতিক মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে অস্বীকার করবার উপায় থাকে না যে, তার সাম্রাজ্যবাদ যতটা তাঁর দেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত বিকাশ, পরের প্রতি ঘৃণার বিকার ততটা নয়। তার গল্পগুলিতে শুধু অসামান্য শক্তিরই পরিচয় নেই, পরিচয় আছে ভারতের বিশেষ এক প্রান্তের বিশেষ এক শ্রেণীর ভারতীয়দের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার।

কিন্তু কিপলিঙের সাহিত্যিক মূল্যনির্ধারণ বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত। আমার আলোচ্য সদ্যপ্রকাশিত কিপলিঙের গল্পসংকলনে সমরসেট মমের ভূমিকাটির কয়েকটি মন্তব্য। গল্পলেখক মমের প্রতি আমার অনুরাগ কারো চেয়ে কম নয়। কিন্তু প্রবীণ ও জনপ্রিয় লেখকের আসন থেকে তিনি যখন অন্যান্য লেখকদের সম্বন্ধে রায় দিতে উদ্যত হন তখন তাতে না থাকে উদারতার আভাস, না যুক্তিসম্মততার। মাঝে মাঝে এমন সন্দেহও উদ্রিক্ত হয় যে তিনি বিচারের আবরণে [illegible] ব্যস্ত। তার [illegible] গুণগানের অন্তরালেও অনুরূপ [illegible]প্রতিষ্ঠাপনের প্রয়াস একেবারে অস্পষ্ট নয়।

মম বলছেন "কিপলিং যে কখনো কখনো দীন অবিশ্বাস্য বা তুচ্ছ গল্প লিখেছেন তাতে অবাক হওয়া উচিত নয়। বিস্ময়ের বস্তু হচ্ছে এই যে, তিনি এতগুলি ভালো গল্প কী করে লিখলেন।' একটু পরে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন রচনাপ্রাচুর্য লেখকের দোষ নয়, গুণ। সব মহান লেখক অনেক লিখেছেন। তাঁদের সব লেখাই ভালো হয়নি; শুধু মাঝারি ধরণের লেখকরাই বরাবর তাঁদের মাঝারিত্ব বজায় রাখতে পারেন। সত্যকার বড় লেখকেরা মাঝে মাঝে হঠাৎ অমূল্য লেখা সৃষ্টি করতে পেরেছেন এই জন্যেই যে তাঁরা অনেক লিখেছেন।" অর্থাৎ? অর্থাৎ লেখকের পক্ষে আত্মসমালোচনা

অনাবশ্যক, প্রতি রচনাই প্রকাশযোগ্য এবং মহৎ সৃষ্টি বৃহৎ উৎপাদনের একান্ত আকস্মিক উপজাতক। এমন মত শুধু ভিত্তিহীন নয়, অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে রচনায় অযত্ন প্রশ্রয় পায়, সাহিত্যসৃষ্টি লটারির স্তরে নেমে আসে। সফল লেখকের মুখ থেকে উচ্চারিত হলে এমন উক্তির ক্ষতিসাধ্যতা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৬এ এডমণ্ড উইলসনের তিরস্কার* সত্ত্বেও ম'ম আজো বুঝতে পারলেন না যে সফল লেখক মাত্রই সার্থক লেখক নন। কিপলিং সফল লেখক ছিলেন, ম'মকেও শুধুমাত্র সফল লেখক বলে অবজ্ঞা করলে অবিচার হয়; কিন্তু তার মানেই তো এই নয় যে ক্রেতৃসংখ্যাই সাহিত্যবিচারের একমাত্র মানদণ্ড। অথচ ম'ম অল্পপ্রিয় লেখকদের প্রতি অশোভন শ্লেষের লোভ কখনো সম্বরণ করতে পারলেন না। আলোচ্য ভূমিকাতেও এই সস্তা বিদ্রূপের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। এটা শুধু মূঢ়তা নয়, একান্ত রুচিহীন। এ যেন নবধনীর ঐশ্বর্য প্রদর্শন, এ যেন রূপবতীর অশালীন অবজ্ঞা গুণবতী সামান্যদর্শনার প্রতি। রূপগ্রাহীর সংখ্যাধিক্য যেমন নারীত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়, তেমনি পাঠকসংখ্যাই রচনার শ্রেষ্ঠতার অকাট্য প্রমাণ নয় নিশ্চয়ই। একথাও ম'মের জানা উচিত যে লোকপ্রিয় লেখক সম্বন্ধে প্রশংসাকৃপণতা সর্বক্ষেত্রেই ঈর্ষাজাত নয়। এই কথাগুলি আমি এমন অসংকোচে বলতে পারলেম এই জন্যে যে—বাঙালী পাঠককে ধন্যবাদ—আমি একেবারে অবিক্রেয় গ্রন্থকার নই। কিন্তু তাই বলে বিক্রয়কেই সাহিত্যপ্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে জ্ঞান করব—এ ধিক্কার থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।

সবচেয়ে আপত্তিকর হচ্ছে উপভোগ-সর্বস্ব সাহিত্যের প্রতি ম'মের অলজ্জ পক্ষপাত। উপভোগ্যতার প্রতি উন্নাসিক অবজ্ঞা থেকে আমি একেবারেই মুক্ত, কিন্তু ম'মের সঙ্গে মতান্তর আমার উপভোগের শ্রেণী-বিচার নিয়ে। পিত্তশূল ও চিত্তশূল যেমন শুধু অবোধের কাছে সদৃশ, তেমনি উপভোগেরও স্তরভেদ আছে। রাজসিক ও তামসিক উপভোগ কি এক পদার্থ? ম'ম পড়লে তাই মনে হবে।

* *Classics and Commercials* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

এবং ভুল মনে হবে। ধারণাটি যে ভ্রান্ত তা ম’মের রচনা থেকেই দেখানো যেতে পারে। তাঁর ‘দি এলিয়েন কর্ন’ গল্পটির রস ‘দি অ্যাণ্ট অ্যাণ্ড দি গ্র্যাসহপার’ এর রস থেকে একেবারেই আলাদা জাতের। তাঁর ‘অব হিউম্যান বণ্ডেজ’ যে শ্রেণীর উপন্যাস, ‘দেন অ্যাণ্ড নাউ’ সে শ্রেণীর নয়।

উপভোগ্যতার উপাসনা করেই ম’ম ক্ষান্ত নন। সাফল্যের ময়ূরপুচ্ছ সঞ্চালন করে তিনি প্রায়ই বলবেন কিপলিং-প্রসঙ্গেও বলছেন, ঔপন্যাসিক বা গল্পলেখকের ভাবুক হবার প্রয়োজন নেই। মানলেম। কিন্তু তার পরেই: “আমি এমন কোনো বড়ো কথাসাহিত্যিকের নাম স্মরণ করতে পারিনে যিনি চিন্তানায়কও ছিলেন।” এখানেও শুধু কিপলিঙের ওকালতি নেই, আছে আত্মসমর্থন। তত্ত্বচিন্তা প্রায়ই চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনী বর্ণনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই তিনি এমন দু’ চারজন প্রতিভাবান কথাশিল্পীর কথা স্মরণ করতে পারতেন যারা একাধারে সার্থক লেখক এবং গম্ভীর ভাবুক বলে সম্মানিত। টলস্টয়, শ, টমাস মান্ ইত্যাদির কথা ম’ম শোনেননি, এমন হতেই পারে না।

পাঠযোগ্য লেখকমাত্রই যে নির্ভরযোগ্য সাহিত্যসমালোচক নয়, সমরসেট ম’ম তার অন্ততর দৃষ্টান্ত।

৬ ডিসেম্বর ১৯৫২

সাহিত্যে সব্যসাচী

কাপড়ের দোকানে ভীড় ছাড়াও আসন্ন পূজার অপর একটি ইঙ্গিত পেয়েছি। স্থূলকায় শারদীয়া সংখ্যাগুলি ভর্তি করার সম্পাদকীয় সমস্যার কল্যাণে দুয়েকটা কাগজ থেকে লেখার আমন্ত্রণ পেয়েছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুরোধরক্ষায় অক্ষমতা জ্ঞাপন করে উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছি।

অনুরোধ ছিল গল্পের, প্রবন্ধের বা খণ্ডোপন্যাসের। এই ত্রিক্ষেত্রেই আমি দেবদূতদের দ্বিধায় নিরস্ত না হয়ে নির্ভয়ে বিচরণ করতে প্রস্তুত। আমার এমন অবিচক্ষণ আচরণের কারণ আমার কৌতূহল বহুশাখ, আমার প্রতিষ্ঠা-

ভিলাষ চঞ্চল, আমার একনিষ্ঠতা কর্পূরধর্মী। কিন্তু আমার কথা থাক। আমাব প্রতিপাদ্য হচ্ছে এই যে সাহিত্যে তথা জীবনে বহুমুখীনতার উপাসক হতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা।

বিষয়টা দু'দিক থেকে বিচার করা যাক। প্রথমে লেখকের নিজের দিক থেকে। একাধিক মাধ্যমে মুক্তি আছে, কিন্তু একনিষ্ঠতায় আছে নির্ঝঞ্ঝাট শান্তি। অবিভক্ত সাধনার যে অমূল্য পুরস্কার তা ভক্তেরই প্রাপ্য, পতঙ্গমনার নয়। বস্তুত, এই রকমেব চেষ্টাই যুগধর্মসম্মত। প্রবন্ধকার শুধু প্রবন্ধ লিখবে আর সব কিছুকে ভয়াবহ পরধর্ম জ্ঞান করে শতহস্ত দূরে রাখবে—আধুনিক কারখানায় ফিটার যেমন এক হাত দূরের জয়নারের কাজের বিন্দুবিসর্গও জানে না এবং কদাচ হস্তক্ষেপ করতে যায় না। সাহিত্য এতে সঙ্কীর্ণ হতে পারে, ব্যক্তিত্ব এতে সঙ্কুচিত হতে পারে, কিন্তু পদ্ধতি ও দক্ষতার মান যে উন্নীত হবে তাতে সন্দেহ নেই। শিল্পক্ষেত্রে এই শ্রেণীব শ্রমবিভাগ নতুন কিছু নয়। উপেন আর মঞ্জুলীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন, আর শরৎচন্দ্র লিখেছেন গল্প বা উপন্যাস।

বিবাদ বাধে রবীন্দ্রনাথ গল্পোপন্যাসে হাত দিলে, শবৎচন্দ্র ছন্দোবন্ধ রচনায় অনধিকারচর্চা করতে চাইলে। এ বিবাদ গৃহবিবাদ নয, অর্থাৎ শিল্পীর মনে এ নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। তিনি তাঁর প্রেরণার অপ্রতিরোধ্য অনুজ্ঞায় কাহিনী বা কাব্য রচনা করেছেন মাত্র। তর্কটা পাঠকের মনে। পাঠক বলেন, অন্তত দু'দিন আগেও বলতেন, হ্যাঁ, পদ্যে রবিবাবুর তুলনা হয় না ঠিক, কিন্তু উপন্যাসে শরৎবাবুর জুড়ি নেই। 'নানা রবীন্দ্রনাথের মালা'র কথায় পরে ফিবব।

এই অর্বাচীন তুলনাটা একেবারে অসঙ্গত নয। সাহিত্যের কোনো একটি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট হতেই দুর্লভ ক্ষমতা ও প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন। একাধিক ক্ষেত্রে সে প্রয়াস বিভক্ত হলে চেষ্টাবিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী এবং ক্ষমতাও অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব নয়। তখন পাঠক তথা সমালোচক যদি বলেন যে, ক ভালো কবিতা লেখেন বলেই তাঁর গল্প বা নাটকেরও প্রশংসা করতে হবে, এ কেমন কথা? খ ভালো বলেন, কিন্তু তিনি লিখতে এলে

তাঁর অনধিকার সমঝিয়ে না দিলে আমরা আর সমালোচক হয়েছি কেন? গ ইংরেজি জানেন, কিন্তু তিনি বাঙলা লেখেন কেন? ঘ সাংবাদিক, তাঁর কেন বাসনা গ্রন্থকার হবার? রাম হাতে লেখনী পেয়েছেন, লোভ কেন তাঁর শ্যামের বাঁশির উপর?

প্রশ্নগুলি—আসলে এগুলি প্রশ্নবেশী উত্তর—একান্ত যুক্তিসঙ্গত। এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে—এবং এটা আমার প্রশ্ন—এক ক্ষেত্রে সাফল্য অন্য ক্ষেত্রে প্রয়াসের সার্থকতার গ্যারান্টি নয়, কিন্তু এক ক্ষেত্রে সাফল্য হয়েছে বলেই লেখক অন্য ক্ষেত্রে অনধিকারী বলে বিবেচিত হবে কোন বিচারে? অথচ অজস্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি যেখানে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যই সৃষ্টির অপকর্ষের প্রমাণ বলে প্রদর্শিত হয়েছে।

বাঙলা সাহিত্যেও এমন উদাহরণের অভাব নেই। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করাই নিরাপদ হবে। জে বি প্রিস্টলি যেহেতু প্রথমে নাম করেছিলেন ডিকেন্সীয় ধরণের উপন্যাস লিখে, তাঁর নাট্যসাহিত্য বারবার লাঞ্ছিত হয়েছে পেশাদার নাট্যসমালোচকদের হাতে। সমরসেট ম'ম যখন হাল্কা নাটকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গুরু উপন্যাসে হাত দিলেন, বিজ্ঞ সমালোচকরা নস্য নিয়ে আপত্তি জানালেন। মাঝে ছোটগল্প লিখতে শুরু করলে তাঁরা বললেন, উপন্যাসেই তাঁর হাত ছিল। পরে আবার উপন্যাস লিখলে রায় হোলো: ছোটগল্পই তাঁর আসল *metier*. হার্বার্ট রীড ও সার ম্যাক্স বীয়রবম বেলক-চেস্টারটনের মতো একাধিক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে আলোচকদের বিরাগভাজন হয়েছেন। কিছু দিন আগে পর্যন্ত টি এস এলিয়ট নাটক লিখলে আমরা সবাই বলেছি,—নাটকের উপজীব্য সঙ্ঘাত, কাব্যের সমন্বয়; দু'য়ের বিরোধ মূলগত। বিবাহ নিষিদ্ধ। ব্যাপারটার পোয়েটিক্ জাস্টিস্ শুধু এই যে ভি এস প্রিচেট বা এডমণ্ড উইলসনের মতো সমালোচকরা যখন উপন্যাস লিখতে গেছেন তখন তাঁদেরও গঞ্জনা সইতে হয়েছে—গালি বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে।

আরো বিপদ হয় যখন শিল্পী শুধু শিল্পী ন'ন, প্রচারক বা দার্শনিকও। হয় তাঁর লেখা প্রচারগন্ধী বলে প্রত্যাখ্যাত হবে, তা নয়তো তাঁর বক্তব্য

অগভীর বলে উপেক্ষিত বা উপহসিত হবে। বার্নার্ড শ সারাজীবন এই লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। তাঁর নাট্যসমালোচনা তৎকালীন নটরা উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন এই বলে যে, ওগুলি ব্যর্থ নাট্যকারের দ্বেষোদ্গার। পরে নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলে প্রচারক তথা দার্শনিক শ হয়ে দাঁড়ালেন উপহাসের লক্ষ্য। আরো পরে যখন সংস্কারক শ'কে উপেক্ষা করা অসম্ভব হোলো, তখন তাঁর নাটকগুলিকে বিজ্ঞ সমালোচকরা প্রচার-সর্বস্ব বলে চিহ্নিত করলেন। আজকের দিনে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, জোড, বার্নাল, হল্ডেন, সার্ত্র, ক্যেসলার, অলডাস হাক্সলে,—সবাই সেই একই সমস্যার সম্মুখীন। প্রত্যেকেরই দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য আলাদাভাবে স্বীকৃত আর বাকিটা হেলাভরে অবজ্ঞাত। কেননা প্রত্যেকেই সেই অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী, প্রত্যেকেই স্বধর্মে নিবদ্ধ না থেকে অপরাপর ক্ষেত্রে 'অনধিকার' প্রবেশ করেছেন। সেখানে তাঁদের সাফল্য বা গুরুত্ব কিছুতেই স্বীকৃত হবে না। শুধু তাই নয়, এমনকি লেখা সরস হলে সারবান বলে সম্মান পাবে না। যে দোকানের আলোকসজ্জা উজ্জ্বল তার পসরা যেন দীন হতে বাধ্য।

টয়নবির অনুসরণে আগেই বলেছি, এটা হচ্ছে জ্ঞানের রাজ্যে যন্ত্ররাজের দৌরাত্ম্য। যে যার চাকা বা স্ক্রু নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, সমগ্র সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। এটা বিশেষজ্ঞের যুগ, বিশ্বকোশিকদের নয়। কিন্তু এ মতটাও আমরা পুরোপুরি মেনে নিই নি। মৃত শ'কে আজ সাম্যবাদীরা সম্মান করে, নাট্যসমালোচকরা পুজো করে। রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধই শুধু নয়, চিত্রকর ও চিন্তানেতা রবীন্দ্রনাথের পুনরাবিষ্কার আরব্ধ হয়েছে। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর উপাসক লেওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁরও জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছে কিছুদিন আগে প্রত্যেক সাংস্কৃতিক রাজধানীতে। প্রত্যেকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর অবিশ্বাস্য বৈচিত্র্যের প্রতি।

জীবিতদের বেলায় এমন উদারতা নেই কেন? আমি বলি কারণটা অনুদারতা।

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

অ-রম্য রচনা

অ-রম্য রচনা আমি লিখতেই পারিনে। (সেই অর্থে যাতে 'ম্যাণ্ডারিন' লেখক সার অসবার্ট সিটওয়েল সম্প্রতি বলেছেন, 'আই অ্যাম এ রাইটার হু, ফর বেটার অর ওয়ার্স, ক্যাননট রাইট উইদাউট মেকিং অব্ হোয়াট হি ইজ্ রাইটিং এ ওয়ার্ক অব্ আর্ট।') তবু বাঙলা রম্য রচনার দ্রুতবর্ধমান কলেবরে অধিকতর স্ফীতিসাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে যে 'বিকল্প' প্রবন্ধপর্যায়ের সৃষ্টি হয়নি, আজকের এই অন্তিম নিবন্ধে সেই কথাটি নিবেদন করতে চাই। রমণীয়তা আমার একটি প্রবন্ধেরও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না।

রম্য রচনার বর্তমান জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণের দুরভিসন্ধিও যে ছিল না, তা আমার রচনামালার নামেও নিশ্চয়ই গোপন রয়নি। উদ্দেশ্য ছিল প্রতি পক্ষে কারো না কারো প্রতিপক্ষ হওয়া, প্রচলিত কোনো মত বা বিশ্বাসের প্রতিবাদ কবা, ভ্রান্ত নিশ্চয়তার পরিবর্তে সাধু সংশয়ের সমীচীনতা প্রচার করা। চলন্তিকায় 'বিকল্প' শব্দটির অর্থ দেয়া আছে—বিভিন্ন কল্পনা, ভেদবুদ্ধি, সংশয়। এই তিন অর্থেই আমি 'বিকল্প' নামটি সানন্দে নির্বাচন করেছিলুম; শুধু বর্তমান প্রসঙ্গে ভেদবুদ্ধির অর্থ আমার কাছে ছিল সেই বুদ্ধি যা ন আর ণ-এর মধ্যে প্রভেদ দেখতে জানে এবং সেই ভেদজ্ঞান সদাজাগ্রত রেখে মঞ্চে বা পত্রে বিজ্ঞাপিত প্রত্যেকটি সমস্যা ও সমাধান যুক্তি দিয়ে বিচার না করে কিছুতেই গ্রহণ করে না।

গোড়াতে অভিলাষ ছিল, শুধু সাহিত্যবিষয়ক আলোচনায় আমার বিভিন্ন কল্পনা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করব। ভেবেছিলুম, বাঙলা সাহিত্যের বর্তমান বন্ধ্যতার যুগে আলোচনার অন্তত উন্নতি ও প্রসার ঘটবে এবং আমার লেখবার বিষয়ের অভাব হবে না। মোহভঙ্গে বিলম্ব হয়নি। পুরো এক বছরে পুরোপুরি সাহিত্যিক এমন একটাও গোলযোগ কোনো লেখক তোলেননি যাতে গলাযোগ করে কলম জুড়োতে পারতুম। তাই এই পর্যায়ে অনেক প্রবন্ধ সাহিত্যসম্পর্কশূন্য সামাজিক বা রাজনীতিক আলোচনায় বিষয় খুঁজেছে। বোধহয় ভালোই হয়েছে। শূন্যোদ্যানে সাহিত্যের ফুল

ফোটাবার প্রয়াস যখন প্রায় সবাই পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, সাহিত্যসৃষ্টি ও সামাজিক পরিবেশের কার্যকারণ সম্বন্ধ যখন প্রায় সর্ববাদিসম্মত, বিশেষ করে লিখছি যখন সাময়িক পত্রের জন্যে, তখন সাহিত্যবহির্ভূত অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করে অনধিকার চর্চা বোধহয় করিনি।

অবিনয়ের অভ্যাস করেছি কি? আগেই বলেছি, সকলের সঙ্গে সম্মতি জ্ঞাপন করে প্রীতি-সম্পাদনের উদ্দেশ্য ছিল না; প্রশস্ত সমর্থন বিলিয়ে 'কুইড প্রো কুয়ো' হিসাবে প্রশস্তি কুড়োবার বাসনাও ছিল না। অভিপ্রায় ছিল একেবারে বিপরীত। 'সবারে বাসরে ভালো' মনে না রেখে মনের কালো (আমার এবং পাঠকের) ঘোচাতে চেয়েছি তর্কের আলো দিয়ে। সেই চেষ্টায় অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্যক্তি ও দেশ নির্বিশেষে অপরের বুদ্ধি যেমন ঋণ করেছি, তেমনি আলোচনাও করেছি উচ্চ-নীচ নির্বিচারে অনেক ব্যক্তির মতামতের। অবিনয়ের অভিযোগ স্বীকার করব না এইজন্যে যে, আলোচিত ব্যক্তিদের মতামত অশ্রদ্ধেয় বা বিবেচনার অযোগ্য বলে মনে করলে তা নিয়ে আমি লিখতুমই না। ঔদাসীন্য-দত্ত সম্মতির মধ্যে অশ্রদ্ধা আছে: অবিনীত হলেও, বিরোধী হলেও, সমালোচনায় তা নেই, বরং এই পরোক্ষ স্বীকৃতি আছে যে আলোচিত ব্যক্তি এবং তাঁর মত আর যাই হোক উপেক্ষণীয় নয়।

সংবাদপত্র, এমনকি সাময়িক পত্রিকার জন্যে লেখা মানেই রচনার দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে একটা রকমের পরিমিতি মেনে নেওয়া। যুদ্ধের সময় সরকারী নির্দেশে ভারতীয় চলচ্চিত্রে যে দৈর্ঘনিয়ন্ত্রণ হয়েছিল, তাতে ছবির ভালো হয়েছিল, অন্তত এগারো হাজার ফিটের বেশি মন্দ প্রশ্রয় পায়নি। বাঙলা রচনার স্বভাব-বাচালতাও অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হোতো যদি আমাদের কাগজগুলি অতিভাষী লেখকদের প্রতি আরো কঠোর হতেন। আমি যে স্বেচ্ছায় সার হ্যারল্ড নিকলসনের মতো এক পৃষ্ঠার শৃঙ্খলে নিজেকে বন্দী করেছিলুম, তা ওই উচ্ছৃঙ্খল-বাক্ না হয়ে বাক্-সংক্ষেপ অনুশীলন করতে, এক কথাকে দিয়ে পাঁচ কথার কাজ করাতে, বিস্তর না কয়ে মিছা কওয়া এড়াতে। কথায় কথা বাড়ে, তার অর্থ কমে সেই পরিমাণে। বাক্যে অপব্যয়ী হলে কথাগুলি

দ্রুত দেউলে হয়ে যায়। ক্রমে কথার কারবারী লেখকের অনেক বলতে হয়, কিছুই বলা হয় না।

বাকি রইল আমার নিজের মতের কথা, কেননা, 'সব ঝুটা হ্যায়' বলে নিজের মত অব্যক্ত রাখলে আমায় কেউ পাগলা মেহের আলী বলে গাল দিলে প্রতিবাদ করতে পারতুম না। যখন মত ছিল, তখন অপ্রিয়ভাষণের ভয়ে তা অকথিত থাকেনি। সংশয় থাকলে নিঃসঙ্কোচে তাও প্রকাশ করেছি। সর্বদা স্মরণ রেখেছি যে, 'certainty, expressed in words, may always be fa'se and reactionary.'*

কর্মীর কাছে এই সংশয়াকীর্ণ দ্বিধা যে অবজ্ঞার বস্তু তা নিতান্ত সঙ্গত। তা নইলে তাকে পঙ্গু হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু যার কাজ শুধু অন্যের কাজের বিচার করা, সে কেন নিশ্চয়তার মধ্যে কর্মোন্মাদনার সন্ধান করবে? সে কেন একটু সময় করে একাধিক মতের ওজন করবে না? সংস্কার বা প্রচারের কুজ্ঝটিকা সরিয়ে সে কেন প্রত্যেক প্রশ্নের সব দিক দেখতে চাইবে না?

আমি তাই করতে চেষ্টা করেছিলুম।

২০ জুন, ১৯৫৩

পড়ার কথা

মনে আছে আমার ছেলেবেলায়—সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়,—আমরা ভাইয়েরা মাকে ঘিরে শুয়ে থাকতুম রোজ সন্ধ্যাবেলা। সে তো কলকাতার অবসন্ন সন্ধ্যা নয়, যা ক্লান্ত দিনের জরাজীর্ণ উত্তেজনায় কুৎসিত। আমাদের সন্ধ্যা ছিল সুপ্তোত্থিত রাত্রির সাড়ম্বর অভিষেক। সে রাত্রির রূপ ছিল ভয়াল। শহরে রাত্রি যেন বিরতি, নানা ব্যস্ততার মধ্যে শুধুমাত্র অকর্মণ্যদের বিলাসের অবসর। রাত্রির

* *Polemic* কাগজের ইস্তাহার থেকে উদ্ধৃত।

এখানে প্রসাধনের শেষ নেই; কিন্তু সে বিজিত, স্তিমিত। গ্রামে ঠিক বিপরীত। অন্ধকার সেখানে দয়া করে সূর্যকে কিছুক্ষণ আধিপত্য করতে দেয়। দিনের নিজের মনেও এই প্রভুত্ব নিয়ে অমূলক মোহ নেই। সে জানে তার আপন দৈন্য। তাই দিনের শেষে প্রতি সন্ধ্যায় সে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে ঘোরা রাত্রির পায়ে, বিদায় নেয় কুর্নিশ করে। আমাদের প্রতিটি সন্ধ্যা ছিল রাত্রির সে পুনরপ্রতিষ্ঠানের মহোৎসব। ভীষণা প্রকৃতির সেই দয়াহীন রাজত্বে আমরা মানুষরাও আমাদের সামান্যতা সম্বন্ধে সচেতন থেকে পলাতকের মতো সন্ধ্যাসমাগমে আশ্রয় নিতুম যে যার শয্যায়। দুঃসাহসের আহ্বান অশ্রুত থাকত চতুর্দিকের অবিরাম শৃগালনিনাদে। সেই কোলাহলের পটভূমিতে হোতো আমাদের গল্প-শোনা।

সেই গল্প বলার মধ্যে মা হঠাৎ রাজরাণীর প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করে গাত্রোত্থান করে স্বগতোক্তি করতেন, 'নাঃ, আর পারি নে কেষ্টাকে নিয়ে। রান্নাঘরে তরকারিটা যে পুড়ে যাচ্ছে তার খেয়াল নেই। হয়তো ঢুলছে বা কোথাও গেছে বিড়ি খেতে।' ব্যঞ্জনদহনের সেই বিশিষ্ট নির্ভুল গন্ধ আর যার নাসিকাকেই প্রতারণা করুক, আমার মাকে নয়।

অন্যান্য সহস্র গুণের মতো এই অসামান্য ঘ্রাণশক্তি তাঁর অযোগ্য পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে পুরোপুরি প্রাপ্ত হয়নি। কিন্তু অংশত আমি তার অধিকারী, এবং চতুর্দিকের যে সমস্ত ঘ্রাণ নাকে আসছে তাতে অনুরূপ গাত্রোত্থানের প্রয়োজন হয়েছে বলে মনে করি। প্রভেদ শুধু এই যে, বর্তমান দুর্গন্ধ রন্ধনশালা থেকে আসছে না, সেখানে ধর্মঘট; আসছে ভাঁড়ার-ঘর থেকে; এবং গন্ধটা দহনের নয়, পচনের।

বর্তমান বঙ্গের সংস্কৃতির ভাণ্ডারের কথা বলছি।

অথচ এ বিষাদে হরিষের পরিমাণ অল্প নয়। বহু শতাব্দী পরে শাসকের সিংহাসনে আজ স্বদেশীয়রা অধিষ্ঠিত। শুধু তাই নয়, তাঁদের মধ্যে অনেকে নিঃসন্দেহে সরস্বতীর বরপুত্র। এই স্বরাজ আর তার আগেকার মহাসমরের মুদ্রোৎসার থেকে সাহিত্য ও কলা নানাভাবে লাভবান হয়েছে। অর্থনীতির গ্রেশ্যাম্'স ল অনুসারে কলার ক্ষেত্রেও হিন্দি ছবি এবং মোহন সিরিজের সমৃদ্ধি

হয়েছে; কিন্তু অন্তত তিনটি সাহিত্যপদবাচ্য বাঙলা বই—'দৃষ্টিপাত', 'শীতে উপেক্ষিতা' ও 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' এবং একটি সুরুচিসম্মত বাঙলা ছবি, 'মহাপ্রস্থানের পথে'—আশাতীত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এতে আনন্দজ্ঞাপন না করলে অকৃতজ্ঞতা হবে। কিন্তু সাফল্যের কারণ অনুসন্ধান না করলে আত্মপ্রবঞ্চনা হবে।

প্রধানত বই এবং ছবি নিয়েই আলোচনা করব, কেননা বিশেষ কোনো কালে একটি জাতির মতি এবং গতির এমন নির্ভুল পরিচয় আর কোথাও মেলে না, যেমন মেলে তার পাঠাভ্যাসে আর অবসর যাপনের রীতিতে। এখানে বাধ্যবাধকতা নেই, যেমন আছে অফিসে বা কারখানায়। এখানে মানুষের একমাত্র প্রভু তার আপন রুচি।

পরিসংখ্যানের উপর আজকাল আমাদের অগাধ বিশ্বাস। তাই কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত একটি হিসাব দিয়ে শুরু করা যাক। গত তিন বছর বাঙালীর পঠনরুচির ধারা অংশত নিম্নরূপ ছিল :

	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১
সরকারী রিপোর্ট	১,০০৩	১,২৮৯	৩,৭৬৩
সাহিত্য	১,৬০৪	১,১১৪	৫,৮৬৮
সাময়িক-পত্র	২৩১	১,০৫০	৩,৪৬৯
ধর্ম	৯২১	৯৪২	২৬৯

(অমৃতবাজার পত্রিকা, ২-৬-৫২)

তালিকাটি থেকে নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত করা শক্ত। সরকারী রিপোর্টের চাহিদা হঠাৎ কেন তিন বছরে তিন গুণ বৃদ্ধি পেল, তার কারণ ভেবে পাইনে। কারণ যাই হোক, সেটা যে প্রয়োজনজাত তাতে সন্দেহ নেই। এতে তাই রুচির ইঙ্গিত সন্ধান করে লাভ নেই। সাহিত্যপ্রীতি যে প্রায় চতুর্গুণ হয়েছে, তা থেকে আনন্দ আহরণ করা সম্ভব; কিন্তু কোন কোন শ্রেণীর সাহিত্যে সাধারণের কৌতূহল-বেড়েছে বা কমেছে তার বিশদ বিবরণ না পেলে সংখ্যাগুলি বিচার করা সম্ভব নয়।

বাকি রইল সাময়িক-পত্র আর ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ। প্রথমটির পাঠকসংখ্যা পনেরো গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দ্বিতীয়টির দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে। একটু আগে যে তিনখানি বাঙলা বইয়ের কথা বলেছি, তার মধ্যে দুটি সাহিত্যিক সাংবাদিকতা, বিবিধ সাহিত্য বা রম্যরচনা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত. এবং তৃতীয়টি একজন ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষের জীবনী। জাতীয় গ্রন্থাগারের সরকারী তালিকায় তাই আমার বে-সবকারী. প্রায় আনাড়ী, তালিকার আংশিক সমর্থন মিলল। ধর্মসংক্রান্ত সংখ্যাটিও যে বস্তুত খণ্ডন নয়, একটু পরে তা দেখাতে চেষ্টা করব।

সাহিত্যে রম্যরচনা আদৌ অবহেলার বস্তু নয়। জাতীয় জীবনে সাময়িক-পত্রের গুরুত্বও অবজ্ঞেয় নয়। কিন্তু, আশা করি, আমার এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, এই জাতীয় রচনার প্রতি অপরিমিত পক্ষপাতের উদ্ভব হয় তখনই যখন কোনো কারণে (হয়তো একান্তই সঙ্গত কারণে) পাঠকমনে অভিনিবেশের অভাব ঘটে। এটা জাতির জীবনে যেমন অস্বাস্থ্যের লক্ষণ, তেমনি সাহিত্যেও স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। দিল্লী বা দার্জিলিং নিয়ে কিছু বর্ণনা, কিছু কাহিনী, কিছু তরলাকৃত ইতিহাস আর তত্তাহত্থিক সরলীকৃত জীবনদর্শন মিশ্রিত করে উপাদেয় রচনা সম্ভব, এবং কোনো সাহিত্যেই তা অপাংক্তেয় হওয়া উচিত নয়। ঋতুসংহারের প্রয়োজন ছিল কালিদাস-কাব্যের সম্পূর্ণতার জন্যে রবীন্দ্ররচনাবলীতে ‘প্রহাসিনী’র স্থান আছে।

কিন্তু শুধুমাত্র রম্যরচনা নিয়ে কবে কোন সাহিত্য সার্থক হয়েছে? এই জাতীয় লঘু রচনা হচ্ছে সাহিত্যের বিশ্রামের বিলাস—পাঞ্জাবির যেমন গিলে, বইয়ের যেমন জ্যাকেট। কিন্তু জামা না থাকলে গিলে দিয়ে কী হবে? বই না থাকলে জ্যাকেট আসবে কোন্ কাজে? শুধুমাত্র *hors-d'oeuvres* খেয়ে যেমন তৃপ্তি বা পুষ্টি কোনোটাই সম্ভব নয়, তেমনি রম্যরচনার জনপ্রিয়তা যদি কখনও এমন আকার ধারণ করে যে তাতে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা অবহেলিত হয় (সাহিত্যেও চাহিদা-সরবরাহের অমোঘ অর্থনীতিক আইন বহুলাংশে প্রযোজ্য) তবে লেখক, পাঠক ও সমাজতত্ত্বিক এই তিনেরই চিন্তিত হবার কারণ ঘটে।

আমাদের সমাজ-জীবন বর্তমানে নানা দিক থেকে উদ্‌ভ্রান্ত। সমাজের একটা বৃহৎ অংশ যখন পৈতৃক বাসভূমি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে এক উদ্বাস্তু-শিবির থেকে অপর উদ্বাস্তুশিবিরে অবিশ্রাম ভ্রাম্যমাণ, জাতির যাত্রাপথ যখন সহস্র পরস্পর-বিরোধী স্বার্থসমূহের সাময়িক সমন্বয়ে মাত্র আপাতঃশান্ত, স্বরাজ যখনও স্বাধীনতায় সার্থক হতে বাকি, সমাজের সামষ্টিক মন যখন নানা চাঞ্চল্যে কম্পমান, তখন সাহিত্যেও এই অনিশ্চয়তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। এ অবস্থায় নিষ্ঠা শিথিল হতে বাধ্য, এবং যে নিষ্ঠা ও দীর্ঘ ধীর স্থির মনঃসংযোগ সত্যকার সাহিত্য-সৃষ্টির জন্যে অপরিহার্য, বর্তমানের সর্বব্যাপী অস্থায়িত্ব তার অনুকূল নয়। এই পরিবেশে, যা আশা করি দীর্ঘস্থায়ী হবে না, লেখক-মন স্বভাবতই রম্যরচনা বা সাময়িক-সাহিত্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিছুটা পলায়নের জন্যে, বাকিটা সর্বগ্রাসী বর্তমানের পায়ে শিল্পীর আত্মসমর্পণের ফলস্বরূপ। ঠিক একই কারণে পাঠকও এমন বই বা কাগজ দাবি করেন যা ট্রামের ভিড়ে নানা বিক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে লালদীঘি থেকে গোলদীঘি পৌঁছবার আগেই শেষ করা যায়, এবং যে রচনায় ধারাবাহিকতা অত্যন্ত ক্ষীণ।

ব'সে পড়বার মতো বইয়ের চাইতে শুয়ে শুয়ে পড়বার বইয়ের বর্তমানে এই যে আদর, এটার কারণ অন্তত অংশত যে সামাজিক, তার পরিচয় দেওয়া গেল। এটা সুলক্ষণ নয়, কিন্তু ব্যাধিটা সাময়িক। লেখক-মন দীর্ঘকাল এই লেখার খেলা নিয়ে তুষ্ট থাকবে না; পাঠকমনও কিছুদিন পরেই এই লেখার খেলনা অনাদরে দূরে সরিয়ে রাখবে। মহতী কোনো বিনষ্টি ঘটবে না, কেননা সত্যকারের সাধক লেখক এই রম্যরচনার অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে সচেতন না হয়েই পারেন না, এবং পাঠকও একে একান্তই সাময়িক বলে অচিরেই আবিষ্কার করবেন। উভয়েরই পক্ষে এরা বর্তমান পর্যুদস্ত অবস্থায় অ্যাস্‌পিরিন মাত্র।

হয়তো অ্যাস্‌পিরিনের অসারতা সম্বন্ধে তাঁরা সজ্ঞান বলেই পাঠক-সমাজের অপর একটি বৃহৎ অংশ তাঁদের সান্ত্বনার বা সমস্যার সমাধানের সন্ধান করেছেন এক রকমের আন্তরিক কিন্তু অগভীর ধর্মানুসরণে। ইংরেজিতে ইদানীং

Thomas Merton এবং ফরাসিতে Simone Weil যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তারও মূলে অনুরূপ বিভ্রান্তি ও হতাশা আছে বলে আশঙ্কা করি।

ঈশ্বর, ধর্ম এবং ধর্মপুরুষদের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মতামত যাই হোক, ধর্মালোচনায় আমি একাধারে আগ্রহশীল এবং শ্রদ্ধাশীল। আমার আগ্রহ ও শ্রদ্ধার বস্তু সেই ধর্মতর্কের শেষের কথা অধ্যাত্মবাদ, প্রথম কথা নয়। তার শেষের অধ্যায় *Philosophia Perennis*, প্রথম অধ্যায় নয়। তর্কাতীত যে মিস্টিসিজ্‌ম্, যা ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সরাসরি সাক্ষাৎ, যেখানে মধ্যস্থের, গুরুর দার্শনিকের, এমনকি দর্শকের স্থান নেই, সে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই একান্ত ব্যক্তিগত হতে বাধ্য। ভক্তের সেই ভাগ্যে অপরের অংশগ্রহণ অসম্ভব। এর আলোচনায় তর্ক, যুক্তি বা প্রমাণ অপ্রাসঙ্গিক।

ধর্মতত্ত্ব কিন্তু একেবারেই আলাদা জিনিস। এ আলোচনাকে প্রমাণসিদ্ধ না হলেও প্রমাণসাধ্য হতে হয়। এই গূঢ় ধর্মজিজ্ঞাসায় সাধারণের কৌতূহল যে বাড়েনি, বরং হ্রাস পেয়েছে, তার পরিচয় উপরে-উদ্ধৃত সবকটি তালিকায় মেলে। বিশ্বাস এই ধর্মতত্ত্বের শেষ হতে পারে কিন্তু শুরু তার জিজ্ঞাসায়। এই বলিষ্ঠ ধর্মতত্ত্ব চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করে না, জাগ্রত করে। বলে না, চোখ বুজলে দেখতে পাবি; বলে, চোখ খুলে দেখতে চেষ্টা করো। এ আবিষ্কারের হাতিয়ার বিশ্বাস নয়, বিচার: ভক্তি নয়, বুদ্ধি।

হতে পারে তিনি বুদ্ধির অগম্য, বিচারের অতীত; হতে পারে বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। কিন্তু একটু আগে যা বলছিলুম, এই রকমের বিশ্বাস *ipso facto* একান্তই ব্যক্তিগত। যার আছে তার আছে, আর যার নেই তার নেই। যার কৃষ্ণ মিলেছে তার মিলেছে, আর যার মেলেনি তার মেলেনি। এ নিয়ে বিবাদ চলবে না, তর্ক চলবে না। এই মিসটিক দৃষ্টির জন্যে শিক্ষা অবাস্তব অনুশীলন অনাবশ্যক এবং অধ্যবসায় অপ্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ এ বস্তু কদাচ সবজনীন হতে পারে না।

যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, বহুর বিভ্রম ঘটেছে। একের অসাধারণ দৃষ্টি বহুর ভাগ্যে জোটেনি, কিন্তু বহু ইতিমধ্যে ন্যায় ও যুক্তির পরিচালনা পরিহার করে এমন অনালোকিত পথে যাত্রা শুরু করেছেন যেখানে তাঁদের

একমাত্র সহায় তাঁদের অন্ধ বিশ্বাস। হ্যাঁ, অন্ধ বিশ্বাস। এই জন্যেই গদাধরচন্দ্রের বর্তমান জনপ্রিয়তা। এই জন্যেই আজকের বাঙলায় চিত্রামোদীরা হয় মুম্বই-প্রণীত 'আলাদীন ঔর যাদুই চিরাগ' দেখছেন কিংবা বাঙলায় পতিতা-বিধবার বদরীনাথযাত্রার চিত্ররূপ দেখছেন। Qualitatively দুই বস্তুই এক; কেননা দুয়েরই ভিত্তি নির্বিচার বিশ্বাস, যুক্তিস্বাধীন ভক্তি। ব্যক্তিতে যা হয়তো দৃষ্টিতে উজ্জ্বল, বহুতে তা-ই দৃষ্টিবিভ্রম এবং অন্ধ অনুসরণ।

যুক্তি ও বিচারের নির্বাসনের পরে এই রকমের অন্ধ আনুগত্যের ফল কর্মক্ষেত্রে ভয়াবহ হতে পারে। মধ্যযুগের য়ুরোপের ইতিহাস এই রকমের অন্ধ ক্রূরতায় রক্তাক্ত। নির্দয় নেতৃত্বে এই অন্ধতা আগ্রাসী যুদ্ধে আত্মাহুতি দেয় অবিশ্বাস্য বীরত্বের সঙ্গে। এই বিশ্বাসেরই উর্বরতায় জন্মগ্রহণ করে *L'Eminence Grise.* ঔরংজীব, এবং আমাদের কালে এই রকম প্রশ্নহীন বিশ্বাসেরই বশবর্তী হয়ে মুসোলিনির বৈমানিকেরা অ্যাবিসিনিয়ায় বোমা ফেলে ফুল ফুটিয়েছে।

বিশ্বাস যে বাহুতে বল দেয় তার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। কিন্তু এই বিশ্বাসদত্ত পৌরুষের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী না হলেও, চিন্তার পঙ্গুতার বিনিময়ে লব্ধ এই বলিষ্ঠতা অনাগ্রাসী হলে জাতির জীবনে ক্লীবতা ব'য়ে আনে। আমরা অনাগ্রাসী, এবং তাই আমাদের অবিন্যস্ত মন (যা রম্যরচনা ছাড়া অন্য কিছু উপভোগ করতে অক্ষম) নিরুপায় হয়ে জড়, চিন্তালস, বুদ্ধিবিচারবিরহিত ধর্মবিশ্বাসের (যার তৃপ্তি ভক্তজীবনী পাঠে আর proxy দিয়ে তীর্থযাত্রায়) উপর নির্ভরশীল হতে চলেছে। বিশ্বাস—যা শ্রদ্ধার বস্তু—তা-ই আমাদের কর্মবিমুখ করে তুলছে।

শুধু তাই নয়, অসাধুতার প্রশ্রয় দিচ্ছে। কলাক্ষেত্রে যা অন্যান্য অসংখ্য আকর্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে একটিমাত্র, কর্মক্ষেত্রে সেই বিশ্বাসের পক্ষপুটে আশ্রয় খুঁজছে সহস্র অক্ষমতা।

আমাদের লোকরাষ্ট্রে এই অলৌকিকের আবাহনের দুটি দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে আহরণ করব। কিছুদিন আগে ভারতের প্রান্তবিশেষে

(মাদ্রাজে) খাদ্যনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহৃত হয়েছে। এই প্রশংসনীয় দুঃসাহসের নীতির ঘোষণা-প্রসঙ্গে আঞ্চলিক সচিবোত্তম তাঁর নতুন কার্যক্রমের সাফল্যাসাফল্যের সঙ্গে বিধিকে এমনভাবে জড়িত করেছেন যে, যখন এর বিচারের সময় আসবে, তখন কার্য এবং কারণ পৃথক করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। পরিবর্তিত নীতি সার্থক হলে ঈশ্বরে বিস্মৃত হতে সময় লাগবে না, তার জন্যে কৃতিত্বের অংশীদার আসবে অসংখ্য; কিন্তু ব্যর্থ হলে ব্যাখ্যার পথ খোলা রইল। দোষ হবে ভাগ্যের। "For if nations ascribe their victories to the ability of their generals and the courage of their soldiers, they always attribute their defeats to an inexplicable fatality." (Anatole France: *Penguin Island*)।

খাদ্যনীতি সফল হবে কি বিফল হবে তা নির্ভর করবে প্রধানত রাষ্ট্রের কর্মিষ্ঠতা ও সততার উপর। এ ক্ষেত্রে বিধাতাকে সম্ভাব্য ব্যর্থতার অগ্রিম অংশীদার করে রাখা রাজনীতিকসুলভ বিচক্ষণতা মাত্র। এখানে তবু বিধি-নির্ভরতা এসেছে সিদ্ধান্তগ্রহণের পরে। এতে আপন কৃতকর্মের দায়িত্বগ্রহণে ভীরুতার পরিচয় আছে, কিন্তু কর্তব্যবিমুখতা নেই।

পরনির্ভরতা যখন সিদ্ধান্তগ্রহণের পূর্বাহ্ণে দেখা দেয়, তখন আরো বেশি আশঙ্কার কারণ ঘটে। সম্প্রতি কলকাতায় এক অভ্যর্থনার উত্তরে কেন্দ্রীয় আইন-সচিব (শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস) যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে এমন দুশ্চিন্তার কারণ নিহিত ছিল বলে মনে করি। হিন্দু-আইনের সংস্কার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মতামত বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু শ্রদ্ধেয় আইন-সচিবের মতামত নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক নয়। তিনি প্রথমে কিছুক্ষণ মনু-মাহাত্ম্য কীর্তন করে বলেছেন, পুরাকালের ঋষিদের অনুজ্ঞা অবজ্ঞেয় নয়। নিশ্চয়ই নয়। তারপর তিনি বলেছেন, তবে পরিবর্তিত অবস্থায় সামাজিক অনুশাসনের পরিবর্তন আবশ্যক। একমত। শেষে তিনি বলেছেন, সে পরিবর্তন যখন আসবার তা "automatically" আসবে।

Automatically? তবে শ্রদ্ধেয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাজটা কী?

বিকল্প

প্রশ্নটিকে দীর্ঘতর করলে অনভিপ্রায় সত্ত্বেও অবিনয়ের অপরাধ ঘটতে পারে। তাই আমার আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

এই যে একান্ত লোকায়ত ব্যাপারেও অজ্ঞেয়ের হস্তক্ষেপের প্রার্থনা, এর মধ্যে নিহিত আছে জাতির চিন্তাশক্তির পক্ষাঘাত, ইচ্ছাশক্তির জড়তা এবং প্রাণশক্তির পরাভব। এর মূলে আছে আমাদের মনের ভাঁড়ারে টুটকি ও টোটকার অনুপ্রবেশ। এখনই যত্নবান না হলে অনতিদূর-ভবিষ্যতে সব কিছু আলো কীটে কাটা পুষ্পসম হয়ে যাবে কালো।

এক কথায় বলি। মুক্তি আন্দোলনের অবসান হয়েছে। অবিলম্বে একটি যুক্তি-আন্দোলনের সূচনা না হলে অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশ সমুৎপন্ন। সেই পরিণামে হয়তো দহনের দ্যুতিটুকু পর্যন্ত থাকবে না। এই শেষ হয়তো হবে তিলে তিলে পলে পলে পূতিধূমে শ্বাসরোধ।

১ জুন, ১৯৫২